আওয়ামী শাসনে আলেম নিপীড়ন

তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে
জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক আমার দেশ

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

নির্যাতনে আমার পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে যায়

রকীবুল হক
প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার

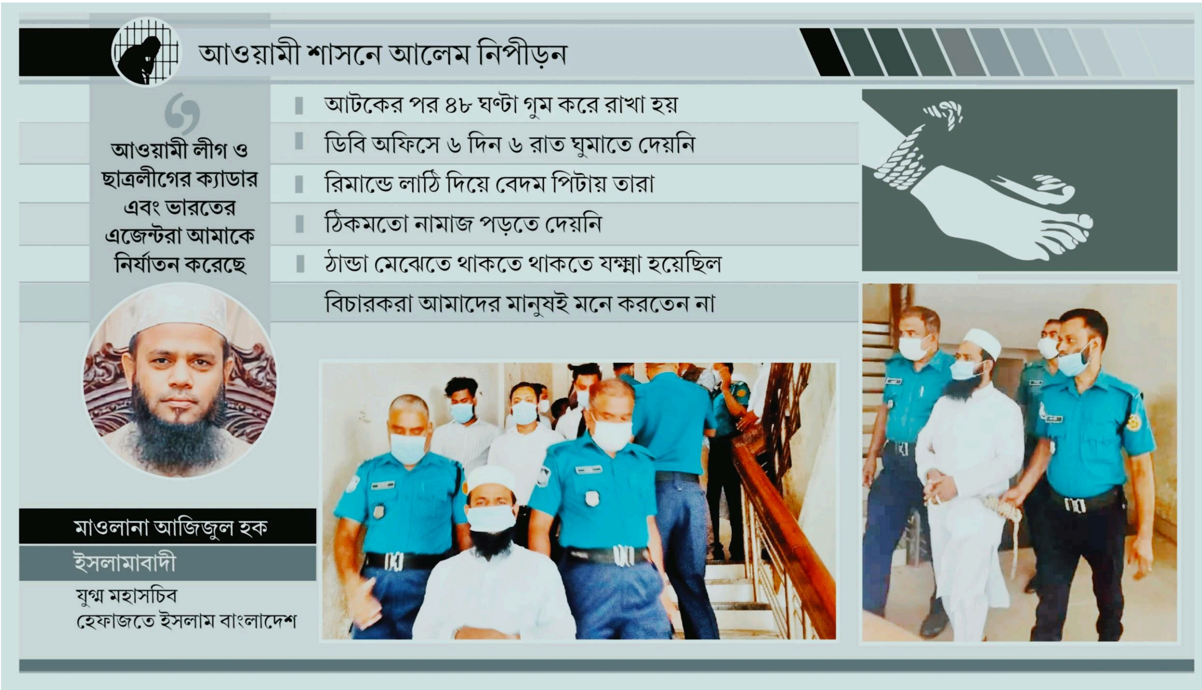

বিশিষ্ট আলেম ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদীকে দুই ডজনের বেশি মামলায় দেড় মাসের বেশি সময় রিমান্ডে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশ বাহিনী। তারা প্রবীণ এ আলেমের পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে দিয়েছে।

আমার দেশকে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশ থেকে ইসলাম নির্মূলের জন্য সব রকমের চক্রান্ত- ষড়যন্ত্র করেছে। বিশেষ করে শান্তিপ্রিয় আলেমদের ওপর তারা চরম নির্ঘাতম করেছে। বিগত ১৬ বছরে এই জালেমদের হাতে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে ওলামায়ে কেরাম, যা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। নির্যাতনে আমার পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে দিয়েছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা যে অত্যাচার-নির্ঘায়ন করেছে তার চেয়েও বেশি নিপীড়ন করেছে আওয়ামী জালেম সরকার।

এভাবেই আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আলেম নির্ঘাতনের বর্ণনা দেন বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আজিজুল হক। আওয়ামী লীগ সরকারের সমতে ইসলামবিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে হেফাজতের ব্যানারে সক্রিয় থাকায় ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়েন এই আলেম।

নিজের ওপর নিপীড়ন সম্পর্কে মাওলানা আজিজুল হক বলেন, ১০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণের প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন- সংগ্রাম করেছি। তখন ১৬ মার্চ চট্টগ্রামে চারজন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৭ জনকে শচীদ করে আওয়ামী সরকার। এ ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন করলে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। এসব হ্যারানির প্রতিবাদে ১১ এপ্রিল হাটহাজারীতে আমরা সংবাদ সম্মেলন করি। তখন থেকেই আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা এবং র‍্যাব- পুলিশ ওত পেতে ছিল। আমি অনেকক্ষণ হাটহাজারী মাদরাসার অবরুদ্ধ ছিলাম। মাগরিবের পর বের হলে আমাকে ফেপ্তার

করে। আমাকে এমনভাবে গ্রেপ্তার করে দেন আমি বাংলাদেশের বড় সন্ত্রাসী। শত শত র‍্যাব-পুলিশ বায়া বন্ধ করে সিএনজি থেকে আমাকে তুলে নেয়। ওখান থেকেই র‍্যাব আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। ৪৮ ঘন্টা তারা আমাকে গুম করে রাখে। এ সময় উত্তরার র‍্যাব অফিদে রেখে পরদিন চিবির কাছে হস্তান্তর করে। পথে কোথাও প্রস্রাব-পায়খানা পর্যন্ত করতে দেয়নি। প্রথমে পল্টন থানায় পল্টন থানায় ২০১৩ মালের একটি মামলায় জড়িয়ে কোটে তোলা হয়, পরবর্তী সময়ে মিথ্যা অভিযোগে একে একে ৩০টি মামলায় ০১ দিন রিমান্ডে নির্মম নির্যাতন করা হয়। পাশাপাশি ২১ মাস জেল খাটতে হয় আমাকে।

তিনি বলেন, 'আমাকে মূল নির্যাতন করেছে রিমান্ডের প্রথম দিন, সকাল ৯টা থেকে বিকাল এটা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে পেছনে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে, মাথায় ক্যাপ পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। লাঠি দিয়ে বেদম পিটায় তারা। তারা বলে দে, আমরা দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসী, আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি। আমাদের সাইজ করা হবে।আশ্চর্য গ্রগে যে, একজন বিসিএস অফিসার কীয়াবে এমন অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারো তারা কী শিক্ষা অর্জন করল। তাহলো রিমান্ডের কোনো বিধি-নিষেধ মানা হয়নি। ডিবি অফিসে ৮-১০ জনের রাগার মতো ছোট একটি রুমে ২৩ জনকে রাখা হয়। গাঁজাখোর, ছিনতাইকারী, সব ধরনের মানুথকে আমাদের বুমে ঢুকিবে দেওয়া হয়। মাওলানা আজিজুল হক বলেন, চট্টগামে ডিবি অফিসে ৬ দিন ৬ রাত তাকে ঘুমাতে দেয়নি। হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে পুলিশ পাহারায় তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। কাপড়চোপড় পরিবর্তন ও ঠিকমায় নামাজ পড়তে দেয়নি। ২-৩ ওয়াক্ত নামাজ একবারে পড়তে হতো। শুধু খাওয়া ও নামাজের জন্য দুইবার হাত খুলে দিত।তিনি বলনে, হিন্দু কর্মকর্তা, আওয়ামী ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং ভারতের এজেন্টরাই আমাকে নির্যাতন করেছে। চট্টগ্রামে ওসি ডিবি কেশব চক্রবর্তী, আব্দুল হান্নানসহ কয়েকজন অফিসার আমাকে নির্যায়ন করেছে। ঢাকায় ডিবি অফিসে এএসপি আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে নির্যাতন করা হয়।

তিনি জানান, পরে তাকে চট্টগ্রাম এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জ জেলখানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সেলে রাখা হয়। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ ছিল না। চট্টগ্রামের কারাগারে দীর্ঘ সাত

মাস লকাপে রাখা হয়। কনকনে শীতের মধ্যেও কোনো গরম কাপড় দেওয়া হয়নি। ঠান্ডা মেঝেতে

থাকতে থাকতে যক্ষ্মাতেগ হয়েছিল। কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এভাবে ১১ মাস সেখানে ছিলাম। পরে আমাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। কেরানীগঞ্জ কারাগারে একইভাবে আরও ১৬ মাস বন্দি ছিলাম। আমাকে একাই সেলে রাখা হয়। জেলের খাওয়া মাড়া বাইরে থেকে কিন্তু আনার সুযোগ দেওয়া হয়নি। জেলে হেফাজতে ইসলামের বন্দিদের চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। মাওলানা আমিনুল ইসলামকে এমনভাবে নির্ঘাতন করে যে, তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। কোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।'

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে তারাগার থেকে মুক্তি পান মাওলানা আজিজুল হক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নিম্নআদালত থেকে একটি মামল্যা।ও আমাকে জামিন দেয়নি। হাইকোর্ট থেকে সব মামলায় জামিন নিই। কোনো মামলায় জামিন গেলে তা আবার চেম্বার জজের আদালত স্টে করে দেয়। জামিনে মুক্তির দিনও নাতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আনা হয়। ওই মামলায় আবার তিন মাস জেলে ছিলাম। আদালতে বিচারকদের আচরণ ছিল খুবই খারাপ। তারা আমাদের মানুষই কলে মনে করতেন না। আমাদের কোনো বক্তব্য তারা শোনেননি। যেসব মামলায় সাজা হবে ৬ মাস, সে মামলায় আমাদের ২/৩ বছর জেলে রেখেছে। শান্তিপ্রিয় আলেম-ওলামাদের জামিন দেওয়া হয়নি। সে সময় আদালত আওয়ামী ক্যাডারবাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকার চলা র‍্যাব- পুলিশ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে মামলাগুলোর মধ্যে ছিল পুলিশ হত্যা, থানা ভাঙচুর, সন্ত্রাস দমন আইন, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। সবচেয়ে হাস্যকর হলো- তার বিরুদ্ধে একই সময়ে দেশের ৮-১০টি থানায় পৃথক ঘটনায় মামলা হয়েছে। তিনি এসব মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার বিচার চেয়ে আন্মাগতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাদী হয়ে মামলা করেছে। পতিত মৈরাজার শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিবৃদ্ধে এ মামলা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ও জেলজীবনে পরিবারের ওপর প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, জেলে থাকা অবস্থায় দুই বছর আমার বৃদ্ধ মা, দুই সন্তান এব। আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ করতে পারেননি, আমার মা জেল থেকে দুইবার ফেরত গেছেন। আমার ব্যবসা-বাণিজ্জা শেষ করে দিয়েছে। কারমূক্তির পরও আমাকে ঠিকমাত চলাচল ও কথানায়া করতে দেয়নি পুলিশ। নানা ভয়ভীতি দেখানো হতো। এর আগে ২০১৩ সালে দুই বছর মেয়ার আহলে আত্মগোপনে ছিলাম। আমাদের ধরতে সর্বত্র পুদিশ হানা দিত।

চট্টগ্রামের পটিয়ার হরিণখাইন গ্রামে ১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণকারী আজিজুল হক ইসলামাবাদী হাটহাজারী মাদরাসা থেকে মাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশাপাশি

মাদরাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত ডিগ্রি নেন তিনি। ছাত্রজীবনে ইসলামি ছাত্রসমাজের রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যসহ বিভিন্ন ব্যানারে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। বর্তমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি এবং আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত নামে তিনটি সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্বে আছেন।

দেড় মাস রিমান্ডে রেখে নির্যাতন

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার ১৬: ২৮
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৬: ৩৪

পবিত্র রমজানে দিনভর রোজা শেষে স্বাভাবিকভাবেই ইফতারের জন্য প্রস্তুত হন রোজাদাররা। তবে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে স্বাভাবিক পরিবেশে ইফতার করারও নিশ্চয়তা পাননি অনেকে। বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের গ্রেপ্তার করতে ইফতারের আগ মুহূর্তেও বিভিন্ন স্থানে হানা দিতো পুলিশ। বিনা অপরাধে ধরে নিয়ে ডিবি কার্যালয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে চালানো হতো অমানবিক নির্যাতন। এমনই নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হন দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব। রোজার মাসেও রিমান্ডে নেওয়া হয় তাকে। দীর্ঘ দেড় মাস রিমান্ড শেষে কারাজীবন ছিল আরও বিভীষিকাময়। ফাঁসির আসামিদের মতো আবদ্ধ সেলে বন্দি করে রাখা হয় 'খতিবে বাঙ্গালখ্যাত' এই আলেমকে।

মূলত হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ব্যানারে ইসলামি ইস্যুতে রাজপথে সোচ্চার থাকার কারণেই আওয়ামী সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় এই যুগ্ম মহাসচিব। চলাফেরা, ওয়াজ মাহফিল বা সাংগঠনিক কাজকর্মে সব সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধার মুখে পড়তেন তিনি। সার্বক্ষণিক নজরদারির কারণে ছিল গ্রেপ্তার আতঙ্কও। তার পরিবারের সদস্যদের ওপরও নেমে আসে নানা নির্যাতন। বন্ধ করে দেওয়া হয় তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো। আওয়ামী সরকারের এসব জুলুম-নির্যাতনের তথ্য আমার দেশকে জানিয়েছেন তিনি।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগর হেফাজতে ইসলামের সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, 'আওয়ামী দুঃশাসন এবং ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আলেম-ওলামারা।

রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক অনেকেই নির্যাতিত হয়েছেন, তা আমরা অস্বীকার করি না। হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম ও শহীদ হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু হয়েছেন। লাখ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তবে তা সব মেলালেও ওলামায়ে কেরামের ওপর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে এক রাতের বর্বরতার সমান হবে না। ’

তিনি বলেন, ‘গত ১৭ বছর কোনো মসজিদের মেহরাব নিরাপদ ছিল না। কোনো খতিবের মিম্বার বিপদমুক্ত ছিল না। কোনো ওয়াজ মাহফিল, ইসলামি সম্মেলন, ইসলাহী মজলিস, খানকা-কোনো তালিমি মজলিসের অনুমতি মিলত না। কোথাও ওয়াজ মাহফিল, ইসলামি সম্মেলন করলেই বাধার সৃষ্টি করা হতো।’

এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, ‘মাওলানা মামুনুল হকের মুক্তির পর আমার মাদ্রাসায় আসার কথা ছিল। কিন্তু সকাল থেকেই মাদ্রাসার চতুর্দিকের রাস্তা ব্লক করে রাখা হয়। সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এভাবে ইসলামি আন্দোলনে জুলুম-নির্যাতন করেছে সরকার। এক কথায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার ছিল ইসলামবিদ্বেষী। ইসলামকে দেশ থেকে উৎখাত করাই ছিল তাদের মূল টার্গেট।’

নিজের গ্রেপ্তারের প্রেক্ষাপট ও নির্যাতন প্রসঙ্গে হেফাজতে ইসলামের এই নেতা বলেন, ‘২০১৩ সালে আমাদের বিরুদ্ধে কয়েকশ মামলা দেওয়া হয়। জুনায়েদ বাবুনগরীসহ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ মে শাপলা চত্বরের ঘটনার পরদিন আমার মাদ্রাসা ঘেরাও করে পুলিশ। আমার জামাই মুফতি আব্দুল মালেকসহ চার শিক্ষক ও পাঁচজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মাদ্রাসার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মূল্যবান কাগজপত্র-সবকিছু নিয়ে যায় তারা। ছাত্র-শিক্ষকদের পিটিয়ে বের করে দিয়ে সেখানে তালা লাগিয়ে দেয় পুলিশ। এরপর থেকে আমি খুব আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছি। আমি যেখানে যেতাম সেখানেই পুলিশ হানা দিত। আমি বেঁচে আছি আল্লাহর রহমতে।’

তিনি বলেন, ‘২০২০ সালে আল্লামা শফীর ইন্তেকালের পর আমরা যখন আবার ঘুরে দাঁড়ালাম, আল্লামা বাবুনগরীর নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলামকে পুনর্গঠিত করলাম, তখন থেকেই আমাদের ওপর সরকারের ক্ষোভ ছিল। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, আল্লামা নুর হোসাইন কাসেমী, মামুনুল হক, জুনায়েদ আল হাবীব-এ ধরনের লোকদের কমিটিতে রাখা যাবে না। কিন্তু আমরা কোনো বাধা মানিনি। তখন থেকেই আমাদের প্রতি ক্ষোভ ছিল। গ্রেপ্তার আতঙ্ক নিয়েই আমরা চলতাম। শেষ পর্যন্ত তাদের বাবার ভাস্কর্যের নামে সারাদেশে মূর্তি স্থাপনের, বিশেষ করে পদ্মা সেতুর প্রবেশমুখে মূর্তি স্থাপনের জোরালো প্রতিবাদ করি আমরা। আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মুখে সেখানে মূর্তি স্থাপন করতে পারেনি সরকার। আমরা আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর নেতৃত্বে সব ঘরানার ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ করি।’

‘দ্বিতীয়ত, ২০২১ সালে দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমরা কর্মসূচি দিই। কিন্তু বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজের সময় ছাত্রলীগ-যুবলীগ সাধারণ মুসল্লিদের ভেতর ঢুকে

অতর্কিত হামলা করে। এর প্রতিবাদে সারাদেশে বিশেষ করে হাটহাজারী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্র ও তৌহিদী জনতা মাঠে নামে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাবেক এমপি উবায়দুল মুকতাদির চৌধুরীর প্রকাশ্য নির্দেশে তাদের ওপর পাখির মতো গুলি করা হয়। সেখানে আমাদের সাতজন শাহাদতবরণ করেন। হত্যার প্রতিবাদে আমরা শান্তিপূর্ণ একটি হরতাল ডেকেছিলাম। কিন্তু উত্তরা-যাত্রাবাড়ীসহ কিছু জায়গায় ছাত্রলীগ-যুবলীগ তাণ্ডব চালায়। এরপর আমাদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা দেয় এবং গ্রেপ্তার শুরু করে।'

জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, 'আমি কখনো কোথাও আত্মগোপন করিনি। ওই বছরের ৪ রমজান আমি বারিধারা মাদ্রাসায় ছিলাম। আসরের পর গোটা মাদ্রাসায় ডিবি এবং সিভিল ড্রেসে পুলিশ ঘেরাও করে। আমাকে সেখান থেকে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে একজন অফিসারের সামনে বসিয়ে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। পরে আমাকে পাশের একটি রুমে নিয়ে যায়। সেখানে দেখলাম, আজিজুল হক ইসলামাবাদীসহ অনেক ওলামায়ে কেরাম আছেন। সেখানে তাদের সঙ্গে বুট-মুড়ি দিয়ে ইফতার করলাম।'

তিনি বলেন, 'আমি দেড় মাস রিমান্ডে ছিলাম। একমাস ছিলাম ডিবিতে। ১৫ দিন ছিলাম রমনা, তেজগাঁও ও পল্টন থানায়। রিমান্ডে আমাকে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। রাতদিন ২৪ ঘণ্টা আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। সাতটা টিম আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এমন কোনো মানসিক নির্যাতন নেই, যা করেনি। দেড় মাস বারবার বিএনপি-জামায়াত ও অন্যান্য দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা জানতে চেয়েছে। তাদের কাছে নাকি রিপোর্ট আছে-আমার সঙ্গে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এক কথা ১০-২০ বার জিজ্ঞাসা করত। সেখানে বারবার আমাকে পাকিস্তানি রাজাকার বলে গালি দেওয়া হয়েছে। এমনকি হাফেজ্জি হুজুর থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ আলেদের রাজাকারের কমান্ডার বলাসহ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে।'

রিমান্ডকালের নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, 'কেরানীগঞ্জ কারাগারে ফাঁসির সেলে দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হতো আমাদের। আমাদের যে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল, সেখানে লাল ফিতায় 'হেফাজত ওয়ার্ড' লেখা ছিল। সেখানে অন্য কোনো লোকজনকে আসতে দিত না। পুলিশ বাইরে ডিউটি করত, আমাদের খাবার দিয়ে যেত, কিন্তু কোনো কথা বলত না। ৪৫-৫০ ফুট লম্বা একটি বারান্দায় আমরা ছিলাম ৬৫ জন। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এই অবস্থায় কেটেছে কেরানীগঞ্জের কারাজীবন।'

তিনি বলেন, 'প্রায় ছয় মাস পর আমাদের কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় দেড় বছর ছিলাম। তিনটি ঈদ গেছে কাশিমপুরের হাইসিকিউরিটি কারাগারে। এক বছর পর্যন্ত আমাদের পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমার পরিবার যে কুরবানি দিতে পেরেছে তা জেনেছি ৯ মাস পরে। এভাবে দুই বছর কারাবন্দি জীবন কেটেছে।'

মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, 'আমাকে ২০টি মামলায় অ্যারেস্ট দেখানো হয়। এর মধ্যে ১২টি ঢাকায় এবং ৮টি চট্টগ্রামের মামলা। এ মামলাগুলো ছিল মিথ্যা। দীর্ঘ ৯ মাসে এক এক করে ২০টি মামলায় আমার জামিন হয়। মুক্তির পরও আমি চট্টগ্রামের মামলায়

মাসে আট দিন হাজিরা দিয়েছি। ১২ দিন হাজিরা দিতাম ঢাকায়। এভাবে মাসে ২০ দিন আমার কোর্টের ভেতরে কাটত।’

গ্রেপ্তার ও দুই বছর কারাজীবনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তার পরিবারের ওপর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমার গ্রেপ্তারের পর পল্লবী ও বিরুলিয়ায় অবস্থিত আমার দুইটা মাদ্রাসা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় সরকার। আমার পরিবারকে তছনছ করে দিয়েছে। আমার ছেলেদের ধরার জন্য বাসা ঘেরাও করত, পুলিশ সব সময় হানা দিত। আমার জামাইদের ধরার চেষ্টা করত। শেষ পর্যন্ত আমার পরিবার ঢাকায় থাকতেই পারেনি। পীরেরবাগের বাসা ছেড়ে সাভারে গিয়ে গ্রামগঞ্জে মানবেতর জীবনযাপন করেছে তারা। আমার ছেলে ও জামাইরা ছয় মাস পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিল।’

১৯৬৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণকারী মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব মিরপুর মুসলিম বাজার দারুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ২০০০ সালে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন জামিয়া কাসিমিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা। বর্তমানে নিজের প্রতিষ্ঠিত দুই-তিনটি মাদ্রাসা পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব।

হাতকড়া থাকার পরও পরানো হয় ডান্ডাবেড়ি

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবার ১১: ৩৯

আওয়ামী শাসনামলে যেসব আলেম সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন, তাদের অন্যতম রাজধানীর জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার মুহতামিম ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের অর্থ সম্পাদক মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী। বছরের পর বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। তার নিজের জীবন যেমন তছনছ হয়েছে, তেমিন ভীষণ ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন তার সন্তানরাও।

নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে আমার দেশকে তিনি বলেছেন, ‘কারাগারে নানাভাবে দুর্ভোগে দিন পার করতে হয় আমাকে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হতাম কোর্টে যাওয়ার সময়। হাতকড়া থাকার পরও আবার দুই পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরানো হয়। গারদ থেকে কোর্টে ওঠানোর সময় আবার অতিরিক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হতো। যতক্ষণ কোর্টে থাকতে হয়, ততক্ষণ এ অবস্থায়ই দিন কাটে। এমনকি কোনো কোনো সময় পরের দিন পর্যন্ত এভাবে রাখা হতো। এ সময় অজু-নামাজের সুযোগ ছিল না। সবচেয়ে মানহানিকর, কষ্টকর ছিল এটা।’

২০২১ সালে দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদ করায় আলেমদের গণগ্রেপ্তারসহ নানা নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তাকে কোনো মামলা ছাড়াই আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর দেওয়া হয় বহু মামলা। দিনের পর দিন রিমান্ডের নামে তার ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। নানা ভয়ভীতিও দেখানো হয় তাকে। এভাবে দীর্ঘ আড়াই বছর কারাগারে কাটান দেশের অন্যতম শীর্ষ এই আলেম।

মুফতি কাসেমী হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হিসেবে ধর্মীয় ইস্যুতে বিভিন্ন আন্দোলনে রাজপথে সক্রিয় ছিলেন। এজন্য সব সময় আওয়ামী লীগ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নজরদারি ছিল তার ওপর। সব সময় গ্রেপ্তার আতঙ্কে থাকতেন তিনি। তার

ওপর নির্যাতনের পাশাপাশি তার পরিবারেও নেমে আসে নানা সংকট। সন্তানদের লেখাপড়ায় ছন্দপতনসহ চরম আর্থিক সংকটে পড়েন তিনি।

আমার দেশকে মুফতি কাসেমী বলেন, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল আর আলেম-ওলামারা সুখে ছিল এরকম ইতিহাস নেই। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে তারা নাস্তিকদের উসকে দিয়েছিল। তসলিমা নাসরিনের উত্থান তখনই হয়েছিল। ফতোয়াবিরোধী রায় তখনই হয়েছিল। তখনও অনেক আলেম-ওলামা জেল-জুলুম, নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর জুলুম নির্যাতন চালায়। অন্যবার শুধু আলেম-ওলামা নির্যাতিত হলেও এবার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে দিয়ে শুরু করে। ৫৬ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে হত্যার মতো ঘৃণ্যতম কাজের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার ওপর বড় আঘাত হানে তারা।'

'এরপর একের পর এক নাস্তিকদের আস্ফালন, তাদের লালন শুরু হয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো শাহবাগ। ইমরান এইচ সরকারের নেতৃত্বে ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম-নোংরা কাজগুলো সেখানে হয়েছে। তারা আলেম-ওলামা, দাড়ি-টুপি নিয়ে, এমনকি রাসুল (সা.)-কে নিয়ে পর্যন্ত কটূক্তি করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এমনই এক পর্যায়ে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের উত্থান ঘটে। আর ওই হেফাজতকে দমন করতে গিয়ে ২০১৩ সালের ৫ মে তারা পৈশাচিক নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আলেম ও মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার অজুহাতের তালাশে থাকতো। পায়ে পাড়া দিয়ে অজুহাত তৈরি করা হতো। এজন্য তারা প্রথমত, মাদ্রাসাগুলোকে টার্গেট করে। প্রকাশ্যে বন্ধের সাহস না পেলেও কৌশলে নানা চক্রান্ত করে সরকার। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেই ফেলেছিল যে, মাদ্রাসা সংকুচিত করার কাজ আমরা শুরু করেছি। তার এ কথার পরই কুরবানির চামড়ার দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। এতে মাদ্রাসাগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আল্লাহর রহমতে এখন মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থী সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেছে। তারা ওয়াজ মাহফিল ও মসজিদের মিম্বারগুলো টার্গেট করে। কোনো আলেমকে স্টেজে বসে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ রাখেনি। মাইক কেড়ে নেওয়া, শারীরিকভাবে আক্রমণের মতো ঘৃণ্যতম কাজ তারা করেছে। ইমামরা হুমকি-ধমকির মধ্যে থাকতেন, ইমামতি বন্ধ করে দেওয়া হতো। এসবের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে তারা খুব খারাপভাবে ব্যবহার করেছে।

তিনি বলেন, 'সবচেয়ে খারাপ কাজ হয়েছে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোর পর। মোদির সরাসরি নির্দেশে ভারতে মুসলিম নিধনের কাজ হয়েছে। আলেমদের দাবি ছিল ভারতের অন্য কাউকে আমন্ত্রণ করা হোক। মুসলমানদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত তিনি যেন না আসেন। কিন্তু সরকার তা না করে উল্টো আলেমদের নির্বিচারে নির্যাতন করে। গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে একটি হরতাল ডাকাকে কেন্দ্র করে হেফাজত নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার করে। রমজান মাসকেও তারা ভ্রুক্ষেপ করেনি। ৩ রমজান থেকে শুরু করে হাজার হাজার আলেমকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা-বানোয়াট মামলা দেয়, যেগুলো এখনো প্রক্রিয়াধীন আছে।

মানবাধিকার বলতে কোনো কিছুর চিহ্নই ছিল না আলেমদের ক্ষেত্রে। খুনি, চোর, লুচ্চাদেরও সপ্তাহে একদিন স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা, টেলিফোনের সুযোগ পায়, কিন্তু আলেমদের সেই অধিকারও ছিল না।'

নিজের গ্রেপ্তার-নির্যাতন প্রসঙ্গে মুফতি কাসেমী বলেন, 'আলেমদের গণগ্রেপ্তারের ধারাবাহিকতায় সরকারের লোকেরা মনে করেছিল যে, আমি হেফাজতের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, আমাকে না গ্রেপ্তার করলে কেমন হয়! ২০২১ সালে রোজার ঈদের পর আমি সাহস করেই বারিধারা মাদ্রাসায় হাজির হই। সেখানে মাগরিবের পর মাদ্রাসার একটি মিটিং চলা অবস্থায় ডিবি পুলিশ আমাকে আটক করে নিয়ে যায়।' 'ওইদিন আমি রোজা অবস্থায় ছিলাম। শুধু খেজুর আর পানি দিয়ে ইফতার করেছিলাম। তখনও রাতের খাবার খাইনি। আমাকে আটক করে মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। টানা ৯ দিন পর্যন্ত সেখানে রাখা হয়। চারটি মামলায় ৯ দিন রিমান্ডে নেয়। অথচ আমার নামে আগে কোনো মামলা ছিল না, সব মামলা একদিনেই সাজানো হয়। রিমান্ডের এই ৯ দিন বিভিন্ন থানা ও গারদে কাটিয়েছি। সেখানে হেরোইনখোরদের সঙ্গেই নোংরা পরিবেশে রাখা হতো। যেখানে ১০ জন মানুষ বসতে পারবে না, সেখানে ২৫-৩০ জনকে গাদাগাদি করে রাখা হয়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাখা হতো। আমার বিরুদ্ধে ৯টি মামলা দেওয়া হয়। অনেকের নামে মামলা আরও বেশি দেয়। বিভিন্ন মামলায় আরও কিছুদিন রিমান্ডে ছিলাম।'

হেফাজতের এই নেতা বলেন, 'আমি জামিনের জন্য খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিনি। প্রথম দেড় বছর কারাগারে চুপচাপ কাটিয়েছি। কারণ, তখন একটা রীতিই ছিল যে, কারও একটি মামলায় জামিন হলে নতুন করে মামলা দেওয়া হতো। আমি জামিনের জন্য আবেদন না করায় নতুন মামলা দেয়নি। তবে মজার বিষয় হলো, যেদিন মুন্সীগঞ্জ বা চট্টগ্রামের মামলা দেওয়া হয়, একই দিনে পল্টনেও মামলা হয়। তারা খেয়াল করেনি যে, একই দিনে আমি ঢাকা ও চট্টগ্রামে কীভাবে ঘটনা ঘটালাম? এ হাস্যকর কাজও তাদের মাধ্যমে হয়েছে। আমাদের কারও সঙ্গে দেখা করতে দিতো না, পত্র-পত্রিকা দেওয়া হতো না।'

তিনি বলেন, 'আরেকটি বিষয় সব সময় মনে প্রশ্ন জাগতো যে, এতবার আমাকে কোর্টে উঠানো হলো, এতগুলো মামলা দেওয়া হলো একটিবারের জন্যও কোনো বিচারক আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন না যে, আমি কোনো অপরাধ করেছি কি না। কী অদ্ভুত বিচারব্যবস্থা! আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবীরা তাদের মনগড়া সব অভিযোগ পড়ে শোনান, সবচেয়ে মিথ্যাচার হলেও বিচারক আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আদেশ দিতেন। আমার আইনজীবীরাও তেমন কিছু বলার সুযোগ পেতেন না। তাদের কথা শেষ করার আগেই রায় হয়ে যেত। এভাবে আমি আড়াই বছর জেল খাটলাম। আরও সাত বছর এর প্রভাব পড়েছে আমার জীবনে। ১০টি বছর আমার জীবন থেকে চলে গেল বিনা অপরাধে। আমার মতো শত শত আলেমের একই অবস্থা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অফিসারদের ভাষা যে কত নোংরা হতে পারে, তা বলার মতো না। তাদের ভাষায় মনে হয়নি তারা বাংলাদেশের মানুষ। রক্তমাংসে বাংলাদেশের হলেও ভাষা শুনে তাদের অন্য দেশের মনে হয়েছে। সেখানে ডিবি, ডিজিএফআই

ও এনএসআইয়ের লোক থাকতো। যেসব কথা জিজ্ঞাসা করতো তা হাস্যকর। জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? ভারতের সঙ্গে কী সম্পর্ক জানতে চায়। নানা ভয়ভীতি দেখানো হয়। সামনেই নির্যাতনের অনেক জিনিসপত্র রাখা থাকতো। মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, মাওলানা হারুন ইজহারকে পায়ের নখ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতন করা হয়।'

দীর্ঘ ৩১ মাস পর ২০২৩ সালের নভেম্বরে মুক্তি পান মুফতি কাসেমী। তিনি বলেন, জামিন ঘিরে তখন পুলিশ-আদালত একটা বাণিজ্য খুলে বসেছিল। সবার কাছ থেকে তারা অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অনেকের ৪০-৫০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আমার জানামতে, একজন ৮০ লাখ টাকা খরচ করেছেন কারামুক্তির জন্য।

১৯৭২ সালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় জন্মগ্রহণকারী মুফতি কাসেমী কওমি ধারায় উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে। ১৯৯১ সালে বারিধারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয়। দুই বছর পর চলে যান সৌদি আরবে। ১৮ বছর সেখানে অবস্থানের পর ২০০৯ সালে দেশে ফিরে আবার একই মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে জয়েন করেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর মৃত্যুর পর প্রিন্সিপাল (মুহতামিম) হিসেবে দায়িত্বে আছেন মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী।

কারাবন্দিত্বের প্রভাব নিজের পরিবারের ওপরও ব্যাপকভাবে পড়েছে বলে জানান মুফতি কাসেমী। তিনি বলেন, আমার বড় ছেলে চেন্নাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং চতুর্থ বর্ষে পড়তো। আমার গ্রেপ্তারের পর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সে পড়াশোনা শেষ না করেই দেশে চলে আসে। ছোট ছেলেটাও এসএসসির পর সময়মতো কলেজে ভর্তি হতে পারেনি।

টানা ২৬ দিন রিমান্ডে রেখে নির্যাতন

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২: ৫৫
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৫: ০১

শেখ হাসিনার শাসনকালে দেশের আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় নেতাদের দিন কাটতো আতঙ্কে। আতঙ্ক নিয়েই পবিত্র রমজান মাসে সেহরি খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেখেন তার বাসা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। কোনো মামলা ও কারণ ছাড়াই আটক করে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় ডিবি অফিসে। সেখানে ভিত্তিহীন কিছু মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে একটানা ২৬ দিন রিমান্ডে রাখা হয় তাকে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আর চরম মানসিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। তাকে রাখা হয় অজ্ঞাত স্থানে। রিমান্ডের বিভীষিকাময় পরিবেশেই তারাবির নামাজসহ রোজা রাখতে হয় তাকে। এভাবে ১১ মাস জেলখানায় ছিলেন তিনি।

শুধু জালালুদ্দীন আহমদই নন, একই সঙ্গে এমন পরিস্থিতির শিকার হন আরও বেশ কয়েকজন শীর্ষ আলেম। কারণ, তারা রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভাস্কর্যের নামে 'মূর্তি' স্থাপনের বিপক্ষে কথা বলেছিলেন। ভাস্কর্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা ধর্মপ্রাণ মানুষের আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। আর এসব আন্দোলন দমনে নির্মমপন্থা বেছে নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। আলেম-ওলামাদের ওপর হাসিনা সরকারের জুলুম-নির্যাতনের প্রত্যক্ষ একজন সাক্ষী হন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুগ্ম মহাসচিব ও হেফাজতে ইসলামীর মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত বাইতুল ফালাহ মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন।

আমার দেশকে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে, তখনই আলেম-ওলামারা নির্যাতিত হয়েছেন। তারা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে জঙ্গি জুজুর নাটক সাজিয়ে আলেমদের ওপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। এমনকি কুকুরের মাথায় টুপি দিয়ে তারা পোস্টারও ছেপেছিল। ১৯৯৯ সালে একটি হরতাল কর্মসূচি ঘিরে মোহাম্মদপুরের নুর মসজিদে পুলিশ নিজেরাই একজনকে হত্যা করে মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রখ্যাত আলেম শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের হ্যান্ডকাফ ও ডান্ডাবেড়ি পরানো হয়। গ্রেপ্তারের পর তাদের অজুর পানি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেই মামলায় আমিও আসামি থাকায় কয়েক মাস পালিয়েছিলাম।'

তিনি বলেন, ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে আগের অভ্যাস অনুযায়ী, অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে আওয়ামী লীগ সরকার। আসলে আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ লোক ইসলামকে সহ্যই করতে পারে না। এভাবে দীর্ঘ ১৫ বছর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে তারা।

তিনি বলেন, ২০১৩ সালে ১৩ দফা দাবিতে শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে রাতের আঁধারে নির্মমভাবে আক্রমণ, অনেককে হত্যা ও আহত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। শহিদদের দাফনেও বাধা দেয় আওয়ামী লীগের লোকেরা। আহতরা ঠিকমতো চিকিৎসা নিতে পারেননি। আহত অনেকে এখনও দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছেন।'

মাওলানা জালালুদ্দীন বলেন, '২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের নামে দেশে মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিলে আমরা তাতে বাধা দিই। এছাড়া স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে গুজরাটের কসাইখ্যাত নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু সরকার তা শোনেনি। এই ইস্যুতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে ২৫ হাজারের ওপরে আলেম-ওলামা কারাবরণ করেন। অনেকে আত্মগোপনে থাকেন। আমাদের অনেকেই দুই-তিন বছর কারাগারে দুর্বিষহ জীবন কাটান।'

মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, 'আওয়ামী লীগ আমলে আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষদের দমনে জঙ্গি নাটক সাজানো হতো। পশ্চিমাদের দয়া-দাক্ষিণ্য পেতে তারা এটা করতো। আসলে আমাদের মধ্যে কোনো জঙ্গিবাদ নেই। তারা ইসলামপন্থি, আলেম-ওলামাদের গ্রেপ্তার করে ডিবির টর্চার সেলে আটকে রাখতো। যখন মনে করতো, তখন তাদের মিডিয়ার সামনে হাজির করে বলতো, অমুক পাহাড় থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছি। আসলে তারা ছয় মাস আগেই গ্রেপ্তার হয়ে ডিবির কাছে ছিল। এভাবে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে পুলিশ বহু যুবকের জীবন শেষ করে দিয়েছে। জঙ্গি নাটক ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশল। তারা চিন্তা করতো ইসলামপন্থিদের দমনের জন্য এটা একটা বড় হাতিয়ার।'

নিজের গ্রেপ্তার হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, "২০২১ সালে ৩ রমজান সেহরি খেয়ে বাসায় ঘুমিয়েছিলাম। সকাল ১০টায় ঘুম থেকে উঠে দেখি বাসা ঘেরাও করে রেখেছে পুলিশ। কোনো মামলা ছাড়াই আমাকে ধরে ডিবি অফিসে নিয়ে গেল। পরে ২০১৩ সালের হেফাজতের ঘটনার মামলায় গ্রেফতার দেখায়। নেওয়া হয় রিমান্ডে। ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তৎকালীন ডিবিপ্রধান মাহবুবুর রহমান এবং তার সঙ্গে চারজন এসপি পর্যায়ের পুলিশ অফিসারের সামনে আমাকে বসানো হয়। তাদের ভাষা ছিল খুবই নোংরা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে 'ডিম ঢোকানোর' হুমকি দেয়।"

তিনি বলেন, 'ডিবি গারদে প্রচণ্ড গরম, কোনো ফ্যান নেই। তিন-চারজন থাকার মতো একটি রুমে ১১ জনকে রাখা হয়। আমরা ঠিকমতো শুতে পারিনি। একজনের মুখের দিকে আরেকজনের পা দিয়ে শুতে হতো। সেখানে তারাবির নামাজ পড়ার সময় ঘামে কাপড় ভিজে যেত, নামাজ শেষে কাপড় চিপে ঘামের পানি বের করতাম। একটানা ২৬ দিন রিমান্ডে ছিলাম। জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিকভাবে চরম অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। রিমান্ডে যেসব বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয় তা হাস্যকর। বিএনপির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে কি না, আমাদের আন্দোলনের টাকা আসে কোথা থেকে ইত্যাদি প্রশ্ন করে পুলিশ। সবচেয়ে বড় কষ্টকর হলো, কোর্টে আনা-নেওয়ার সময় হ্যান্ডকাফ ও ডান্ডাবেড়ি পরানো হতো। কাউকে কাউকে রশি দিয়েও বাঁধা হতো।'

কারাগারেও তাদের প্রতি আইনবহির্ভূতভাবে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। হেফাজতের এই নেতা বলেন, 'কারাগারে অন্য আসামিরা নিজের রুম ছাড়াও সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারলেও আমাদের একটা রুমে ২৪ ঘন্টা আটকে রাখা হতো। স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে

বঞ্চিত করা হয়। প্রথম চার-পাঁচ মাস পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিল না। পরে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।'

কারামুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নিম্ন আদালতে একের পর এক জামিনে ব্যর্থ হয়ে হাইকোর্ট থেকে প্রতিটি মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছি। অবশ্য হাইকোর্টে জামিন পেতেও আমাদের বহুবার ঘুরতে হয়েছে। আমাদের নাম দেখলেই শুনানি হতো না। তিন-চারবার আবেদনের পর শুনানি হতো। জামিন দিলে চেম্বার জজের আদালতে স্থগিত করা হতো। মুক্তির পরও সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা কঠোর নজরদারি এবং যত ধরনের বিধিনিষেধ দিয়ে রাখতো। অনেক সময় আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রাজনীতি করতাম এবং কথা বলতাম। তবে তাদের এই বাধ্যবাধকতা এবং চাপ উপেক্ষা করেই কাজ চালিয়ে যেতাম। গোয়েন্দাদের কথা না মানলে নানাভাবে টর্চারও করতো। ফোন দিয়ে আবার গ্রেপ্তারের হুমকি দিতো।'

আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২০০৯ সালে এবং ২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তারের ভয়ে অনেক সময় আত্মগোপনে থাকার অভিজ্ঞতা জানিয়ে জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, 'আত্মগোপনে থাকাটাও সুখকর নয়। সার্বক্ষণিক ভয়ে থাকতাম। এজন্য ২০২১ সাল থেকে আমরা আর আত্মগোপনে যাইনি। গ্রেপ্তারের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতাম।'

গ্রেপ্তার ও কারাবন্দিত্বের কারণে পরিবারের ব্যাপক ক্ষতির কথা তুলে ধরে মাওলানা জালালুদ্দীন বলেন, 'প্রায় এক বছর কারাগারে থাকাকালে আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আমার এতগুলো মামলা মোকাবিলা করতে প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়া আমি জেলে থাকাকালে আমার বাসায় পুলিশ ও গোয়েন্দারা এসে হুমকি-ধমকি দেখিয়েছে, হেনস্তাও করেছে। মা, স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে আমাদের পরিবার। তাদের জন্য বাসায় বাজার পৌঁছানো এবং অন্যান্য দেখাশোনার কাজ করেছে আমার বন্ধুমহল এবং দলীয় নেতাকর্মীরা। ঋণ করে আমার মামলা পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবারের জন্য বড় কষ্ট ছিল-তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো না। আমি দুইটা ঈদ করেছি কারাগারে। আমার সন্তানদের ঈদের কাপড় কিনে দিয়েছে আমার বন্ধুমহল।'

আওয়ামী লীগের সময়ে ইসলাম ও ধর্মীয় চর্চাকে বহুভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয় জানিয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন বলেন, 'তারা ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দিতো। শীর্ষ বক্তাদের একটা তালিকা করে বলা হয়েছিল, তাদের ওয়াজ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগবে। বক্তাদের হেনস্তা করা হতো। মসজিদে ইমামদের স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। অনেক মসজিদে খুতবা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলায় ইমামদের চাকরিও চলে গেছে। অর্থাৎ ধর্মীয় কাজ করতেও আওয়ামী লীগের অনুমতি লাগতো।'

তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা তাহাজ্জুদ, কুরআন পড়ার কথা বলে বেড়াতেন। মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য।'

মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরে ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণকারী মাওলানা জালালুদ্দীন ১৯৯৭ সালে মোহাম্মদপুর বাইতুল ফালাহ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

ছাত্রজীবনে ১৯৯১ সালে ছাত্র মজলিস এবং পরে ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। বর্তমানে দলটির যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছর আমাদের ওপর স্বৈরশাসক চেপে বসেছিল। আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করে তাদের হটাতে পারছিলাম না। অনেকে ভাবছিল, শেখ হাসিনা বেঁচে থাকতে আর ক্ষমতা থেকে সরবেন না। তবে তিনি জালেম ছিলেন, আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের পতন হয়েছে। ফেরাউন-নমরুদের মতোই তার পতন হয়েছে। তবে এই বিজয় নস্যাতের ষড়যন্ত্র চলছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে হবে।

বিবস্ত্র করে গোপনাঙ্গে কারেন্টের শক দেয়

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০: ৩২
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০: ৩২

মিথ্যা অভিযোগের মামলায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে চেইন দিয়ে একটানা সাড়ে ৩ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়। গোপনাঙ্গে দেওয়া হয় কারেন্টের শক। একবার-দুবার নয়, সাতবার গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। জেলে বন্দি রাখা হয় চার বছর। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। এমকি জেলে বসে নবজাতক ছেলের মৃত্যুর খবর পান তিন মাস পর।

আওয়ামী শাসনামলে এভাবেই নিপীড়িত হয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের একাংশের মহাসচিব মুফতি ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, রিমান্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তির জন্য নানাভাবে নির্যাতন করে বলা হয়, 'তুই আফগানিস্তানে গেছিস, পাকিস্তান গেছিস, তুই জঙ্গি।' অথচ বাস্তবে এই আলেমের কোনো পাসপোর্টই নেই।

শেখ হাসিনা সরকারের ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মাঠে সোচ্চার ছিলেন মুফতি ফখরুল ইসলাম। এ জন্য সাতবার গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় চার বছর জেলের প্রকোষ্ঠে দিন কেটেছে তার। তিনি বলেন, আওয়ামী সরকারের সময় আলেমদের নির্যাতনের শেষ ছিল না। আলেমদের যেখানেই পেয়েছে গ্রেপ্তার করেছে, জঙ্গি সাজিয়ে মামলা

দিয়েছে, তাদের স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মসজিদে জুমার খুতবা পর্যন্ত সরকারের ইচ্ছেমতো দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

মুফতি ফখরুল ইসলাম বলেন, ২০০৯ সালে রাজধানীর শ্যামলী এলাকা থেকে র‌্যাব তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে র‌্যাব-৪ এবং পরে র‌্যাব ওয়ানে নিয়ে যায় তাকে। সেখানে মাটির নিচে ২০টি রুম ছিল, যা শুধু আলেমদের বন্দি রাখার জন্য তৈরি করা হয়। নিজের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে আমার চোখ বাঁধা ছিল ২৪ ঘন্টা। ছোট একটা রুমে শোয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। হেলান দিয়ে হাত রডের বাইরে দিয়ে হ্যান্ডকাপ লাগানো হয়। বাথরুমের জন্য সময় দেওয়া হতো তিন মিনিট। এ সময় র‌্যাব আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত যে, আমি কয়টা ভাষা জানি, কোন কোন দেশ সফর করেছি, আফগানিস্তান গিয়েছি কি না, পাকিস্তানের সঙ্গে কী সম্পর্ক, দল কীভাবে চলে, টাকা পাই কোথা থেকে ইত্যাদি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এসব প্রশ্ন করত। সর্বশেষ বলে যে, এটাকে ৬ নম্বরে নিয়ে ঝোলা। সেখানে গিয়ে দেখলাম, অন্ধকার একটা রুম। ছাদের ওপর দিয়ে চেইন ঝোলানো। পাশে একটা বালতি, বেত ও চেয়ার। আমার হ্যান্ডকাপ খুলে রশি দিয়ে বাঁধল। আর চেইনে আটকে সুইচ টিপে ঝুলিয়ে দিল। সাড়ে ৩ ঘন্টা আমাকে ঝুলিয়ে রাখে। আমাকে উলঙ্গ করে গোপনাঙ্গে ক্লিপ লাগিয়ে কারেন্টের শক দেওয়া হয়। এই নির্যাতনের কষ্টের কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

তিনি জানান, পছন্দমতো কিছু স্বীকারোক্তির জন্যই মূলত তাকে নির্যাতন করা হয়। তাকে জঙ্গি বানাতে চেয়েছিল। তিনি আফগানিস্তান, পাকিস্তান গিয়েছিলেন- এটা বলাতে চেয়েছিল। অথচ তার পাসপোর্টই ছিল না।

২০১২ সালে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তারের স্মৃতিচারণ করে মুফতি ফখরুল ইসলাম বলেন, জাতীয় প্রেস ক্লাবে সরকারের ইসলামবিরোধী নারী নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে পুলিশ হামলা চালায় ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। পরে সেখান থেকে তাকেসহ মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ, মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামীসহ প্রায় ৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আব্দুল লতিফ নেজামী ও আহমদুল্লাহ আশরাফকে জেলে পাঠায়। মুফতি ফখরুলসহ ৬৩ জনকে এক সপ্তাহের রিমান্ডে নিয়ে যায়। এই দফায় ১৫ দিনের কারাবন্দি থেকে মুক্তির পর ফের গ্রেপ্তার হন মুফতি ফখরুল।

তিনি বলেন, 'বায়তুল মোকাররমে একটি মিছিল কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলাম। জুমার নামাজের সালাম ফেরানোর পরপরই আমাকে ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ। ডিসির সঙ্গে কথা বলার বাহানা দিয়ে তারা আমাকে পল্টন থানায় বসিয়ে রাখে। রাত ৯টার দিকে আমাকে গ্রেপ্তার দেখায়। পরে তিন মামলায় আমাকে ২১ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদে সবচেয়ে বেশি মানসিক টর্চার করা হতো। আমাকে পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দিত না। কথা বলতে দিত না। সেখানে ক্রসফায়ারের হুমকি দেওয়া হতো।'

মুফতি ফখরুল বলেন, ২০১২ সালে আরেকবার গ্রেপ্তার করে তাকে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে রাখা হয়। ২৯ দিন পর মুক্তি পান। একই বছরের শেষ দিকে আরেকবার গ্রেপ্তার করে পল্টন থানায় দুদিন রেখে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। এরপর শাপলা চত্বরের ঘটনার পর ২০১৩ সালে তিন মাস বাসায় থাকতে পারেননি তিনি। তাকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ প্রতিনিয়ত মাদরাসা ও বাসায় হানা দিত। তিন মাস তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

তিনি বলেন, ‘২০২১ সালে কামরাঙ্গীরচরে হাফেজ্জি হুজুর প্রকাশনীতে বসা অবস্থায় ঘেরাও করে তাকে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। সেখানে সারা দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ১৯ মাস আমি জেল খাটলাম। এ সময় পুরো রমজান মাসে তিন দফায় ২৬ দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়। ডিবি থেকে জেলখানায় নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি নেয়। তারা হুমকি দেয়, স্বীকারোক্তি না দিলে গাজীপুর শালবনে নিয়ে ক্রসফায়ার দেওয়া হবে, কেউ জানতে পারবে না। শাপলা চত্বরে আমার আপন দুই চাচাতো ভাই শহীদ হয়েছে। অথচ তারা আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে শাপলা চত্বরে কোনো মানুষ মারা যায়নি। আর বাবুনগরীর কাছ থেকে একই ধরনের একটা মিথ্যা ১৬৪ ধারা নিয়ে রেখেছিল, যা পরে মিডিয়ায় প্রচার করে। আমাকে কোর্টে নিয়ে একজন হিন্দু বিচারপতির মাধ্যমে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি নেয় । তাদের লিখিত বক্তব্যে আমার স্বাক্ষর নিয়ে আমার নামে চালিয়ে দেয়।’

মুফতি ফখরুল যখন রিমান্ডে, ঠিক তখন তার স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। এ সময় ছয় মাস তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না তার স্ত্রীর। তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন পরিবারের লোকজন তা জানত না। এরই মধ্যে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু চিকিৎসার অভাবসহ নানা কারণে কিছুদিন পর সে মারা যায়। নবজাতক সেই পুত্রসন্তানের মৃত্যুর খবর পান তিন মাস পর। এভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে চরমভাবে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তিনি বলনে, গ্রেপ্তার করে আজিজুল হক ইসলামাবাদীকে টর্চার করেছে। রফিকুল ইসলাম মাদানীকে মেরেছে। তাকে হাতিরঝিলে নিয়ে ফতুয়া আর প্যান্ট পরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে টানিয়েছে। একটা বেগানা মেয়ে এনে তার সঙ্গে ভিডিও নাটক করিয়েছে। হাটহাজারীর তৎকালীন এডিসি মুফতি হারুন ইজহারকে পেটাতে পেটাতে অজ্ঞান করে ফেলে। শুধু মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য এভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল্লামা শফীর বিরুদ্ধে মামলা করা, মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য এভাবে নির্যাতন করা হয়।’

কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে থাকা ও খাবার কষ্টের কথা জানিয়ে মুফতি ফখরুল ইসলাম বলেন, সাধারণ কয়েদিরা ১৫ দিন পরপর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। অথচ তাদের সঙ্গে এক মাসের আগে কাউকে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। অন্য কয়েদিদের সপ্তাহে ১০ মিনিট ফোন ব্যবহার করতে দিলেও তাদের তা দেওয়া হয়নি। দোকানে কেনাকাটা করতে দেয়নি। জ্বরে অসুস্থ হয়ে কাতরালেও চিকিৎসা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। জেলখানায়

সাধারণ সুবিধা থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছে। ২০২১ সালে ১৯ মাস জেল খেটে বের হওয়ার চার মাসের মাথায় আবারও গ্রেপ্তার হন মুফতি ফখরুল।

পরিবারের ক্ষতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি জেলে থাকার কারণে আমার পরিবার তছনছ হয়ে গেছে। বাচ্চাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী না থাকলে পরিবারের যে ধরনের ক্ষতি হয়, তা হয়েছে। থাকা-খাওয়া-পড়ালেখাÑ সার্বিক দিক থেকে পরিবারের সদস্যরা সমস্যায় পড়েছিল।’

মুফতি ফখরুল বলেন, ‘বাংলাদেশের ওলামাদের জেলে ঢুকিয়ে জঙ্গি তকমা লাগিয়ে লাগিয়ে ভারতকে খুশি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। ভারতকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল তারা। আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি নেই। বাংলাদেশে আছে দ্বীনদার-পরহেজগার মুত্তাকি। আমরা সবাই ভাই ভাই, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি। অথচ একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার আলেমদের ধরে ধরে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ভারতকে খুশি করেছে। আমার বিরুদ্ধেও জঙ্গি মামলা দেওয়া হয়েছে। অথচ আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। অনেকের চেয়ে দেশপ্রেম আমাদের বেশি।’

৪১ দিনের রিমান্ড, তিন বছর জেল

রকীবুল হক
প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার, ১১: ৫৭

রাজপথে সোচ্চার থাকার কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের বিশেষ টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক। নানাভাবে জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় প্রাণনাশের শঙ্কায়ও ছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে দুই দফায় তিন বছরের বেশি সময় কেটেছে কারাগারে। দীর্ঘ ৪১ দিন রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। আদালতে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরিয়ে তাকে শীর্ষ সন্ত্রাসীর মতো হাজির করা হয়। রিমান্ডে চোখ বেঁধে-হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তার চুলের ডিএনএ চুরি করে তা ভুয়া অভিযোগের মামলার আলামত হিসেবে ব্যবহারের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

শুধু এসব নির্যাতনই নয়, চরিত্র হননের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নানা অপচেষ্টার মুখোমুখি হন মামুনুল হক। এরই অংশ হিসেবে সোনাগাঁয়ের একটি রিসোর্টে দ্বিতীয় স্ত্রীসহ অবরুদ্ধ করে আটকের চেষ্টা ও পরে তার বাসা থেকে ওই স্ত্রীকে তুলে নিয়ে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। পরে সেই মামলা থেকে বেকসুর খালাসের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা প্রকাশ পায়।

শেখ হাসিনা সরকারের ইসলাম ও দেশবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কন্ঠ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক। রাজনীতির মাঠ থেকে শুরু করে ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় ও আলোচিত হয়ে ওঠেন মরহুম শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের এই ছেলে। সরকারি মহলের নানা প্রলোভন আর ভয়ভীতি উপেক্ষা করেই মাঠে সক্রিয় ছিলেন তিনি। এসব কারণেই তিনি আওয়ামী সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন বলে মনে করেন কওমি অঙ্গনের অন্যতম শীর্ষ এই আলেম।

আলেমদের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে মাওলানা মামুনুল হক আমার দেশকে বলেন, আওয়ামী শাসনের সময়টা আলেম-ওলামা এবং ইসলামের ধারক-বাহকদের জন্য খুব খারাপ ছিল। এ সময় অনেকেই নানাভাবে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে তিনি নিজেই সরকারের টার্গেটে পরিণত হন। তার ওপর জুলুমের মাত্রাটাও ছিল ভিন্ন ধরনের। কঠিন দুঃসহ সময় পার করতে হয়েছে তাকে।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের এই যুগ্ম মহাসচিব জানান, বিগত সরকার যাদের পথের বাধা হিসেবে বিবেচিত করেছে, তার অন্যতম ছিল কওমি অঙ্গন, বিশেষ করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। শাহবাগে নাস্তিক্যবাদী শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে হেফাজতকে মাঠে নামতে বাধ্য করা হয়। আর হেফাজত যখন মাঠে আসে, তখন তাদের ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তারা মোকাবিলা করে। শাপলা চত্বরে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়। আপাতদৃষ্টিতে তারা সে সময় হেফাজতকে বাহ্যিকভাবে পেছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়। তবে কার্যত ২০১৩ সালের এ ঘটনা দীর্ঘ মেয়াদে আওয়ামী লীগের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে পরিণত হয়েছে। ইসলামপ্রেমীদের মনে আওয়ামী লীগের প্রতি ঘৃণা জন্ম দেয়।

মামুনুল হক বলেন, তাকে নিয়ে আওয়ামী সরকারের মেগা পরিকল্পনা ছিল। ভিনদেশির প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা, সহযোগিতাসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে মাঠে একযোগে কাজ করে। তার মধ্যে বড় ভূমিকা পালন করে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। তারা তাকে সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরিকল্পনা নেয়। তাকে কেন্দ্র করে এ দেশের আলেম সমাজ ও হেফাজতের নেতারা বিশেষ করে প্রতিবাদী আলেমদের ঘায়েলের ঘৃণ্য পরিকল্পনা আঁকে। সে অনুযায়ী চরিত্রহননের মতো নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সংস্থা তাদের সেই কাজ শুরু করে।

শেখ মুজিবের ভাস্কর্য এবং মোদির আগমনবিরোধী আন্দোলন ঘিরে আওয়ামী সরকারের ব্যাপক তোপের মুখে পড়েন আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। ধরপাকড়ের শিকার হন বহু আলেম, ছাত্র-জনতা এবং হেফাজত নেতারা। সে সময় ধরপাকড়ের টার্গেটে পড়েন মাওলানা মামুনুল হক। একপর্যায়ে বিনা অপরাধে ২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল মোহাম্মদপুরে নিজ কর্মস্থল জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসা থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি।

গ্রেপ্তার-নির্যাতনের দুঃসহ স্মৃতি উল্লেখ করে মাওলানা মামুনুল হক বলেন, ‘গ্রেপ্তারের পর ধারাবাহিকভাবে প্রায় ৪০ দিন ডিবিতে রিমান্ডে ছিলাম। রিমান্ডে খুব বেশি শারীরিক টর্চার না করা হলেও প্রচণ্ড মানসিক টর্চার করা হয়েছে। রিমান্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ

লোমহর্ষক যে কাজটি করা হয়, সেটি হলো এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ একটি কামরায় নিয়ে চোখ বাঁধে ও হ্যান্ডকাফ পরায়। মাথার টুপিও খুলে ফেলা হয়। সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ রকম রীতি নেই এবং আমাদের আগে-পরে কারও করা হয়নি।’

তিনি বলেন, ‘ওইদিন ছিল শুক্রবার। তারা তেমন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি, কিন্তু মাথার চুলে টান লাগা অনুভব করলাম। পরে পুলিশ কর্মকর্তাদের কথাবার্তায় অনুমান করলাম যে, ওই সময় আমার মাথার ডিএনএ চুরি করে নিয়েছে। সেই ডিএনএ আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর-চরিত্রহননের মামলার আলামত হিসেবে নিয়ে গেছে। হয়তো ডিবিতে থাকা অবস্থায় আমার ব্যবহারের কাপড়-চোপড়ও নিতে পারে। এটা ছিল আমার সঙ্গে ভয়াবহ-বর্বর আচরণ। এ ছাড়া রিমান্ডে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে।’

রিমান্ডের পর দীর্ঘ প্রায় তিন বছর কারাগারে ছিলেন ঢাকা মহানগর হেফাজতে ইসলামের এই সেক্রেটারি। এ সময় বহু মামলার মুখোমুখি হন তিনি। প্রতিনিয়ত আদালতে যাতায়াত করা ছিল তার জন্য কষ্টকর। তাকে কোর্ট গারদে রাখা হতো অনেক সময়।

২০১৩ সালেও শাপলা চত্বরের ঘটনার পর গ্রেপ্তার হন মামুনুল হক। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, খুলনায় একটি মামলায় হাজিরা দিতে গেলে ভোরে শিববাড়ী মোড় থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দেয়, যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঢাকায় বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন জটিল মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরের ঘটনার বিভিন্ন মামলায় জড়ানো হয়। ওই সময় তাকে দুদিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। ১৫টি মামলায় তখন জামিন নিয়ে বের হতে হয় তাকে। বিভিন্ন মামলায় ঢাকা-খুলনায় বারবার যাতায়াত করতে হয়েছে।

তবে ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তারের পর ৪১টি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সবগুলোয় পর্যায়ক্রমে জামিন নিয়ে বের হতে হয়েছে তাকে।

পরিবারের ভোগান্তি প্রসঙ্গে মামুনুল হক বলেন, ২০২১ সালে গ্রেপ্তারের আগে-পরে তার পরিবারের ওপর দিয়ে টর্নেডো বয়ে গেছে। ডিবি ও পুলিশ সদস্যরা এসে তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে মামলা করানো হয়েছে। এ সময় পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীতিকর অবস্থার মধ্যে ছিল। এরপর পরিবারের লোকজনের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি করা হতো। দুটি মাদরাসার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। এর মধ্যে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় নির্মাণাধীন একটি মাদরাসায় পুলিশ অভিযান চালায়। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক যাদের পেয়েছে, সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মাদরাসাটি তালাবদ্ধ করে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রায় এক বছর। সেখানে তাদের কোনো লোকজনের যাতায়াতের সুযোগ ছিল না।

মোহাম্মদপুরে জামিয়া আরাবিয়া রাহমানিয়া মাদরাসা নিয়ে সরকারের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে মামুনুল হক বলেন, কিছু আইনি জটিলতার সুযোগে মাদরাসাটি প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার সব আয়োজন তারা করে। তারা বাবা আল্লামা আজিজুল হক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তারা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করছিলেন তিনি। তার বড় ভাই মাওলানা মাহফুজুল হক এটির প্রিন্সিপাল ছিলেন। সেটিকে সরকার দখলে নিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেয়। এভাবে গুলশানে একটি মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে তাবলিগের মধ্যে বিরোধ ছিল। সেই বিরোধ কেন্দ্র করেও তাকে আসামি করে মামলা দেওয়া হয়। মোহাম্মদপুরের মাদরাসা প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিতে ভূমিকা রাখায় পুলিশের একজন ডিআইজিকে পরে রাষ্ট্রীয় পদক দেওয়া হয়।

দমন-পীড়নের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রলোভনও দেওয়া হয়েছে মামুনুল হককে। তবে এসব কথায় কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় তারা আগ্রহ হারিয়েছে বলে মন্তব্য মামুনুল হকের।

ঢাকার আজিমপুরে ১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণকারী মামুনুল হক কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রির পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ইসলামি রাজনীতির পাশাপাশি তিনি মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদিস হিসেবে কর্মরত। মাসিক রাহমানি পয়গাম নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক তিনি। এ ছাড়া বহু ইসলামি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত মাওলানা মামুনুল হক।

ঈদের নামাজের সুযোগ পেতে অনশন করি

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০১ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ২৯

পবিত্র রমজানে তারাবির নামাজে ইমামতি শেষে বেশ ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরেন মুফতি আলী হাসান উসামা। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবারের। কিন্তু এমন মুহূর্তে জঙ্গি আস্তানার আদলে তার বাসা ঘিরে ফেলে অসংখ্য পুলিশ। আটক করে প্রথমে রাজবাড়ীর এসপি অফিসে কিছুক্ষণ রাখার পর তাকে নিয়ে ঢাকায় আসে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) একটি দল।

কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাকে জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। একপর্যায়ে দেওয়া হয় জাতীয় সংসদে হামলার প্রস্তুতি-সংক্রান্ত একটি মামলা। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে শীর্ষ আলেমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বীকারোক্তির চেষ্টায়ও ব্যর্থ হয় পুলিশ। একপর্যায়ে সেই মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেও বিনা অপরাধে দীর্ঘ এক বছর পার করতে হয়েছে কারাগারে।

আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসনে আলেম-ওলামাদের ওপর জুলুল-নির্যাতনের তরতাজা সাক্ষী তরুণ এই আলেম। মঞ্চে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওয়াজ ও ধর্মীয় আলোচনায় বেশ জনপ্রিয় মুখ তিনি। রাজধানীর মিরপুরে বায়তুস সালাত জামে মসজিদের খতিবের পাশাপাশি সিলেট জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়ার মহাপরিচালকের দায়িত্বে আছেন তিনি। আর এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণেই মূলত তিনি বিগত সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন বলে মনে করেন এই আলেম।

মুফতি উসামা বলেন, বিগত দিনগুলোয় সবচেয়ে বেশি জুলুম-নির্যাতন হয়েছে ইসলামপন্থি ও ওলামায়ে কেরামের ওপর। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আলেমদের ওপর যে নির্যাতন করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আওয়ামী রেজিমের প্রতিবাদ করার কারণে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ইন্তেকালের আগে তিন বছর গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল মুফতি আমিনীকে। তার ইন্তেকালের ছয় মাস পর ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর ট্র্যাজেডি হয়। সেটাকে কেন্দ্র করে এত বড় জুলুল-নির্যাতন হয়, যার কোনো নজির আছে বলে জানা নেই। এরপর ২০১৬-১৭ সালের দিকে অসংখ্য আলেম-ওলামাকে টার্গেট করে করে ক্রসফায়ার দেওয়া হলো। কতজনকে গুম করে নেওয়া হলো, যার কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, ২০২১ সালে এতবেশি জুলুম-নির্যাতন হয়েছে, ব্রিটিশ আমলের পরে একসঙ্গে এতবেশি আলেম-ওলামা নির্যাতন কখনো হননি। একসঙ্গে তিন হাজারের বেশি আলেম-ওলামাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্যাতনের মাত্রাও এত বেশি ছিল যে, কেউ কেউ লাশ হয়ে কারাগার থেকে বের হয়েছেন। যারা জীবিত ছিলেন, তাদের একজনেরও অবস্থা এখন ভালো না। যারা কারাগারে যাননি তাদেরও দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে।

মুফতি উসামা বলেন, 'আমরা যারা মাঠে-ময়দানে কাজ করি, এমন একটা সপ্তাহ যায়নি, যেটাতে ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। কোনো মাহফিলের জন্য মাঝপথে যাওয়ার পর পুলিশের ফোন আসে যে, ওয়াজ করতে দেওয়া হবে না। এমনকি স্টেজে ওঠার সময় ঘোষণা আসছে, মাহফিল করা যাবে না। আর কমন দৃশ্য হচ্ছে- যেখানে করা যাবে সেখানেও বলে দেওয়া হতো যে, সরকারবিরোধী কোনো কথা বলা যাবে না।

বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার ও জেল খেটেছেন এই আলেম। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০২১ সালের ৫ মে ২৩তম রমজানে রাজবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তারাবির নামাজ পড়িয়ে বাসায় ফিরি। তখনো রাতের খাবার খাইনি। কিছুক্ষণ পর দেখি বাসাটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এমনভাবে ঘেরাও করেছে যেন কোনো তথাকথিত জঙ্গি আস্তানায় তারা এসেছে। এসপি সাহেব কথা বলতে চেয়েছেন, এমন অজুহাতে স্থানীয় থানার ওসি ও অন্যরা আমাকে আটক করে নিয়ে যান। এরপর আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ফ্যামিলি কিছুই জানতে পারেনি, আমিও বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাচ্ছি।'

তিনি জানান, আটকের পর তাকে প্রথমে এসপি কার্যালয়ে এক-দেড় ঘণ্টা রাখা হয়। এ সময় পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় এবং সেখানে বইপত্র, ডিভাইসÑ সবকিছু নিয়ে আসে। এমনকি তার মায়ের মোবাইলও নিয়ে যায়। তার মাদরাসা অফিসে হানা দেয়। মসজিদেও কয়েকবার গিয়ে তদন্ত করে। অবশেষে রাত দেড়টার দিকে তারা একটা গাড়িতে তুলে ঢাকার দিকে যাত্রা শুরু করে। এ সময় স্থানীয় এসপি তাদের লিখিত দিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। তখন গাড়িতে থাকা কাউন্টার টেরোরিজমের একজন ইনস্পেক্টর মোবাইলে অন্য কাউকে বলেন, তাকে তো এখন গুম করা যাবে না। কারণ তাকে লিখিত দিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া এসপি থানার ওসিকে দিয়ে একটি জিডিও করান। এতে তিনি গুম হওয়ার আশঙ্কা থেকে কিছুটা স্বস্তি পান।

ওই রাতেই রাজবাড়ী থেকে ঢাকায় আনা হয় মুফতি উসামাকে। কাউন্টার টেরোরিজমের অফিসে যখন পৌঁছান, তখন সাহরির সময় শেষ। পরদিন তাকে কোর্টে ওঠানো হয়। তখনো তিনি জানেন না, তাকে কোন মামলায় জড়ানো হয়েছে। বারবার জিজ্ঞাসা করলেও পুলিশ কোনো জবাব দেয়নি। তখন প্রথম ধাপে তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দেয় আদালত। সেটি শেষ হলে আবার দুদিন রিমান্ড দেয়।

এ প্রসঙ্গে মুফতি উসামা বলেন, 'রিমান্ডে শারীরিক টর্চার না করলেও মানসিক টর্চাসের কোনো কমতি ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় চোখ ও হাত দুটো হাতকড়া দিয়ে পেছনে বেঁধে রাখা হতো। কারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জানি না। রিমান্ডে এলোপাতাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করত। তারা আমাকে দিয়ে কয়েকজন শীর্ষ আলেমকে ফাঁসানোর টার্গেট করেছিল। সবচেয়ে বেশি করা হয়েছিল জুনায়েদ বাবুনগরীকে নিয়ে।'

তিনি বলেন, তার কয়েকটি বই বেস্ট সেলার হওয়ায় রকমারি ডটকমের সোহাগকেও জঙ্গি বানাতে চেয়েছিল পুলিশ, যাতে তাকে গ্রেপ্তার করে আনা যায়। এ ছাড়া হেফাজতের গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের দিয়েও তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তাদের মূল টার্গেট ছিল- একজনকে দিয়ে আরেকজনকে ফাঁসানো।

মুফতি উসামা জানান, মানসিক প্রতিবন্ধী একটি ছেলেকে দিয়ে নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে পুলিশ স্বীকারোক্তি নেয় যে আমি, মুফতি হারুন ইজহার, মুফতি আমির হামজা এবং মুফতি মাহমুদুল হাসানের বক্তব্য শুনে উজ্জীবিত হয়ে তরবারি হাতে সংসদ ভবনে হামলা করতে গিয়েছি। যদিও তরবারির কোনো ফুটেজ তারা দেখাতে পারেনি। এ কারণে মামলায় আমাদের সবাইকে অব্যাহতি দেন বিচারক। কিন্তু এক বছর তো হয়রানির শিকার হয়েছি আমরা। তবে মামলা শেষ হলেও মাদরাসা ও বাসা থেকে প্রায় ৬ লাখ টাকা মূল্যের যে ডিভাইস নিয়ে এসেছিল, তা আজও ফিরিয়ে দেয়নি।'

কারাগারের কষ্টকর জীবনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সেখানে ছিল বৈষম্য। সেখানে অন্য চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ মামলার আসামিরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। কেরানীগঞ্জ কারাগারে তো সব ধরনের সুবিধা যেমনÑ জিম, সেলুন, সুপারশপের মতো দোকান আছে এবং ফেরিওয়ালারা ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু ২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলনের পর আটক হওয়া আলেমদের ২৪ ঘণ্টা লকআপে রাখত। ফাঁসির আসামিদের রাখার জন্য ছোট রুমে সাত-আটজনকে রাখা হতো। এতে ঠিকমতো শোয়া তো দূরের কথা, সোজা হয়ে বসাও যেত না। করোনার কারণে আবার ফ্যামিলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিত না। অন্য আসামিদের বিকল্প হিসেবে সপ্তাহে এক দিন ১০ মিনিট ফোন করতে দিলেও আমাদের সেই সুযোগ দিত না। আমরা চিঠি লিখলেও তা আর পৌঁছাত না। ছয় মাস পর্যন্ত আমার পরিবার আমার সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর জানতেই পারেনি। আমার বাবা পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিলেন। মা কয়েকবার স্ট্রোক করার মতো অবস্থা হয়েছিল। ভাই, নিজের স্ত্রী-সন্তানরা সবাই দুশ্চিন্তায় ছিল যে, আদৌ কি ছাড়বে, কবে ছাড়বে?

মুফতি উসামা বলেন, বাসায় আমার দুটি ছোট বাচ্চা ছিল। তারা কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। বাবা-মা কোন অবস্থায় আছে, মাদরাসা আছে, নাকি বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুই জানতে পারছিলাম না। টানা ছয় মাস এভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। আমার মামলার অবস্থাও জানতে পারিনি। কবে বের হব তা ছিল অজানা।

তিনি বলেন, ছয় মাস পর তাকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে অন্যরা হাউসের পানি নিতে পারলেও আমাদের বাথরুমের লাইনের পানি খেতে হতো। এতে শারীরিক সমস্যা হতো। আমার মাথার বাবরি চুল ঝরে যেত। শরীরে দাউদ হয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ত। চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করেও কাজ হয়নি। থাকার জন্য যে দুটি কম্বল দেওয়া হতো, তা গায়ে দিলে কঠিন চর্মরোগ হতো। গায়ে সূর্যের আলো লাগত না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো আমরা চিড়িয়াখানায় বন্দি আছি। চোর-ডাকাত-খুনি-ধর্ষকরা খেলাধুলা করছে, আড্ডা দিচ্ছে অথচ আমরা লকআপে দুই হাতে শিকলটা ধরে ওই দৃশ্য ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। সবচেয়ে খারাপ লাগত, সবাই যখন লকআপে, তখন বিকালে টপটেররা ব্যাডমিন্টন খেলত, জেলার ও অন্যরা দাঁড়িয়ে তা দেখতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা খেলত। অথচ আমাদের চোখের পানি ঝরানো ছাড়া কিছুই ছিল না। অনশন করে আমরা ঈদের নামাজের সুযোগ করে নিই। এভাবে সবকিছুতে বৈষম্যের শিকার হই।

মুফতি উসামা বলেন, 'আমাকে একটা মামলা দিলেও তা শুনানি হতে হতে দীর্ঘ এক বছর কেটে যায়। ২০২১ সালে ২২ রজমান আটক হয়ে পরবর্তী বছর এক রমজানে মুক্তি পাই কাশিমপুর কারাগার থেকে। বের হওয়ার পরও অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। নিয়মিত চাপে রাখা হতো। সে সময় দেশের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। কেউ কিছু বলতে সাহস পেতেন না। আমি ঝুঁকি নিয়ে জেলখানার বিষয়গুলো মাহফিলে তুলে ধরি।'

নির্যাতিত এই আলেম বলেন, হাসিনার ফ্যাসিবাদের জুলুমের সবচেয়ে বড় দুটো হাতিয়ার ছিলÑ রাজাকার ও জঙ্গি। বয়স বেশি হলে রাজাকার আর বয়স কম হলে জঙ্গি বানানো হতো। আমাকে জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়াতে চেষ্টা করেছিল। আমার বিষয়ে ভারতের কারও সঙ্গে কথাও বলেছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ না পেয়ে জড়াতে পারেনি। তিনি বলেন, সর্বযুগে কাফেরদের চেয়ে মুনাফিকরা বেশি ক্ষতিকর। আওয়ামী লীগের মধ্যে আমরা তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখেছি। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য তাদের চেয়ে বড় ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না।

হাফেজের বিরুদ্ধে কোরআন পোড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ

রকীবুল হক
প্রকাশ : ০২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬: ১৯
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭: ০৬

মাত্র আট বছর বয়সে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হন মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী। দেশের বিভিন্ন কওমি মাদরাসার পাশাপাশি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া করেছেন। শায়খুল হাদিস, ধর্মীয় বক্তা, খতিব ও ইসলামি রাজনীতিক হিসেবে বেশ পরিচিত তিনি। অথচ এই আলেমকেই ‘কোরআন পোড়ানো’র মিথ্যা অভিযোগের মামলায় জেলে নেয় পতিত আওয়ামী সরকার। পরে সন্ত্রাসের বিভিন্ন ধারায় ১০টি মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস কারারুদ্ধ করে রাখে। এ সময় ২৬ দিন রিমান্ডের নামে পবিত্র রমজানে চরম নির্যাতনের মুখোমুখি হন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আফেন্দী।

শুধু গ্রেপ্তার-নির্যাতনই নয়, নিজের হাতে গড়া জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামবাগ মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিসের পদও কেড়ে নেন পতিত আওয়ামী লীগ নেতারা। একইসঙ্গে বাদ দেওয়া হয় ইসলামবাগ বড় মসজিদের খতিবের দীর্ঘ ২২ বছরের দায়িত্ব থেকেও।

এভাবেই বিগত আওয়ামী শাসনামলে দেশের আলেম-ওলামাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছেছিল বলে মনে করেন অন্যতম ভুক্তভোগী মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী। দৈনিক আমার দেশকে তিনি বলেন, ‘আমরা সংবিধান লঙ্ঘন করিনি, জেলে যাওয়ার মতো কোনো অপরাধ করিনি, চুরি-ডাকাতি করিনি; তারপরও আমাদের জেলে নেওয়া হয়। রমজানের মতো তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাসে পুরো সময় রিমান্ডে রাখা হয়েছিল। এই নির্যাতনটা মূলত নেমে আসে সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত অবস্থানের কারণে।’

মাওলানা আফেন্দী বলেন, ‘২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলাদেশে আসছিলেন, তার এই আসাটা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। কারণ, তার হাত অসংখ্য মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। তিনি বাংলাদেশে অতিথি হয়ে আসবেন— এটা আমাদের সহ্য হচ্ছিল না। আমাদের সীমান্তটা সুরক্ষিত নয়। সীমান্তে লাশ পড়ছে, আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা দিচ্ছে না; বরং আমাদের চুষে খাচ্ছে। আগ্রাসন-আধিপত্যবাদ—সব তারা চালাচ্ছে। এরকম দমন-পীড়ন, ভারতীয় মুসলমানদের নির্যাতন—এসব কারণে আমরা মোদির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে রাজপথে নেমেছিলাম। সরকার সেটি হজম করতে পারেনি। ফলে আমাদের জেলে নেয়।’

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী বলেন, ‘আওয়ামী আমলে আলেম নির্যাতন সীমাহীন মাত্রায় পৌঁছেছিল। আলেমদের ধরিয়ে দিতে আমাদের সহযোগিতা চাইত পুলিশ। তা না হলে রাস্তা থেকে কাউকে ধরে এনে জুব্বা-টুপি পরিয়ে দেখানো হতো আমরা হুজুর ধরেছি। কোন থানা কতজনকে ধরেছে, তার প্রতিযোগিতা হত। এটা কী একটি স্বাধীন দেশের চেহারা!’

২০২১ সালে ব্যাপকহারে আলেম-ওলামাদের ধরপাকড়ের ধারাবাহিকতায় গ্রেপ্তার হন মাওলানা মঞ্জরুল ইসলাম আফেন্দী। সেদিনকার ভয়াল স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ‘২০২১ সালে করোনার সময় মসজিদে জামাত নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণে রমজান মাসের দ্বিতীয় তারাবি পরিবার-সন্তানদের নিয়ে বাসায় আদায় করছিলাম। ১৬ রাকাত নামাজ যখন শেষ হয়, তখন ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডের বাসায় কলিংবেলের আওয়াজ পাই। সালাম ফিরিয়ে দরজা খুলতেই দেখি প্রায় দুই গাড়ি মানুষ। দুটি হায়েস গাড়িতে শার্ট-প্যান্ট পরা একদল লোক এসে আমার বাসায় হুট করে ঢুকে পড়ে।

কোনোরকম আলাপ নেই, ভদ্রতা নেই, কোনোরকম সৌজন্যের লেশ তাদের ব্যবহারে দেখতে পাইনি। বাসায় ঢুকেই আমার বেডরুমে যায় পুলিশ। আমি খুব রেগে গেলাম, আমার বাসায় অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়েছেন কেন? বুঝলাম, সম্ভবত আমাকে ধরতে এসেছে, তাহলে এ ধরনের আচরণ কেন? আমার স্ত্রীকে তো আমার ভাইও কখনো দেখেনি। সেই পর্দানশীন স্ত্রীর বেডরুমে চলে যায় পুলিশ। সব মোবাইল ফোন তারা নিয়ে নেয়। তারপর আমাকে বলে রেডি হন। আমি বললাম যাব; কিন্তু এ আচরণ কেন? অসভ্য এক জাতির মতো আচরণ। সেই অসভ্যতা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তারা বলে, বের হন, বের হন। নামাজটা পড়তে চাইলেও সে সুযোগ দেয়নি। বলে বের হন।’

এভাবে মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে আটক করে ডিবিতে নিয়ে রাত এক-দেড়টা পর্যন্ত জেরা করে পুলিশ। সেই রাতের বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘প্রতিদিন হেরোইনসেবীদের ধরে যেখানে রাখা হয়, সেই লকআপে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কী গিজগিজ অবস্থা! গরম। রাত ১টা পর্যন্ত জেরা করে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। রমজান মাসে একটু নামাজের সুযোগ দিল না, সেখানে জায়নামাজ বিছানোর মতো জায়গাও ছিল না। একটু সাহরি খেতে পারছিলাম না। পরদিন কোর্টে উঠিয়ে রিমান্ড মঞ্জুর করল। একটানা ২৬ দিন রিমান্ডে রাখল। মামলার পর মামলা দেওয়া হলো।

একটা মানুষকে নির্যাতন করতে তো একটা মামলাই যথেষ্ট। আমার নামে মামলা দিতে দিতে ১০টা পর্যন্ত দিয়ে দিল। এক মামলায় রিমান্ড শেষে আরেক মামলা দেওয়া হয়। আফেন্দী জানান, রিমান্ডে অনাকাঙ্ক্ষিত, বাস্তবতাবিবর্জিত নানারকম প্রশ্ন করা হয়। যে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের কোনোই সম্পৃক্ততা নেই—সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন করে। প্রশ্নের ধরনগুলো দেখলে মনে হয় তারা মেন্টাল টর্চার করছে। অনেককে শারীরিক নির্যাতনও করেছে বলে শুনেছি। আমাকে শারীরিক নির্যাতন না করলেও মেন্টাল টর্চার করেছে। রিমান্ডে থাকা ও খাওয়ার কষ্ট ছিল বেশি।

আফেন্দী বলেন, 'কারাগারের ভেতরে নেওয়ার পর যা দেখেছি, মানসিক যন্ত্রণায় এতদিন তা কাউকে বলিনি। চুরি, খুন, ছিনতাই, নারী নির্যাতনের দায়ে যারা জেলে গেছে, তারাও সাংবিধানিক বলে জেলে ফোনে কথোপকথনের সুযোগ পেত। সপ্তাহে একবার মোবাইলে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হতো তাদের। কিন্তু আমরা এতটাই দুর্ধর্ষ আসামি ছিলাম যে, কেরানীগঞ্জ থেকে কাশিমপুরের হাইসিকিউরিটি কারাগারে রাখা হয়। সেখানে তাও আবার ২৪ ঘন্টা লকআপে বন্দি। মাসের পর মাস চলে গেলেও পরিবারের সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আমি জানতে পারিনি যে, থাইরয়েড ও ক্যানসারের রোগী আমার স্ত্রী কেমন আছে। ১২ মাস যার চিকিৎসা লাগে, ঘরে আমি সেরকম টাকাও রেখে যেতে পারিনি। তার চিকিৎসার কী অবস্থা? মানুষ যখন পাথর হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে এরকম নির্যাতন চালানো সম্ভব হয়। সুস্থ কোনো মানুষ এমন সীমাহীন নির্যাতন চালাতে পারে বলে আমি মনে করি না।'

মোট ১০টি মামলায় জড়ানো হয় মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে। সবগুলো সন্ত্রাসের ধারায় করা মামলা। আগুন দেওয়া, কোরআন পোড়ানোর মামলা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কোরআনের হাফেজ। আট বছর বয়সে আমি হাফেজ হয়েছি। অথচ আমরাই নাকি কোরআন পোড়াই, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইগুলো পোড়াই, বাসে অগ্নিসংযোগ করেছি। এ ধরনের মামলা দেওয়া হয় আমার বিরুদ্ধে। আইনগতভাবেই সব মামলায় জামিন পেয়েছি। লম্বা সময় জেলে কাটানোর পর একটি একটি করে মামলায় জামিন দেওয়া শুরু হয়। এভাবে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস কেটে যায় কারাগারে।' তিনি জানান, কারামুক্তির পরও তার ওপর আওয়ামী প্রশাসনের যথেষ্ট চাপ ছিল। সরকারবিরোধী কোনো বক্তব্য দিতে পারবেন না, তাদের পরামর্শমতো চলতে হবে। তাদের পরামর্শের বাইরে রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি দেওয়া যাবে না—এ রকম প্রেশার ছিল তার ওপর।

মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী বলেন, 'একটা মানুষকে ধ্বংস করার জন্য ছয় মাস-এক বছর জেলে রাখাই যথেষ্ট। জেলে রাখলে পরিবারটা যাতে ভ্যানিস হয়ে যায়। আমারও যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। আমার স্ত্রীর চিকিৎসায় সমস্যা হয়েছে। এতে শারীরিকভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত না হওয়ায় মানসিকভাবেও সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। পরিবারের ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।'

নির্যাতিত এই আলেম বলেন, ‘শেখ হাসিনা সরকারের সময় একটি ট্রাম্পকার্ড ছিল ‘জঙ্গি’। জঙ্গি তকমা লাগিয়ে ইসলামকে কলুষিত করা, ইসলামের বোধ-বিশ্বাসের জায়গায় যেন আঘাতপ্রাপ্ত হয়, ইসলামকে দেশ-জাতির সামনে বীভৎসরূপে উপস্থাপন করা, কয়েকজনকে নাটক সাজিয়ে জঙ্গি ধরা, রেড অ্যালার্ট জারি করে জঙ্গি ধরা—এসব কর্মকাণ্ড চালায় শেখ হাসিনার সরকার। এসব করে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে দেখানো হয় যে, আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।’

আফেন্দী বলেন, ‘ইসলামের মতো শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম আর নেই। এখানে উগ্রতার কোনো স্থান নেই। আমরা শান্তির পথে থাকি। সম্প্রীতির কথা বলি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে আজীবন সংগ্রাম করি। অথচ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও অসাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যায়িত করে নানাভাবে নির্যাতন চালায় বিগত আওয়ামী সরকার।’

ডান্ডাবেড়ি পরাতে গিয়ে পা রক্তাক্ত করে

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০৩ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৪৩

কওমি অঙ্গনের অন্যতম জনপ্রিয় মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। রাজনৈতিক অঙ্গন ও ধর্মীয় মাহফিলের পাশাপাশি মিডিয়া জগতেও বেশ পরিচিত তরুণ এই আলেম। পতিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের নিপীড়নের থাবা পড়েছিল তার ওপরও। সহজে অনুমতি মিলত না তার ওয়াজ মাহফিলের। এমনকি অনুমতি দিয়েও ভেঙে ফেলা হতো ওয়াজের মঞ্চ। সরকারের 'নিষিদ্ধ আলেমের' তালিকায়ও ছিলেন তিনি। এতকিছু করেও তাকে থামাতে না পেরে বেছে নেওয়া হয় গ্রেপ্তার-নির্যাতনের পথ। ৪৭টি মামলার বোঝা দিয়ে দীর্ঘ আড়াই বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয় তাকে। এ সময় পৌনে দুই মাস রিমান্ডের নামে নির্যাতনের শিকার হন তিনি। নির্যাতনের অন্যতম একটি হাতিয়ার ছিল ডান্ডাবেড়ি। আর সেই ডান্ডাবেড়ি পরাতে গিয়ে তার পা রক্তাক্ত করে দেয় পুলিশ। ডান্ডাবেড়ি লাগাতে গিয়ে লোহার কড়াও ঢুকে যায় মাংসে। রিমান্ডে অসুস্থ হয়ে পড়ায় পুলিশের আরও ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা থেকে রক্ষা পান বলে জানান ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী।

মুফতি রাজী আমার দেশকে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগের সময়ে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন আলেম-ওলামা। মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে ২১ মাস গৃহবন্দি করে রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সে সময় দেশের আলেম-ওলামাসহ ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিবাদ করার অধিকারও হারিয়েছিল। ২০২১ সালে মোদির আগমনের প্রতিবাদ জানিয়ে জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে একটি কর্মসূচি পালন করতে গেলে দলীয় সন্ত্রাসী ও সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে মুসল্লিদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ করা হয়। সেই সূত্র ধরে হাটহাজারীতে বিক্ষোভ হয়। শান্তিপূর্ণ সেই বিক্ষোভে গুলি করে হাটহাজারী মাদরাসার গেটে চারজনকে শহীদ করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় সারা দেশে আন্দোলন-বিক্ষোভ হয়েছে। প্রত্যেকটি বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন,

তাদের থানায় নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। বি-বাড়িয়ায় ৬-৭ দিনের আন্দোলনে অন্তত ১৭ জন শহীদ হন। তিনি বলেন, আলেম-ওলামাদের এই নির্যাতনের বিষয়টি জাতির কাছে স্পষ্ট হলেও আমাদের দুঃখ হলো মিডিয়াগুলো সেভাবে কাভার করতে পারেনি। আওয়ামী সরকারের পতনের পর এখন কিছুটা কাজ করা শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে ‘আমার দেশ’ সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

মোদিবিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক ধরপাকড়ের সময় ২০২১ সালের পয়লা রমজান গ্রেপ্তার হন লালবাগ মাদরাসার মুহাদ্দিস মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। গ্রেপ্তারের পরই একের এক মামলা দিয়ে নেওয়া হয় রিমান্ডে। ২৮ রমজান পর্যন্ত টানা রমজান মাস তিনি রিমান্ডে কাটান। প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে এক সপ্তাহ রিমান্ডে ছিলেন। সেখান থেকে পল্টন থানার রিমান্ডে, তারপর নেওয়া হয় শাহবাগ থানায়। এরপর নেওয়া হয় মতিঝিল থানায়। সেখানে রিমান্ড শেষে আবার ডিবিতে আনা হয়।

মুফতি সাখাওয়াত বলেন, ‘তাদের (পুলিশের) পরিকল্পনা আরও ভয়াবহ ছিল। ঢাকার প্রত্যেকটি থানায় ঘুরেফিরে রিমান্ডে নিয়ে আমাকে টর্চার করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় জরুরিভিত্তিতে ডিবি থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে হস্তান্তর করে। তিনি বলেন, ‘সারা দিন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। রিমান্ডে আগ্রাসী চেহারা নিয়ে আমার চারপাশে বসত পুলিশ। এমন ধরনের প্রশ্ন করত যে, তা শুধু অবাস্তব-অবান্তরই নয়, প্রশ্নগুলোই ছিল আরেক ধরনের নির্যাতন। প্রশ্ন করার ধরন ও অ্যাটিচিউড দেখে মনে হয়েছিল এখনই তারা আমাকে গিলে খাবে, ক্রসফায়ারে দেবে কিংবা টর্চার করে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে ফেলবে।’

গ্রেপ্তারের সময়ের কিছু স্মৃতিচারণ করে মুফতি সাখাওয়াত বলেন, ‘পয়লা রমজান চ্যানেল আইতে টকশোতে ছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে অনুভব করছিলাম আমার পেছনে সন্ত্রাসী ধরনের কেউ ফলো করছিল। তারা আমাকে অ্যাটাক করতে পারে। চালককে দ্রুত বাসায় যেতে বলি। লালবাগ কেল্লার মোড়ের বাসায় এক পা দিয়েই দেখি আগে থেকেই সাদা পোশাকধারীরা অবস্থান করছিল। সেখানে ঢোকার পরই আমাকে আটক করে ফেলে। তারা বলে, তাদের সঙ্গে অফিসে যেতে হবে। ওদের অনেক বড় আয়োজন ছিল, সেটা আগে থেকে আঁচ করতে পারিনি। ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে আমাকে ধরে সোজা ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এরপরই নির্যাতন শুরু হয়।’ তিনি বলেন, ‘১৩ সালের পুরোনো একটি মামলায় প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এরপর রিমান্ড শেষ হয় আর মামলা যোগ হয়, রিমান্ডও যোগ হয়। এভাবে প্রায় পৌনে দুই মাস আমাকে রিমান্ডে রাখা হয়। এভাবে নতুন ১৭টিসহ মোট মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭টি। বিনা অপরাধে আড়াই বছরের মতো জেল খাটি।’

মামলার অভিযোগগুলো হাস্যকর ছিল উল্লেখ করে মুফতি সাখাওয়াত বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক লুট করা, গাছ কাটা, কোরআন পোড়ানো, দেশকে অস্থিতিশীল করা—এ ধরনের আজগুবি কিছু মামলা ছিল। আদালতে ওঠার আগেই এসব মামলা আসলে জামিনযোগ্য। কিন্তু তখনকার আদালত এমন আচরণ করেছে, যেন আদালতই আমাদের প্রতিপক্ষ। তারা মামলাগুলো শুনতেই রাজি হতো না। হাইকোর্টও আমাদের মামলাগুলো শুনত না। তখন

নির্যাতন-নিপীড়নের আরেকটা ধরন ছিল—'স্টে' করে দেওয়া। দীর্ঘদিন ধরে মামলা শোনার পর জামিন পেলেও তা স্টে হয়ে যেত।'

জেলজীবন সম্পর্কে এই আলেম বলেন, 'জেলে সাধারণ বন্দিদের একরকম করে রাখা হয়। কেরানীগঞ্জের কারাগার তো অনেক সুন্দর। সেখানে বিউটিপার্লার পর্যন্ত আছে। পার্ক-খেলার মাঠসহ নানা সুযোগ-সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের জেলে নিয়ে প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের নিচতলাকে 'পানিশমেন্ট সেল' বলা হয়—সেই সেলে এক রুমে ৪-৫ জন করে রাখা হয়। ২৪ ঘন্টা তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। অথচ অন্য আসামিরা জেলে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করত। আমাদের জন্য এটাই ছিল নির্যাতন। সাধারণ বন্দিদের জন্য যে সুবিধা, তার কিঞ্চিতও আমরা ভোগ করতে পারিনি। উল্টো নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখানো হতো।'

মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, 'আমার সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ যে ঘটনা ঘটেছে, তা হলো আমার বাবা আমার খোঁজে কেরানীগঞ্জ কারাগার, কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার ঘুরে বেড়িয়েছেন। কারা কর্তৃপক্ষ স্বীকারই করেননি আমি কোথায় আছি। একসময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল যে, মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজীকে পাশের দেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা জানতাম না। হঠাৎ একদিন রাত ২টার দিকে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে খুঁজতে যায়। আমি আছি কি না জিজ্ঞাসা করে বাইরে প্রচারের বিষয়টি জানায়। শুধু মানসিকভাবে কষ্ট দিয়ে শেষ করে দেওয়ার জন্যই এই চেষ্টা করা হয়েছে।'

অসুস্থ সত্বেও ডান্ডাবেড়ি পরানোর বিষয়ে মুফতি সাখাওয়াত বলেন, 'বেড়ি পরাতে গিয়ে একদিন আমার এক পা রক্তাক্ত করে ফেলেছিল পুলিশ। ডানদিকের পায়ে এখনো সেই চিহ্ন আছে। আমি অনুরোধ করেছিলাম—ক্ষত পায়ে ডান্ডাবেড়ি থাকলে আমি তো অসুস্থ হয়ে যেতে পারি। তারা বলে, ওপরের নির্দেশ, ডান্ডাবেড়ি পরাতেই হবে। ডান্ডাবেড়ি তো অনেক দিনই পরিয়েছে; কিন্তু ওইদিন আমার বেশি কষ্ট হয়। লোহার একটি কড়া হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে পেটাতে বন্ধ করার সময় একপাশ হয়ে আমার পায়ে ঢুকে যায়। এতে রক্তাক্ত হয়ে যায় পা। ওই রক্তাক্ত অবস্থায়ই আমাকে আদালতে নেওয়া হয়। সেখান থেকে হাজতে রাখার সময় হ্যান্ডকাফও পরানো হয়। ওইদিনই আমার বেশি কষ্ট হয়েছে।'

মুফতি সাখাওয়াতকে জঙ্গি-উগ্রবাদের তকমা দেওয়ারও চেষ্টা করেছে পুলিশ। এজন্য ডিবিতে এক সপ্তাহ যাবৎ তার রেকর্ডেড বক্তৃতা শুনেছে পুলিশ কোনো বক্তব্যের সূত্র ধরে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো মামলা দেওয়া যায় কি না। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনার মতো একটি শব্দও তারা খুঁজে পায়নি। এ প্রসঙ্গে মুফতি সাখাওয়াত বলেন, আমরা তো শান্তির জন্য কাজ করি। ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। দেশে কোনো অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হোক—আলেম-ওলামারা কখনোই এটা করেননি। তবে একধরনের মিথ্যা অভিযোগ চাপানোর চেষ্টা করা হতো।

ওয়াজ-মাহফিল নিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানান এই আলেম। তিনি বলেন, একটি মাহফিলের জন্য ৪০ বার অনুমতি নেওয়া লাগত। একপর্যায়ে আয়োজকরা কান্নাকাটি করতেন যে, কোনোভাবেই ওরা (প্রশাসন) অনুমতি দিচ্ছে না। উল্টো জঙ্গি-উগ্র বলে সরকারি

লোকজন আয়োজকদের হুমকি দিত। অনেক সময় অনুমতি দেওয়ার পরও কাছাকাছি পৌঁছে শুনি প্যান্ডেল ভেঙে দিয়েছে, আমাকে আসতে নিষেধ করা হয়। নির্যাতিত এই আলেম বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের বিচার হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি জুলুমের বিচার হওয়া উচিত। তা না হলে এ দেশ স্থিতিশীল থাকবে না।’

জেলের কষ্টে কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায়

রকীবুল হক
প্রকাশ : ০৪ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৪২
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৩৮

দেশের অন্যতম ইসলামি রাজনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আহমদ আব্দুল কাদের লেখক হিসেবেও বেশ পরিচিত। আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনে দেশ ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজপথে সক্রিয় ছিলেন খেলাফত মজলিসের এই মহাসচিব। তবে তার এই প্রতিবাদী কন্ঠ থামাতে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয় সরকার। বিনা অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে সহিংসতার বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে সাড়ে ৪ মাস জেলবন্দি করা হয়। রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নির্যাতন করা হয় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের এই নায়েবে আমিরকে। আর জেল জীবনে নানা ভোগান্তিতে তার কিডনি প্রায় ড্যামেজ হয়ে যায়।

২০২১ সালে দেশে নরেন্দ্র মোদির আগমনবিরোধী প্রতিবাদ-বিক্ষোভের জেরে গণহারে গ্রেপ্তার-নির্যাতনের শিকার হন দেশের প্রতিবাদী আলেম-ওলামারা। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই গ্রেপ্তার আতঙ্ক নিয়ে চলাফেরা করতেন অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের। তাতে শেষ পর্যন্ত সেই গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা পাননি তিনি।

গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হওয়া প্রসঙ্গে তিনি আমার দেশকে বলেন, দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে আওয়ামী সরকার হেফাজতে ইসলাম নেতাদের তালিকা ধরে ধরে গ্রেপ্তার করা শুরু করে। ২০২১ সালে এ ধরনের ধরপাকড়ের কারণে যেকোনো সময় গ্রেপ্তারের বিষয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। একপর্যায়ে একটি সূত্রে গ্রেপ্তারের তালিকায় আমার নাম থাকার

কথা জানতে পেরে নিজের বাসা ছেড়ে মেয়ের বাসায় অবস্থান নিয়েছিলাম। ২১ রমজান ইফতারের আগে আমার পশ্চিম আগারগাঁওয়ের বাসায় হানা দেয় গোয়েন্দা পুলিশ। কিন্তু সেখানে আমাকে না পেয়ে ছেলেকে ধরে চাপ দিয়ে আমার অবস্থান নিশ্চিত করে পুলিশ। মেয়ের বাসা থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় আমাকে।

রমজানের রোজা শেষে যখন ইফতার সামনে নিয়ে বসে ছিলেন, তখনই প্রায় ৭০ বছর বয়সী এই ইসলামি চিন্তাবিদকে ধরতে আসে সাদা পোশাকধারী পুলিশ। এতে বাসার সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে সামান্য ইফতারের সুযোগ দেওয়ার পর তাকে ধরে নিয়ে যায় সোজা মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় একটি গারদ রুমে। ওই রুমে আগে থেকেই হেফাজতে ইসলামের বেশ কয়েকজন নেতা ছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্বিষহ জীবনযাপন।

আহমদ আব্দুল কাদের বলেন, ডিবি হাজতে ছোট একটা রুমে তাদের ১২ জনকে রাখা হয়। একদিকে রোজার দিন, অন্যদিকে প্রচণ্ড গরম মৌসুম। রুমের বাইরে একটি ফ্যান থাকলেও তাতে কোনো কাজ হতো না। দুর্বিষহ জীবন কেটেছে সেখানে। স্বাভাবিকভাবে শোয়া বা ঘুমানোর সুযোগ ছিল না সেখানে। শোয়ার সময় একজনের মাথার দিকে আরেকজনের পা দিয়ে আমরা ঘুমাতাম। একটা বাথরুম থাকলেও তার কোনো দরজা ছিল না। সেটি ব্যবহারের সময় একটি শেড দিয়ে রাখা হতো, এতে বোঝা যেত যে ভেতরে কেউ আছে। রোজার সময় সেই রুমেই তারাবির নামাজ আদায় আর সাহরি খান তারা।

হেফাজতে ইসলামের এই শীর্ষ নেতা বলেন, গ্রেপ্তারের পর ডিবিতে এনে তার বিরুদ্ধে ২০২১ সালের সহিংসতার একটি মামলা দেওয়া হয়। সেই মামলায় পরের দিন আদালতে তুলে পাঁচ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। আদালতে তোলার সময় কয়েকজন পুলিশ তাকে হ্যান্ডকাফ পরায়। এভাবে যতবারই আদালতে তুলেছে, ততবারই তাকে হ্যান্ডকাফ পরায় পুলিশ।

ডিবির রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে আহমদ আব্দুল কাদের বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, আপনাদের আন্দোলনের অর্থের উৎস কী? ইউনিয়ন পর্যন্ত হেফাজতের কমিটি করছেন, এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন? আমি বলেছিলাম, হেফাজতে ইসলাম করার জন্য অর্থের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেকোনো জায়গায় গেলে এমনিতেই লোক আসে। হেফাজতের প্রোগ্রাম করতে একটা মাইক আর ব্যানার লাগে। লোকজনকে বললেই চলে আসে। তাদের পেছনে কোনো খরচ করতে হয় না। সবাই নিজের খরচেই এই আন্দোলন করেন।

রিমান্ড শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় খেলাফত মজলিসের এই নেতাকে। প্রথমে নেওয়া হয় কেরানীগঞ্জ কারাগারে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা লকআপে আটকে রাখা হতো। সাধারণ অন্য বন্দিদের মতো বাইরে বের হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না। সেখান থেকে

রোজার ঈদের আগে পাঠানো হয় কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে। সেই কারাগারেই পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছাড়াই ঈদ কেটে যায়।

তিনি বলেন, কাশিমপুর কারাগারের মান কিছুটা ভালো হলেও সেখানেও রাখার পর প্রথম দিকে আমাদের রুম থেকে বের হতে দেওয়া হতো না। অনেক দেনদরবার করে আধা ঘণ্টার জন্য বের হওয়ার সুযোগ দিত। সেই সুযোগে আমরা জোহর ও আসরের নামাজ পড়তাম। মাগরিবের নামাজের আগেই লকআপে ঢুকিয়ে তালা দেওয়া হতো। রাতে লাইট জ্বালানো থাকায় আমি ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি। এতে আমার কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায়। আগে থেকেই আমার কিডনি সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় জেলের ডাক্তার কিছু চিকিৎসা দেন। আমরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া জানালেও জেল কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেয়নি।

এভাবে সাড়ে ৪ মাসের মতো জেলে কাটিয়েছেন তিনি। আহমদ আব্দুল কাদের বলেন, পতিত আওয়ামী সরকারের সময় আমার ওপর ব্যাপক জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় মাত্র একটি মামলা দেওয়া হয়। পরে জেলখানায় থাকাবস্থায় একের পর এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। কিছু মামলা ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরের ঘটনার, অনেকগুলো ছিল ২১ সালের মোদিবিরোধী আন্দোলনের সময়কার। হাটহাজারীতে ছাত্র মারা যাওয়ার ঘটনায়ও আমার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে।

কারাবন্দিত্বের সময় পরিবারের ওপর প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। আমার গ্রেপ্তার নিয়ে তারা সবাই উদ্বিগ্ন ছিল। তবে সবাই ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।

আওয়ামী আমলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের বাধা ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, তারপরও আমরা বাধা উপেক্ষা করে যতটুকু পেরেছি করেছি। তিনি বলেন, পুলিশের গ্রেপ্তারের তালিকায় নিজের নাম থাকার খবর আগেই পেয়েছিলাম। সে সময় অনলাইন মিটিংয়ে তিনি নেতাকর্মীদের বলেন, গ্রেপ্তার কপালে থাকলে হতেই হবে, এটা ঠেকানো যাবে না। আমাদের আগের বড় বড় আলেম-ওলামা, ইমাম সাহেবরাও জেলখানায় গেছেন। জেলখানা হলো আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের পূর্বপুরুষ আলেমরাও গ্রেপ্তার হয়েছেন। কাজেই এটা নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জেল-জুলুম আসবেই, এটাকে বরণ করতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে।

কারামুক্তির পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না তার। তিনি দলীয় কার্যালয়ে গেলে সেখানে গোয়েন্দারা বসে থাকতেন। তবে ওই পরিস্থিতিতেই কারামুক্তির সপ্তাহখানেক পর স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেন তিনি। জুলাই বিপ্লবের পর এখন সাধারণ নাগরিকদের মতো আলেম-ওলামারাও খুব স্বস্তিতে আছেন বলে জানান ড. আহমদ আব্দুল কাদের।

তিনি বলেন, ২০১৩ সালে আলেম-ওলামাদের ওপর সবচেয়ে বড় জুলুম-নির্যাতন হয়েছিল। শাপলা চত্বরে ওই জুলুমটা হয়েছিল একদম নিরীহ লোকদের ওপর। সেখানে অল্পবয়সীরাও ছিল। মানুষ মারার কথা সরকার স্বীকার করেনি, কিন্তু বেসরকারি বিভিন্ন হিসাবে দেখা গেছে, কমপক্ষে ২০০ লোক মারা গেছে।

শাপলা চত্বরের ওই ঘটনার পর সারাদেশে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটির তালিকা দেখে দেখে আলেমদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে। এই মামলাগুলো চালু ছিল না, ২০২০-২১ সালে যখন হেফাজত পুনর্গঠন হলো, তখন সেই মামলাগুলো নতুন করে চাঙা করা হয়। সে সময় দেশের শীর্ষ আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে হাটহাজারীতে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনেক ছাত্র ও মানুষ মারা গেছে। এরপর শত শত মানুষের নামে নতুন করে মামলা হয়।

স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার মিথ্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াতকারী বলে প্রচার করা হতো। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে বাস্তব কর্মকাণ্ড ছিল তার উল্টো। আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতন, গ্রেপ্তার, মামলা দিয়ে হয়রানি করা, হাজার হাজার মানুষকে জেলে ঢোকানোÑ এসব কাজ করার পরও যদি কেউ বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি, বিষয়টি তো কষ্টকর। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে হত্যাযজ্ঞ তো চোখের সামনে ঘটেছে। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী তার ক্ষমতায় থাকার জন্য দুই হাজার মানুষ মেরে ফেলতে পারে, ২০-৩০ হাজার মানুষকে পঙ্গু করতে পারেÑ এটা তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

জঙ্গি অপবাদে ৬ মামলা, ২১ দিনের রিমান্ড

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০৬ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ০০

নিরীহ আলেম হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ রাজধানীর লালবাগ মাদরাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজপথে কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে তিনি নানাভাবে বাধাবিঘ্ন ও পিটুনির শিকার হন।

পুলিশের গ্রেপ্তারের হাত থেকেও রেহাই পাননি ইসলামী ঐক্যজোটের এই সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। বিনা অপরাধে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে তাকে জড়ানো হয় জঙ্গি-সন্ত্রাসীসংশ্লিষ্ট ছয় মামলায়। ছয় মাস জেলে কাটাতে হয় তাকে।

এমনকি ২১ দিন রিমান্ডের নামে মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগরের সহসভাপতি মাওলানা যুবায়ের আহমাদ। গ্রেপ্তারের তিন মাস পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলেন তিনি। এ ছাড়া জেলে থাকার কারণে মাদরাসার চাকরি থেকেও তাকে বাদ দেয় কর্তৃপক্ষ।

আওয়ামী সরকার যতবারই ক্ষমতায় এসেছে, ততবারই দেশের আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে বলে জানান মাওলানা যুবায়ের আহমাদ। আমার দেশকে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসেই জুলুম-নির্যাতন করে এ দেশ শাসনের চিন্তা করে।

তারা আলেম-ওলামাদের ওপর জুলুম-নিপীড়নের পাশাপাশি মাদরাসা-মসজিদ বন্ধের চেষ্টা চালায়। এভাবে তারা ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার চিন্তা করেছিল। কিন্তু জনগণ তাদের জুলুমের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ায় দ্বিতীয়বার আর ক্ষমতায় আসতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় টার্মে ক্ষমতায় এসে জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চিন্তা করেন। সে অনুযায়ী ১৫ বছর জুলুম করে মনে করছিল যে আমি টিকে গেছি। কিন্তু জুলুমেরও তো একসময় শেষ আছে। আল্লাহ জালেমকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। সেই অবস্থাটাই হয়েছে গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে। তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে পতিত আওয়ামী সরকার আলেম-ওলামাদের ওপর এত জুলুম করেছে, যা আগে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না।

যুবায়ের আহমাদ বলেন, বিগত সরকারের সময়ে মুফতি আমিনীকে একাধিকবার জেলে নেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গৃহবন্দি থাকা অবস্থায় তার মৃত্যুবরণ হয়। সেই আমিনীকে দমানোর জন্য কি না করেছে সরকার? তার ছেলেকে গুম করেছে, জেলে নিয়ে কষ্ট দিয়েছে। তারপরও তিনি দমেননি।

শাপলা চত্বরের ঘটনায় শত শত মানুষ হতাহত হয়েছে উল্লেখ করে হেফাজতের এই নেতা বলেন, সে সময় হত্যাকাণ্ড নিয়ে শেখ হাসিনা ব্যঙ্গ করেন। বলেনÑ ওরা রক্ত মেখে শুয়ে ছিল, যখন পুলিশ খোঁচা দিয়েছে, তখন উঠে দৌড় দিয়েছে। নিষ্ঠুরতার একটা সীমা থাকা দরকার। মানুষ যেখানে আহত-নিহত হয়েছেন, সেখানে তিনি এভাবে আলেম-ওলামাদের দমন-পীড়ন করেন।

এ প্রসঙ্গে যুবায়ের আহমাদ জানান, সেদিন পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মতিঝিলের একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার ছেলে। রাতে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে সেখানে যান।

পথে দেখতে পান, বায়তুল মোকাররমের আশপাশের এলাকায় রক্তে রঞ্জিত রাস্তায় সিটি করপোরেশনের গাড়ি এসে পানি দিয়ে পরিষ্কার করছে। ময়লার একটি গাড়ির পেছন দিকে ময়লার সঙ্গে রক্ত ঝরছিল আর ছেঁড়া পাঞ্জাবি-টুপি ছিল। মতিঝিলের শাপলা চত্বরের পাশের একটি মসজিদে গিয়ে দেখি বহু আহত ব্যক্তি কাতরাচ্ছে। ছেলে ছাড়াও আহত কয়েকজনকে পাশের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি।

২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে আলেম-ওলামাদের ব্যাপকহারে ধরপাকড় চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। একপর্যায়ে গ্রেপ্তার হন মাওলানা যুবায়ের আহমাদ।

গ্রেপ্তারের সময়কার দৃশ্য মনে করে তিনি বলেন, রমজানের ৪ তারিখে লালবাগ কেল্লার মোড়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রথমে তাকে নেওয়া হয় ডিবিতে। পরে আদালতের মাধ্যমে সেখানে ২১ দিনের মতো রিমান্ডে নেওয়া হয় এই আলেমকে।

রিমান্ড শেষে তাকে নেওয়া হয় কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে। পরে নেওয়া হয় কাশিমপুর কারাগারে। এভাবে দীর্ঘ ছয় মাস তাকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়। রিমান্ডে মানসিক নির্যাতনসহ চরম কষ্টের মধ্য দিয়ে এই সময়গুলো পার করেন তিনি।

যুবায়ের আহমাদ জানান, 'রমজান মাসে বাসায় ইফতারির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমিও ইফতার তৈরিতে সহযোগিতা করছিলাম। মাগরিবের আগে হঠাৎ আমার বাসায় নক করে ডিবি পুলিশ। বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি দেখে রাস্তার লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ভিড় করেন। নক করার পর দরজা খুলতেই দেখি ডিবি পুলিশের কয়েকজন সদস্য।

তারা পরিচয় দিয়ে বলেন, আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলামÑ আমার কোনো ওয়ারেন্ট আছে কি না, কেন আটক করা হচ্ছে? তারা বলল এত কথা বলার সুযোগ নেই, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যান। ওরা একটা অ্যাগ্রেসিভ আচরণ করেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন হিন্দু অফিসার। খুব তাড়াতাড়িই আমাকে বের হতে হলো। সেখান থেকে সোজা ডিবি অফিসে নিয়ে রাখা হয়।

ডিবি অফিসে নিয়ে ইফতারের পর তাকে বসিয়ে রাখা হয়। একপর্যায়ে তার আত্মীয় মাওলানা জসিম উদ্দিনের সন্ধান চান। তিনি বাসার নম্বর না দিলেও এলাকার নাম বলেন। পরে তাকেও আনতে যায় পুলিশ।

যুবায়ের আহমাদ বলেন, ডিবিতে একজন অফিসার তার বিস্তারিত তথ্য নেন। একপর্যায়ে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গারদে নেওয়া হলে সেখানে গ্রেপ্তার করে আনা আরও অনেক আলেমের সঙ্গে দেখা হয় তার।

আগে থেকে কোনো মামলা না থাকলেও ডিবিতে নিয়ে জঙ্গি-সন্ত্রাসীসংক্রান্ত ছয়টি মামলা দেওয়া হয় মাওলানা যুবায়ের আহমাদের বিরুদ্ধে। একের পর এক বিভিন্ন থানায় ২১ দিন রিমান্ডে ছিলেন তিনি। রিমান্ডে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কত দিন ধরে তিনি রাজনীতি করেন। কোথায় থাকেন, কেমনে চলেন? এসব রাজনীতি করেন কেন? মানুষ মারার রাজনীতি কেন করেন ইত্যাদি। এভাবে শারীরিক নির্যাতন না করলেও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাকে। এ সময় গালাগাল-খারাপ ব্যবহার করা হয়।

জেলজীবন সম্পর্কে এই আলেম বলেন, জেলে গিয়ে প্রথমে খুব খারাপ লাগছিল। কারণ তিনি প্রথমবারের মতো জেলে যান। তাকে জেলের জঙ্গি বিল্ডিংয়ে রাখা হয়। কাশিমপুরে থাকাকালে তাদের সঙ্গে চোর-বাটপার ও ছিনতাইকারীদেরও রাখা হয়। জেলে ঢোকানোর আগে অন্যদের সঙ্গে আলেম-ওলামাদেরও পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাইন করে বসতে বলা হয়। তারপর একজন একজন করে পুরো শরীর তল্লাশি করে। পরে এক এক করে জেলের ভেতরে ঢোকানো হয়।

কারাগারে সাধারণ কয়েদিদের মতো কোনো সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি এই আলেমকে। অন্যরা টেলিফোন সুবিধা ও বাইরের খাবার কেনার সুযোগ পেলেও, তার ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অন্যান্য সেলের বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে কথা বলার সুযোগ পেলেও তিনি তা পাননি। তিন মাস পর্যন্ত তার পরিবারের কোনো খোঁজখবর নিতে পারেননি তিনি। পরিবার কিছুই জানতে পারেনি। চার মাসের মাথায় পরিবার খবর পায় যে তিনি কাশিমপুরে আছেন।

দীর্ঘ চেষ্টার পর পর্যায়ক্রমে ছয়টি মামলায় জামিন পান তিনি। এ প্রসঙ্গে যুবায়ের আহমাদ বলেন, ‘আমি একাই ছিলাম উপার্জনকারী ব্যক্তি। জেলে যাওয়ার কারণে ছয় মাস পরিবারের সদস্যদের খুব কষ্ট হয়ে গেছে। জমানো টাকা খরচ করে সংসার চালিয়েছে পরিবার।

আইন-আদালত করতে গিয়েও অনেকটা নিঃস্ব হয়ে যান তারা। এদিকে জেলে যাওয়ার কারণে লালবাগ মাদরাসার শিক্ষক পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর সেই কর্মস্থল ফিরে পাই। তিনি বলেন, আমি আলোচিত কেউ ছিলাম না, আমাকে গ্রেপ্তার করা হবেÑ এটা কখনো মনেই করিনি। কারণ আমি অনেকটা নিরীহ ছিলাম।

অনেক মানুষ শেখ হাসিনার পতন দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সবাই হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। মনে করছিলেনÑ এই জুলুম-নির্যাতনে মনে হয় শেষ হবে না। আসলে জুলুমের মাত্রা যখন বাড়ে, আল্লাহর সাহায্য তখনই আসে, যেমন এবার এসেছে। এমনই মন্তব্য করেন জেল-জুলুমের শিকার এই আলেম।

এসব জুলুম-নির্যাতনে জড়িতদের যথাযথভাবে আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত বলে মনে করেন মাওলানা যুবায়ের আহমাদ। তিনি বলেন, তারা যেভাবে গুম, খুন, অত্যাচার করেছে, তাতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। বরং তাদের ফাঁসি ছাড়া আর কোনো বিচার এ জাতি মেনে নেবে বলে মনে হয় না। এই বিচার করলে ফ্যাসিবাদীদের কেউ মুক্তি পাবে বলে মনে করি না।

হাতকড়া পরিয়ে রিমান্ডে অকথ্য গালাগাল

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০৮ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ০৪

পতিত আওয়ামী সরকারের চরম নিপীড়নের শিকার হন মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিবের পাশাপাশি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিবের দায়িত্বে থাকা এই নেতাকে দীর্ঘ ১৮ মাস জেলে কাটাতে হয়েছে।

কয়েক দফায় ৩৯টি বানোয়াট মামলায় জড়ানো হয় তাকে। একটানা ১৭ দিনসহ মোট ২৮ দিন রিমান্ডের নামে পুলিশি হয়রানি, নির্যাতন ও গালাগালের শিকার হয়েছেন এই আলেম। জেলে থাকাবস্থায় তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীও স্বামীর অনুপস্থিতিতে দুর্ভোগে পড়েন। বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও।

এসব জুলুম-নির্যাতন প্রসঙ্গে মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন আমার দেশকে বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের আমলে আলেম-ওলামাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে তাদের ধরপাকড় করা হয়েছে। এমনকি অনেককে বিচারের নামে ফাঁসিতেও ঝোলানো হয়েছে। ২০২১ সালে রাজধানীর দোলাইরপাড়ে শেখ মুজিবের ভাস্কর্য স্থাপনের প্রতিবাদ করায় এ দেশের ওলামায়ে কেরামের ওপর সরকারের কুদৃষ্টি পড়ে।

তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করে আলেমদের নির্যাতন করার পরিকল্পনা করা হয়। তিনি বলেন, সরকারের এসব জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে রাস্তায় থাকায় আমাকেও খোঁজা শুরু করে পুলিশ। মাওলানা মামুনুল হক যখন গ্রেপ্তার হন, তার আগে থেকেই তার সঙ্গে মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসায় ছিলাম। তাকে গ্রেপ্তারের পরও সেখানে ছিলাম আমি। এটা হয়তো পুলিশের গোয়েন্দা সদস্যরা টের পেয়েছিলেন। একপর্যায়ে এপ্রিলের ২০ তারিখে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আতাউল্লাহ আমীন বলেন, রোজার মাসে সেদিন তারাবি পড়ে জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসার মেহমানখানায় বসেছিলাম। এমন সময় নিচে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আনাগোনা দেখতে পাই। এর মধ্যে র‍্যাব-২-এর একজন অফিসার মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে এসে বলেন, আতাউল্লাহ আমীন আছেন কি না, তাকে তুলে দিতে হবে। একপর্যায়ে রাত ১২টার দিকে আমি সাক্ষাৎ করে কাপড়চোপড় নিয়ে তাদের সঙ্গে যাই।

২০১৩ সালে হেফাজতের ঘটনায় তিন থানায় ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগসহ ২৫টির মতো মামলার এজাহারে মাওলানা আতাউল্লাহর নাম ছিল। ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে বায়তুল মোকাররমে একটি কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক নির্যাতন চালায় পুলিশ।

ওই ঘটনায় ১০টি মামলায় বিএনপি-জামায়াত নেতাদের সঙ্গে তাকেও জড়ানো হয়। ২০২১ সালের মোদিবিরোধী আন্দোলনের সময়কার মামলায়ও তার নাম আছে। এ জন্য মানসিকভাবে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি। দুই বছরে ৩৯টি মামলা দেওয়া হয় এই আলেমের বিরুদ্ধে।

২০ তারিখে গ্রেপ্তার করেই প্রথম র‍্যাব-২-এ নিয়ে যাওয়া হয় আতাউল্লাহ আমীনকে। সেখান থেকে র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি বিকালে পল্টন থানার একটি মামলায় তাকে হস্তান্তর করা হয়।

পরের দিন পল্টন থানা থেকে সন্ত্রাসবিরোধী ধারার একটি মামলায় কোর্টে উঠিয়ে ১০ দিনের রিমান্ড চাইলে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এরপর পল্টন থানায় আরেকটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে মতিঝিল, শাহবাগ ও রমনায় একটি করে মামলা মিলে পাঁচ মামলায় প্রথম দফায় একটানা ১৭ দিন রিমান্ডে নেওয়া হয় তরুণ এই আলেমকে। আরও দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখালেও তাতে রিমান্ড হয়নি। সাতটি মামলা মাথায় নিয়ে ১৮ মাস এক দিন জেলে কাটাতে হয়।

১৭ দিনের রিমান্ডে পুলিশি নির্যাতনের ভয়াবহ তথ্য তুলে ধরে মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন বলেন, প্রথমে পল্টন থানার আট দিন রিমান্ডে আমরা একসঙ্গে প্রায় ১০ জন ছিলাম। ওই থানার তৎকালীন ওসি অনেকটা দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে সেখানে তেমন কষ্ট হয়নি। বাইরে থেকে কিছু খাবার নেওয়ারও সুযোগ দিত না। পল্টন থেকে নেওয়া হয় মতিঝিল থানার তিন দিনের রিমান্ডে। সেখানে খুব কড়াকড়ি ছিল। ওসি আমাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

কিছু ধমক ছাড়া তিনিও তেমন খারাপ ব্যবহার করেননি। তবে রমনা থানায় তিন দিনের রিমান্ডে অনেক কষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের এই নেতা। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবারে আমাকে সেখানে নেওয়া হয়। পরদিন জুমার নামাজের পর ওসি মনির মিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকেন। সেখানে সরকারদলীয় কিছু লোকজনও ছিলেন।

থানার মধ্যেই হাতকড়া পরিয়ে তার সামনে আমাকে নিয়ে যায় পুলিশ। এক কথা, দুই কথায় আমার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে ভৈরব বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ‘ও

তাহলে আপনি জঙ্গি শফিকুরের এলাকার লোক।' শফিকুর রহমান নামের একজন হরকাতুল জিহাদের লোক আছেন ওই এলাকায়। উনিও এখন জেলে আছেন। আমি বলেছি, শফিক সাহেবের সঙ্গে তো আমার কোনো যোগাযোগই নেই। তবে তাকে চিনি, ছোটবেলায় দেখেছি। এরপরই শুরু করে গালাগাল। খালেদা জিয়ার আঁচলের নিচে তোরা খুব আনন্দ পাস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তোদের কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি দিলেন, এতগুলো মসজিদ বানালেন, আরও নানা কথা বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন ওই ওসি। তিনি একপর্যায়ে আমাকে মারতে উঠে আসেন। আমাকে কোনো উত্তর দেওয়ার সুযোগই দেননি। একতরফা রাগ হয়ে কথা ও গালাগাল করছিলেন। একপর্যায়ে তিনি আমাকে জুতা দিয়ে মারতে উদ্যত হন। তখন আমার হাতকড়া পরানো ছিল।

পরে পত্রিকায় পড়েছি সেই ওসি মনিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয়েছে এবং দুর্নীতি করে মোহাম্মদপুর বসিলা এলাকায় পাঁচতলা বাড়ি করেছেন। তার বাড়ি সম্ভবত রাজবাড়ী। একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তার চেয়ারে বসে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ও বিরোধীদলীয় নেতাকে যেভাবে গালাগাল করলেন, আলেম-ওলামাদের যে অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন তা চিন্তা করা যায় না। আমার কোনো কথাই তারা শুনলেন না। একপর্যায়ের তার সামনে থেকে আমাকে নিয়ে যেতে বলেন। তার আচরণ আমাদের এতটা কষ্ট দিয়েছে যে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

মাওলানা আতাউল্লাহ বলেন, 'রমনায় রিমান্ডের এই তিন দিন অনেক কষ্টে গেছে। আমার মামলার আইও ছিলেন মাহফুজ, তিনিও আলেম-ওলামাদের নিয়ে নানা আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন, সরকারের পক্ষে যা যা বলার বলেছেন। নিরপেক্ষ থাকার কথা, অথচ পুলিশের আচরণ সবসময়ই ছিল সরকারদলীয় ক্যাডারদের মতো।'

কেরানীগঞ্জের জেলজীবনের বর্ণনা দিয়ে মাওলানা আতাউল্লাহ বলেন, 'সেখানে থাকাকালে আসরের পর ৪০ মিনিটের জন্য শুধু বারান্দায় হাঁটাচলার সুযোগ দেওয়া হতো, কখনো আবার তাও দেওয়া হতো না। কারাগার থেকে যাতায়াতের সময় হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় জঙ্গি-দাগি আসামির মতো আলাদা গাড়িতে আমাদের আনা হতো।'

গ্রেপ্তারের সময় মাওলানা আতাউল্লাহর স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তাই জেলখানায় খুব টেনশনে ছিলেন তিনি। কিন্তু কোনো ধরনের যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয়নি তাকে। কারও সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগের সুযোগও ছিল না। অথচ সাধারণ বন্দিদের টাকার বিনিময়ে মোবাইলে কথা বলার সুযোগ রয়েছে।

একপর্যায়ে এক কারারক্ষীর মাধ্যমে তার মেয়ে হওয়ার এক দিন পর খবর পান তিনি। ওই কারাগারে ব্যাপক দুর্নীতি হয় জানিয়ে তিনি বলেন, কারাগারে টাকা রাখা নিষেধ, কিন্তু সেখানে টাকার লেনদেন হয়। যাদের কাছে টাকা থাকে, তারা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু তাদের সেলের কাছে কোনো ফেরিওয়ালাও আসত না। এভাবে সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তিনি।

মাওলানা আতাউল্লাহ বলেন, জেলখানার খাবার এমনিতেই ভালো না। তারপর আবার হয় দুর্নীতি। যে মান ও মেন্যুর খাবার দেওয়ার কথাÑ তা ঠিকমতো দেওয়া হয় না। এমন খাবার খেয়েই রোজা রাখতে হয়েছে জেলে। তিনি বলেন, কাশিমপুর কারাগারে থাকার সময় একে একে সাতটি মামলায় আমার জামিন হয়। জামিনের জন্য সপ্তাহে দু-এক দিন কোর্টে আসতে হয়। এ সময় বেশ কষ্ট হয়।

সব মামলায় জামিন শেষে জামিনে মুক্তির প্রস্তুতির সময় হঠাৎ আমাকে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের মামলায় সেখানে যেতে হবে। ২০২২ সালের মার্চে সেখানে কোর্টে উঠিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়।

অথচ তখন আমার সঙ্গে কোনো কাপড়চোপড় ছিল না। তবে সেখানে আগে থেকে থাকা মামুনুল হক ও মনির হোসাইন কাসেমী ছিলেন, তাদের রুমে থাকতে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে সিদ্ধিরগঞ্জের চারটি মামলায় আমাকে জড়ানো হয় অথচ আমি কখনো সেখানে যাইনি। দীর্ঘ দুই মাস কারাগারে ছিলাম। পরে জেনেছি, আমার জামিন যাতে না হয় সে জন্য নিম্ন আদালত-সংশ্লিষ্টদের বলে দেওয়া হয়েছিল।

১৮ মাস জেলজীবনে ভয়াবহ কষ্টের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হন মাওলানা আতাউল্লাহ। তার অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর প্রসূতি অস্ত্রোপচারসহ অন্যান্য খরচ মেটাতে হিমশিম খান সংশ্লিষ্টরা। এমনকি মাওলানা আমিনের হজ এজেন্সির একটি লাইসেন্স বাতিল এবং অফিস বন্ধসহ ব্যবসায়িকভাবেও তাকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এ ছাড়া মামলা চালাতে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়েছে এই হেফাজত নেতার।

রিমান্ডে বিদ্যুতের শকে বেঁহুশ হয়ে যেতাম

রকীবুল হক

প্রকাশ : ১০ জানুয়ারি ২০২৫, ০৮: ৫৫

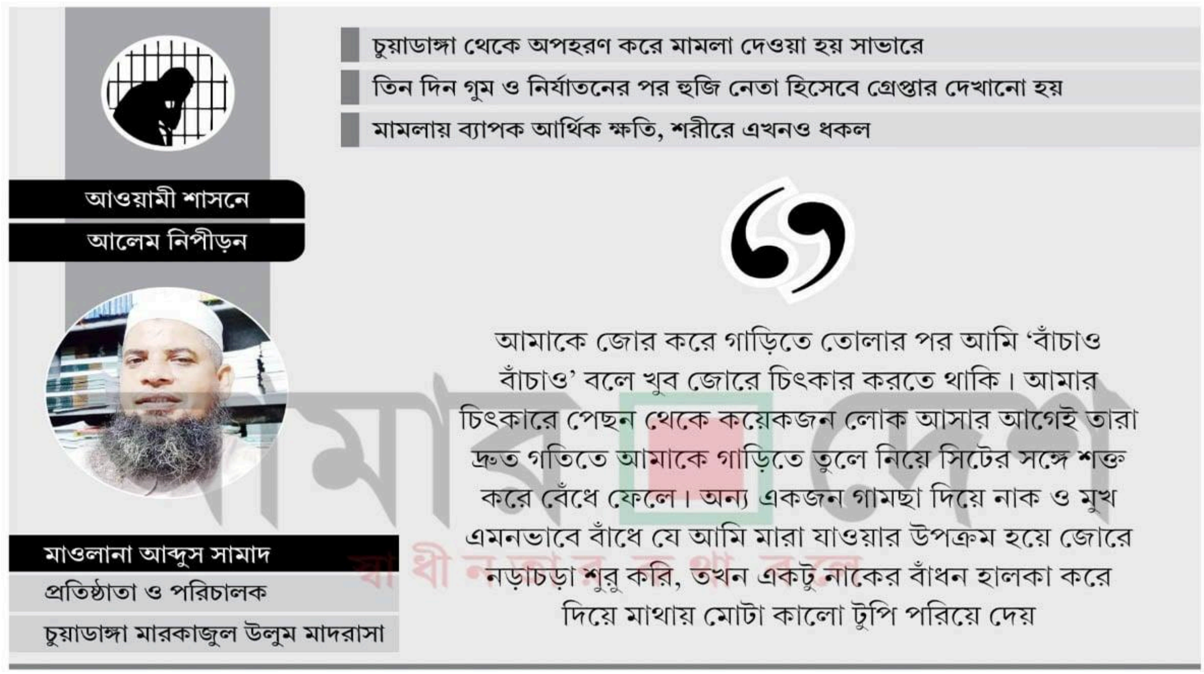

চুয়াডাঙ্গায় মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি একটি কওমি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে এলাকায় বেশ সম্মানজনক অবস্থান ছিল মাওলানা আব্দুস সামাদের। কিন্তু পতিত আওয়ামী সরকারের সময়ে র‍্যাবের জঙ্গি নাটকের নামে বর্বর নির্যাতনে পাল্টে যায় তার জীবন। গ্রামের বাড়ি থেকে নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে তাকে অপহরণ করে সাদা পোশাকধারীরা।

তিন দিন গুম রেখে নির্মম নির্যাতনের পর সাভার থানায় মামলা দিয়ে হাজির করা হয় হরকাতুল জিহাদ (হুজি) নেতা হিসেবে। পর্যায়ক্রমে ১৪ দিন রিমান্ডে নিয়ে তাকে বিদ্যুতের শক দিয়ে জঙ্গি হিসেবে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চালানো হয়। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে দেড়

বছর জেল খেটেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলার এই সভাপতি। এতে শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি।

আওয়ামী সরকারের সময়ে আলেম-ওলামাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের অন্যতম সাক্ষী মাওলানা আব্দুস সামাদ। র‌্যাবের হাতে অপহরণ, গ্রেপ্তার আর জঙ্গি নাটকে লোমহর্ষক নির্যাতনের কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন আমার দেশে-এর কাছে। এ বিষয়ে এরই মধ্যে বর্তমান সরকার গঠিত গুম কমিশনকে লিখিতভাবে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা পরিষদের এই সহসভাপতি জানান, ২০১১ সালের ২৩ মে নিজ গ্রাম চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানার দর্শনার লোকনাথপুর থেকে মোটরসাইকেলে সিঅ্যান্ডবিপাড়ার চুয়াডাঙ্গা আদর্শ মহিলা কওমি মাদরাসায় যাচ্ছিলেন।

সকাল ১০টার দিকে জয়রামপুর কাঠালতলা থেকে কয়েক শ গজ দূরে পুকুরের কাছে পৌঁছালে পেছন থেকে সাদা মাইক্রোবাস এসে তার গতিরোধ করে। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে কয়েকজন নেমে তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অনেক দূরে গাড়ি চালিয়ে অজানা স্থানে নিয়ে তিন দিন গুম রেখে অমানবিক নির্যাতন চালায়।

একরাতে গাড়িতে অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে ভোরবেলায় সন্ত্রাসী অভিযানের নাটক করে এবং সেখান থেকে র‌্যাব-১-এ নিয়ে যাওয়া হয় আব্দুস সামাদকে। সেখানে চোখ খুলে এক হলরুমে নিয়ে আগে থেকে সাজানো বিভিন্ন মালামালের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো। একইভাবে তার পাশে ছিল আরও একজন আসামি। সামনে ছিলেন অনেক সাংবাদিক। তবে কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাকে। এরপর সাভার থানায় নিয়ে ২৬ মে সন্ত্রাসবিরোধী ধারায় দুটি মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

আব্দুস সামাদ জানান, গুমের পর তিন দিনের নির্যাতনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের সামনে হাজির করার সময় তিনি ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিলেন না। তার অবস্থা দেখে প্রথমে থানা-পুলিশ তাকে রিসিভ করতে রাজি হয়নি। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে প্রেসক্রিপশনসহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে র‌্যাব।

অপহরণ-গুম ও রিমান্ডে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে মাওলানা আব্দুস সামাদ বলেন, ‘আমাকে জোর করে গাড়িতে তোলার পর আমি “বাঁচাও বাঁচাও” বলে খুব জোরে চিৎকার করতে থাকি।

আমার চিৎকারে পেছন থেকে কয়েকজন লোক আসার আগেই তারা দ্রুত গতিতে আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সিটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। অন্য একজন গামছা দিয়ে নাক ও মুখ এমনভাবে বাঁধে যে আমি মারা যাওয়ার উপক্রম হয়ে জোরে নড়াচড়া শুরু করি, তখন একটু নাকের বাঁধন হালকা করে দিয়ে মাথায় মোটা কালো টুপি পরিয়ে দেয়।’

হাত পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দুই পাশে দুজন অস্ত্র ঠেকিয়ে বলে, কোনো ধরনের নড়াচড়া এবং কথা বললেই গুলি করে মেরে ফেলব এবং তোর লাশও কেউ খুঁজে পাবে না।

তাদের পরিচয় এবং এভাবে আটকের কারণ জানতে চাইলে তারা বলে, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবি। এ সময় আমার পকেটে থাকা মাদরাসার টিন কেনার জন্য রাখা ২১ হাজার টাকা ও মোবাইল বের করে নেয়।

তিনি জানান, পরে এক রুমে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে হাত ও পায়ের বৃদ্ধ আঙুলে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগিয়ে শক দিতে থাকে আর বলে ৪ এপ্রিল (২০২৩) মুফতি আমিনীর ডাকা হরতাল করেছিস কেন? আমি বললাম, আমি তো ওদিন শহরেই যাইনি। এরপর অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে এবং বিদ্যুতের শক দিতে থাকে। একপর্যায়ে আমি বেহুঁশ হয়ে যাই। কতক্ষণ পর হুঁশ হয়েছে তা বুঝতে পারিনি।

পরে তাকে একটা লোহার রডের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে জমটুপি পরিয়ে রেখে দেওয়া হয়। রুমের মধ্যে এবং টয়লেটেও ক্যামেরা লাগানো ছিল। তাকে যে রুমে রাখা হয়েছিল, সেখানে নিয়মিত বিমান ওঠানামা ও রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ পাওয়া যেত। ওই ঘর থেকে আশপাশে আরও অনেকের চিৎকারের শব্দ শোনা যায়। টয়লেটে যাতায়াতের সময় কারও কারও সঙ্গে কথা হলে তারা দীর্ঘদিন ধরে সেখানের নির্যাতনের শিকারের কথা জানায়।

আব্দুস সামাদ জানান, গুম করে রাখার সময় তাকে নির্যাতনের একপর্যায়ে জিজ্ঞাসা করত, আফগানিস্তান গিয়েছি কি না? তাদের পছন্দমতো জবাব না পেয়ে কিছু সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে। স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে আমাকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। তারা জোরাজুরির একপর্যায়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

ওই স্বাক্ষর নেওয়ার পর তারা রাতে গাড়িতে তুলে বহু রাস্তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ফজরের আজানের পর একটি মসজিদের পাশে টিনশেড ঘরে নিয়ে যায় তাকে। সেখান থেকেই কয়েকজন র‍্যাব সদস্যকে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তাকে নিয়ে একটি রুমে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হয়।

তারপর ওখান থেকে চোখ বেঁধে গাড়িতে করে বড় বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জানতে পারেন সেটা ছিল র‍্যাব হেডকোয়ার্টার। সেখানে অনেক ক্যামেরাসহ সাংবাদিকরা দাঁড়ানো ছিলেন। তাদের টেবিলের সামনে বিস্ফোরকসহ অনেক মালপত্র সাজানো ছিল।

সেখানে র‍্যাবের একজন অফিসার ব্রিফিং করে জানান, তারা নাকি জঙ্গি কাজের জন্য সাভার এলাকায় অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদ পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা সাংবাদিকদের কিছু বলতে চাইলে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরে ২৬ মে র‍্যাব হেডকোয়ার্টার থেকে গাড়িতে করে সাভার থানায় নিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী ধারায় দুটি মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

আব্দুস সামাদ জানান, মামলার পর আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ১৪ দিন রিমান্ডে নেয় সাভার থানা-পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলা অবস্থায় আবার র‍্যাব তাদের হেফাজতে নিয়ে যায় এবং আগের সেই জায়গায় পাঁচ-সাত দিন রিমান্ডের নামে অমানবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। পরে কোর্টে ওঠালে

জেলখানায় পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম এক বছর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ও পরে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে রাখা হয় তাকে।

জেলজীবনে ভয়াবহ কষ্টের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তাকে রাখা হতো ফাঁসির আসামিদের সেলে। স্বাভাবিক বন্দিদের মতো চলাফেরার কোনো সুযোগ তিনি পেতেন না।

এদিকে গ্রেপ্তার-বন্দিত্বের ব্যাপক প্রভাব পড়ে আব্দুস সামাদের পরিবারেও। গ্রেপ্তারের সময় তার স্ত্রী ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিন মাস পর মেয়ের জন্ম হয়। এ সময় পরিবারের সদস্যদের চরম মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় খোঁজখবরের নামে বাড়িতে হানা দিত র‍্যাব ও পুলিশ। এতে পর্দানশিন স্ত্রী বিপাকে পড়তেন।

প্রায় দেড় বছর হাজত খাটার পর ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর হাইকোর্টের জামিনে মুক্ত হন আব্দুস সামাদ। তবে এরই মধ্যে একটি মামলায় বেকসুর খালাস পেলেও আরেক মামলায় নিয়মিত ঢাকা জজকোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন তিনি। এসব মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে শারীরিক-মানসিক হয়রানিসহ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এতে তার ২৬ লাখ ৪৬ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি গুম কমিশনকে জানিয়েছেন।

রিমান্ডে ও জেলজীবনে ব্যাপক কষ্টের ধকল এখনও বইতে হচ্ছে মাওলানা আব্দুস সামাদকে। তিনি বলেন, কোমরের নিচে ও হাঁটুর ওপরের অংশে এখনও অবশ অবস্থা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এটা সারতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

জঙ্গি বানাতে ১১ বছর বর্বর নির্যাতন

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১১ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৩৪
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৩৪

আওয়ামী সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানী। ২০১৩ সালে ঈদ মৌসুমে নিজের বাড়ি থেকে ৩২ জন আত্মীয়স্বজনসহ গ্রেপ্তার হন তিনি। এরপর আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামের জঙ্গি সংগঠনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে একের পর এক মামলা দিয়ে দীর্ঘ আড়াই মাস রিমান্ডসহ নানাভাবে বর্বর নির্যাতন চালায় র‍্যাব, ডিবি ও সিটিটিসি বাহিনী।

বিনা অপরাধে ১১ বছর জেল খাটেন তিনি। একই নাটক প্রমাণ করতে তার ছোট ভাইকেও গ্রেপ্তার-নির্যাতনের একপর্যায়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এভাবে দীর্ঘ ১১ বছর ১৬ দিন জেলের অন্ধকারে কাটিয়ে গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গত বছরের ২৬ আগস্ট মুক্তি পান তিনি। কিন্তু এখনও নির্যাতনের সেই কষ্টে হাঁটাচলাসহ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন না।

দেশের অন্যতম ইসলামি চিন্তাবিদ, খতিব, ইমাম এবং বক্তা মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানী। বরগুনা সদর উপজেলার হেউলিবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করা রাহমানী লেখাপড়া করেছেন দেশি-বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় শায়খুল হাদিস ও মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একপর্যায়ে নিজেই ধানমন্ডির বসিলা রোডে মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া নামে একটি মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। একপর্যায়ে আওয়ামী সরকারের রোষানলে পড়েন এই আলেম। মূলত, আওয়ামী সরকার এবং শেখ হাসিনার ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বক্তব্যের প্রতিবাদ করার কারণেই তাদের টার্গেটে পড়েন তিনি।

আমার দেশকে সেসব নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৩ সালে রোজার ঈদের নামাজ ঢাকায় পড়িয়ে বাড়িতে যান তিনি। বরগুনার হেউলিবুনিয়া গ্রামের সেই বাড়িতে তার ভাই-তাতিজাসহ আত্মীয়স্বজন সবাই মিলিত হন। সকাল ১০টার দিকে কয়েকজন লোক সেখানে গিয়ে বলে যে, আমরা নাকি পরের দিন হরতালে নাশকতার পরিকল্পনা করছি বলে তাদের কাছে তথ্য আছে। আমরা অবাক হয়ে যাই। একপর্যায়ে ছোট ছোট বাচ্চাসহ ৩৩ জনকে সেখান থেকে বরগুনা থানায় নিয়ে যায় তারা। পরে চরমোনাই পীরের একজন মুরিদকে সংশ্লিষ্টরা ছাড়িয়ে নেন। আমাদের ৩২ জনের বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। সঙ্গে ৯২ ধারাও লাগায়। এ সময় পাঁচ থানার পুলিশ এসে বাসা ঘিরে রাখে।

তিনি বলেন, তাদের এই গ্রেপ্তারের পেছনে একজন পীরের মুরিদদের হাত থাকতে পারে। কারণ ওই পীরের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ছিল। স্থানীয় সাংবাদিক মোশাররফ ও এসবির আবদুস সাত্তার মিলে এই নাটকে সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় লাইভ প্রচার করা হয়, বরগুনায় জলিল মাস্টারের বাড়ি থেকে (বড় ভাই) মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানীসহ ৩২ জঙ্গি গ্রেপ্তার। তখন বুঝতে পারলাম, সাজানো একটা নাটকের মধ্যে পড়ে গেছি।

বরগুনা থানার মামলায় আদালত চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করলেও মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানীকে নেওয়া হয় ঢাকার ডিবিতে। সেখানে কালো কাপড় দিয়ে তার চোখ বেঁধে ফেলা হয়। পরে নেওয়া হয় উত্তরার র‌্যাব কার্যালয়েও। খাওয়া-ঘুম নেইÑ এমন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তিনি কোন দল করেন, কী করেন জানতে চান।

তিনি বলেন, প্রথমে তাকে জামায়াতের নেতা বানানোর চক্রান্ত করা হয়। তখন তিনি বলেন, জামায়াত তো ক্যাডারভিত্তিক একটি সংগঠন। সেখানে যে কেউ ইচ্ছা করলেই নেতা হতে পারেন না। জামায়াত করলে প্রমাণ দেখান। তারা বুঝল যে, জামায়াত বানানো যাবে না। তখন প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' নামে নতুন একটি দল করল (পরে জানতে পেরেছি)। আমি আদালতেও লিখিতভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামে বাংলাদেশে কোনো দল নেই। আমার অজান্তে যদি থেকে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন ব্লগার রাজিব হায়দার হত্যা মামলায় জড়াল।

প্রচার করল যে, আমি প্রধান আসামি। এরপর আসিফ মহিউদ্দিন নামে আরেক ব্লগারকে কোপানোর মামলায়ও জড়ানো হলো। এভাবে পাঁচটি মামলা তৈরি করা হলো। একেক মামলায় ১৪/১৫ দিন করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। দুই ধাপে সাত দিন, ১০ দিন করে প্রায় দুই মাস রিমান্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। রিমান্ডে রাত-দিন ঘুমাতে দেওয়া হয়নি।

জিজ্ঞাসাবাদ কিছুই না, শুধু গল্প করে। তারা তো সব জানে। তারা উপহাস করত। আমরা তো সব জানি আপনি কোনো দল করেন না। কিন্তু আমরা একটা চারা লাগিয়েছি, বিজ বপন করেছি। আমরা আপনাকে অনেক বড় বানাব। তারা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামে একটা

শিট তৈরি করে। তারা এ বিষয়ে আমার মুখ দিয়ে স্বীকার করাতে চেয়েছিল। আমি বলি যে, এগুলো সাংগঠনিক পরিভাষা। আমি এ সংগঠন করি নাÑআমার জানাও নেই।

তিনি বলেন, আমার মনে হয়েছে, তাদের পেছনে মৌলভিদের একটা দলও সহযোগিতায় ছিল। যারা আমার গ্রেপ্তারের পেছনেও জড়িত ছিল। এসব খবর আবার পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাকে দেখাত যে, আপনি একটা বড় দলের লিডার হয়ে গেছেন। আপনি আধ্যাত্মিক নেতা। আমি বুঝলামÑএটার প্রতিষ্ঠাতা ছিল ডিবির মশিউর রহমান। পরে সাইফুল ইসলাম নামে আরেকজন বদলি হয়ে আসেন ডিবিতে। তিনি আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। একপর্যায়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততার চেষ্টা করেন। আমি বলেছিলামÑ তার নামও আমি জানি না। তাকে আমার ছাত্র হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা করে। এভাবে বড় চক্রান্ত ছিলÑ যদিও তার প্রমাণ করতে না পারায় বেশি এগোতে পারেনি।

এভাবে মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানীর। একই সঙ্গে বাড়ে রিমান্ডের সংখ্যাও। আমি আদালতে বলেছিলাম, আমার কোনো বক্তব্য, কোনো বইয়ে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কোনো নাম কোথাও আছে কি না খুঁজে দেখার ব্যবস্থা করেন।

কেউ দল করলে, তিনি তার বক্তব্যে-লেখায় আহ্বান জানাবেনÑএটাই স্বাভাবিক। আমাকে যদি বাংলা টিমের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে জেলে রাখার দরকার নেই, আদালতের সামনে ক্রেন এনে তার মাথায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখুন। সবাই দেখুক। আর প্রমাণ না করতে পারলে কী করবেনÑ আপনি ভালো জানেন।

রাজিব হত্যা মামলার বিচার চলতে চলতে ২০১৫ সালে এটার রায় হয়। এ রায়ের পর্যবেক্ষণে লেখেন, এ মামলার আসামিরাÑ এমনকি জসীমউদ্দিন রাহমানী, যাকে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, মূলত, রাষ্ট্রপক্ষ হয়তো তদন্ত করেনি অথবা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। তারপরও ওই হত্যায় উসকানির বিবেচনায় পাঁচ বছর সাজা দেওয়া হয়। এতে প্রমাণ করে যে, ওই মামলার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ রায়ের পর বাকি কোনো মামলার বিচার আজ পর্যন্ত শুরু হয়নি।

এরপর ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন হত্যার নাটক সাজিয়ে মিথ্যা মামলায় আমাকে জড়ানো হয়। এভাবে ভুয়া মামলা দিয়ে আসামি বানানো হয়। মোহাম্মদপুর থানায় দুটি মামলা দেওয়া হয়। সেখানে একটি দোকানে অভিযানের নামে নাটক সাজিয়ে আমাকে সেখান থেকে গ্রেপ্তারের মিথ্যা নাটক সাজানো। দোকানের মালিক সাইফুল্লাহ নামে আরেকজন পলাতক বলে জানায় ডিবি। অথচ পরে সেই ব্যক্তিকে ডিবিতে দেখা যায়। তাকে আসামি বা সাক্ষী কিছুই বানানো হয়নি। আসলে সে তাদেরই লোক। সম্ভবত ধানমন্ডির সেই যুবলীগ নেতার পরিচিত।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আটকে রাখা। পুরোনো মামলায় জামিনের সম্ভাবনা থাকায় রাজিব হত্যা মামলা শেষ হওয়ার দিন পুলিশ গিয়ে নতুন আরেকটি মামলা দেয়। ‘লেকহেড গ্রামার স্কুলে’ মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। এটাকে ভিন্নদিকে নিতে সাজায় যে, এই স্কুলের

মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ঢোকানোয় জড়িত মুফতি মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন রাহমানী। ওই মামলায় আবার রিমান্ডেও নেয়।

মুফতি রাহমানী বলেন, আমার বংশে একমাত্র ছোট ভাই আবুল বাশার (বরিশালের একটি মাদরাসার প্রভাষক) গ্রেপ্তার হওয়া বাকি ছিল। নতুন বিয়ে করেছে সে। আমার মামলার কাজে স্ত্রীকে নিয়ে এক দিন ঢাকায় আসার পথে সদরঘাটে নামতেই তাকে কালো গাড়িতে নিয়ে যায়। তার স্ত্রীকে সোজা বরিশালে যেতে বলে। ছয় মাস পর্যন্ত ভাইয়ের কোনো খোঁজ ছিল না।

ঢাকায় জিডি করতে গেলে তা নেয়নি। পরে বরিশালে জিডি করে তার স্ত্রী। ছয় মাস ধরে নির্যাতন করে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সঙ্গে তার ভাই রাহমানীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে জানার কথা স্বীকার করাতে চায়। কিন্তু তা স্বীকার না করায় তাকে পায়খানার রাস্তায় ডিম, রড ঢুকিয়ে, লিঙ্গের সঙ্গে পাঁচ কেজির বাটখারা ঝুলিয়ে রাখে। আমাকে সে কিছুই বলেনি। জেলখানার ডাক্তার এসব আমাকে বলেন। একপর্যায়ে সে মারা যায়। কিন্তু সে কথাও আমাকে জানায়নি। দেখতেও দেয়নি। মিজান সাগর নামের একজন কর্মকর্তা দেখা করতে দেননি। দুদিন এক কারারক্ষী পত্রিকা দিয়ে মৃত্যুর খবরটি পড়তে বলেন।

জেলে কষ্টের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বরগুনা জেলে ফাঁসির সেলে রাখা হয়। ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। সাত মাস পর্যন্ত এভাবে রাখা হয়। বেড়ি টানতে টানতে আমার পা অবশ হয়ে যায়। বাইরের কোনো চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ দেয়নি। এভাবে তিন বছর পর্যন্ত পা ফুলে থাকে। তিন বছর পর পা শুকাতে থাকে। কিন্তু তখন পায়ের ক্যালসিয়ামসহ সবকিছু শুকাতে থাকে। এতে হাঁটা যায় না। পা অচলের মতো অবস্থা। এখন মুক্তির পর ঠিক তাই হয়েছে। হাঁটতে পারি না। চিকিৎসা নিতে হবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও ফাঁসির সেলে রাখা হয়।

নির্যাতিত এই আলেম বলেন, দীর্ঘ ১১ বছর পর সব মামলায় জামিন নিয়ে কাশিমপুর কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় আবার আটক করে নিয়ে যায় সিটিটিসি। সেখানে গারদে রাখে। কয়েক দিন পর মোহাম্মদপুরে নিয়ে নাটক সাজায়। সন্ত্রাসবিরোধী মামলা দেয়। সেই মামলায়ও জামিন হলে তা আদালত স্টে করে দেয়। একপর্যায়ে আশাহত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি হয়তো আর বের হতে পারব না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গত ২৬ আগস্ট মুক্তি পাই।

কোমরে রশি বেঁধে গরুর মতো নিয়ে যায়

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১২ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ১২
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৪৪

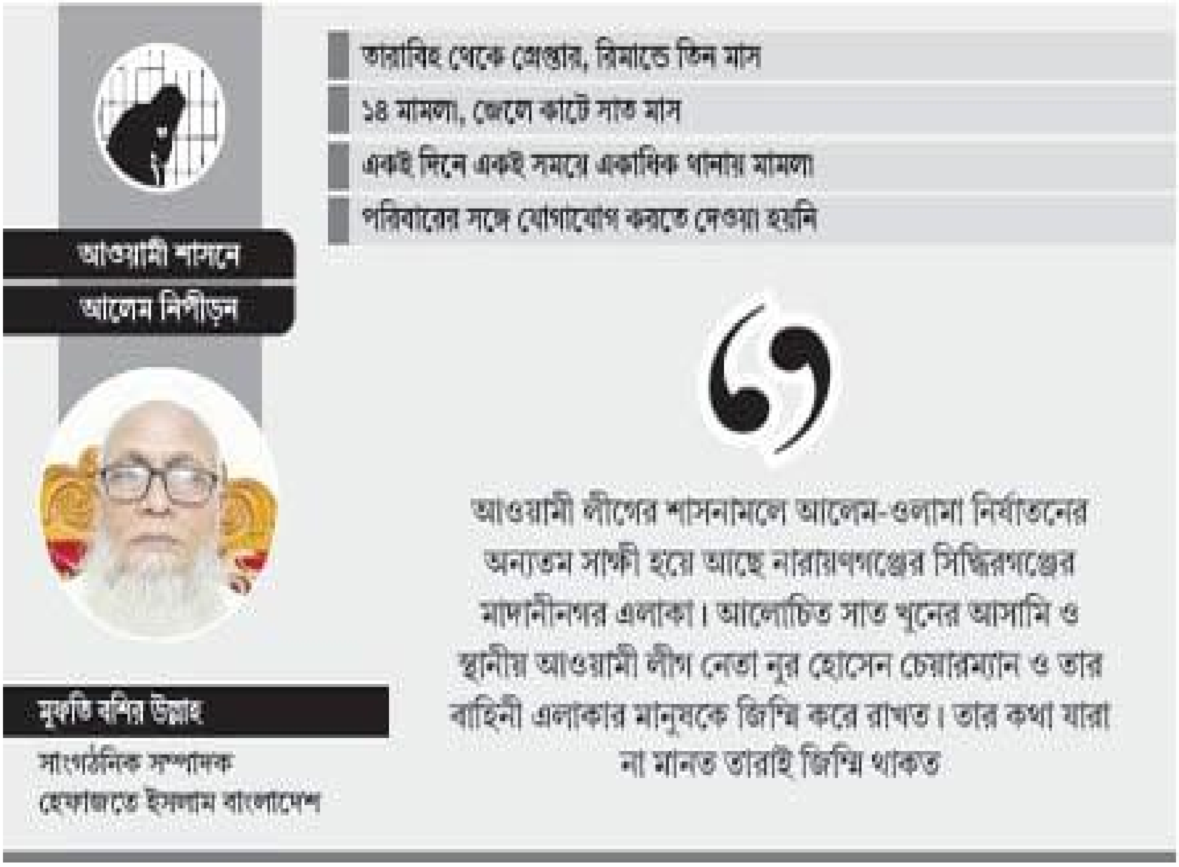

দেশের অন্যতম প্রবীণ আলেম মুফতি বশির উল্লাহ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মাদানীনগর মাদরাসার মুফতি ও মুহাদ্দিস। এলাকায় বেশ সুখ্যাতি রয়েছে তার। স্থানীয় মসজিদে খুতবার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেন তিনি। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তার ওপর নেমে আসে চরম জুলুম-নিপীড়ন।

বিনা অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা অভিযোগের ১৪টি মামলায় সাত মাস জেল খাটতে হয়েছে এই আলেমকে। প্রায় তিন মাস রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অকথ্য গালাগালসহ হয়রানিও করা হয়েছে তাকে। পুলিশের বাধাসহ নানা অত্যাচারে বিঘ্ন হয় যায় ওয়াজ মাহফিল ও মাদরাসার ক্লাস। মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয় তার পরিবারও।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি বশির উল্লাহ আমার দেশকে বলেন, পতিত আওয়ামী লীগের শাসনামলে আলেম-ওলামা নির্যাতনের অন্যতম সাক্ষী হয়ে আছে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মাদানীনগর এলাকা। আলোচিত সাত খুনের আসামি ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নুর হোসেন চেয়ারম্যান ও তার বাহিনী এলাকার মানুষকে জিম্মি করে রাখত। তার কথা যারা না মানত তারাই জিম্মি থাকত। আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ছত্রছায়ায় তিনি এসব করতেন। র‍্যাব তাকে সহযোগিতা করত, পুলিশ কর্মকর্তারাও তার কাছে বসে থাকত।

তিনি জানান, ২০১৩ সালের ৫ মের আগে মাদানীনগর মাদরাসা এলাকায় এসে ভাঙচুর করে নুর হোসেন বাহিনী। আর ৫ মে শাপলা চত্বরের ঘটনার পরদিন তারা সেখানে তাণ্ডব চালায়। সেদিন পুলিশ ও তাদের বাহিনীর গুলিতে ১৯ জন মারা যায়। শত শত ব্যক্তি আহত হয়। আলেম-ওলামা বা হেফাজতের পক্ষের লোকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মামলা দেওয়া হয়। পুলিশ ও আওয়ামী বাহিনীর নির্যাতন চলে। তারা নির্যাতন করে আবার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সাত খুনের মামলার আসামি হিসেবে নুর হোসেন এখন জেলে আছে। তবে তার ভাতিজা বাদল কমিশনার এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয়।

সানারপাড় কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন মুফতি বশিরউল্লাহ। তিনি বলেন, মাদানীনগর মাদরাসায় মুফতি-মুহাদ্দিস হিসেবে ফতোয়া বিভাগে বসি, ফতোয়া দিই। কোনো অন্যায় করার তো প্রশ্নই আসে না, মানুষকে ভালো পরামর্শ দিই, ওয়াজ-নসিহত করি। মক্কীনগর মাদরাসায়ও ক্লাস নিয়ে থাকি। ইসলামের পক্ষে কথা বলি, এটাই আমার অপরাধ।

তিনি বলেন, ২০১৩ সালের ৬ মে মাদানীনগর এলাকায় পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের গুলিতে আমাদের লোকই মারা গেছে, অথচ আমাদের লোকদের নামেই মামলা হয়েছে। আমরা এলাকায়ই থাকতে পারতাম না পুলিশের হয়রানির কারণে। মসজিদ-মাদরাসায় আসা যেত না। পরিবারও মানবেতর জিন্দেগি পার করেছে। আমার নামে মামলা হতে হতে ১৪টিতে দাঁড়ায়। এসব মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিতে হতো। ২০১৩ সালের মামলার পাশাপাশি ২০২১ সালের মোদিবিরোধী আন্দোলনের সময়ও মামলা দেওয়া হয়। ২০২১ সালের আগে গ্রেপ্তার করে তারপর মামলা দিত। এমনই পরিস্থিতিতে ১৩ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন মুফতি বশিরউল্লাহ।

তিনি জানান, পবিত্র রমজান মাসে সানারপাড় এলাকায় প্রথম তারাবির নামাজ পড়ে বের হতেই মসজিদের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। তখনও রাতের খাবার খাননি তিনি। তাকে ধরতে আগে থেকেই ওই এলাকা ঘিরে রেখেছিল গোয়েন্দা পুলিশ। তাকে ধরার পরই নারায়ণগঞ্জ ডিবি অফিসে নেওয়া হয়। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার তৎকালীন ওসির (তদন্ত) গাড়িতে তুলে জিজ্ঞাসা করা হয়, সরকারের সঙ্গে আপনাদের দূরত্ব সৃষ্টি হলো কেন? সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে গেলেন কেন?

তিনি বললেন, আমরা তো দূরত্ব সৃষ্টি করিনি। আর আন্দোলন তো সরকারবিরোধী নয়, সেটা ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিবিরোধী।

ডিবি অফিসে নিয়ে তাকে একটি কক্ষে নোংরা পরিবেশে বসিয়ে রাখা হয়। মশার কামড়ে ঘুম হয়নি। সারা দিন দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্ত শরীর। ওইদিন ছিল প্রথম সাহরি। সেখানে তাকে খেতে দেওয়া হয়। পরদিন ফজরের নামাজের পর অন্ধকার থাকতেই পাঁচটি মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাকে। করোনার কারণে কোর্টে না উঠিয়েই অনলাইন আদালতে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পরে মামলা আরও বাড়তে থাকে। এসব মামলায় দুদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত রিমান্ডে নেওয়া হয়। এভাবে আটটি মামলা দেওয়া হয়। আর ২০১৩ সালের মামলা মিলে ১৪টি মামলায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে হয় এই আলেমকে।

মুফতি বশিরউল্লাহ বলেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে বিভিন্ন সময়ে মতিঝিল, শাহবাগ ও রমনায় থাকায় বিভিন্ন মামলায় তাকে পর্যায়ক্রমে এক সপ্তাহ পর্যন্ত রিমান্ড নেওয়া হয়। এভাবে রিমান্ডে রিমান্ডে কেটে গেছে তিন মাস। তাকে কখনও স্থির থাকতে দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, রিমান্ডের চেয়েও বড় কষ্টকর হচ্ছে, আমরা আলেম-ওলামা মানুষ। মানুষ আমাদের সঙ্গে মোসাহফা করে, হাতে চুমু দেয়। আর তারা আমার হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে কোমরে রশি দিয়ে বেঁধে গরুর মতো টেনে টেনে নিয়ে যায়। আমার ছোট ছেলে এই দৃশ্য দেখে কাঁদছিল। এটা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর। আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি যে, আমাদের চোর-ডাকাতের মতো টেনে নিয়ে যাবে। এটা ভোলার নয়। আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। আমরা কি কোনো সন্ত্রাস করি? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা শুধু নিয়মতান্ত্রিক হরতাল করেছি। কোনো ভাঙচুর বা কাউকে আঘাতও করিনি। প্রতিবাদ করার তো অধিকার আছে। ইসলাম ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছি।

মুফতি বশিরউল্লাহ বলেন, নারায়ণগঞ্জের সাবেক ডিবিপ্রধান এনামুল কবির খামাখা আলেম-ওলামাদের গালাগাল করতেন, অপমান-অপদস্ত করতেন। অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা নীরবে সহ্য করে গেছি। বরং ডিবির অন্য কর্মকর্তারাও তাকে পাগল বলত। কিন্তু পাগল তো আর অফিসার হতে পারে না। ব্যবহারের কারণে সহকর্মীরাই তাকে পাগল বলত।

তিনি বলেন, ডিবি কর্মকর্তা আমাকে গালাগাল করে জিজ্ঞাসা করেন, ‘হেফাজতে ইসলাম এত টাকা পায় কোথায়, লোকজন কোথা থেকে পায়, কওমি মাদরাসা টাকা পায় কই, মাদানীনগর মাদরাসা চলে কীভাবে প্রভৃতি। হরতালে গাড়ি ভাঙচুর কারা করেছে?’ তিনি মাওলানা মামুনুল হক সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে চান। মোদির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছি কি না, কী বক্তব্য রেখেছি, তাও জানতে চান।

আমরা বলেছি, মোদির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছি কি না, সে প্রশ্ন করেন কেন? তার বিরুদ্ধে তো ভারতের হিন্দুরাও কথা বলে। মমতাসহ অনেক নেতা কথা বলে, আমরাও বলেছি। সে বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, মুসলমানদের হত্যা করেছে। মোদি বাংলাদেশের কে? তারা বলেন, বোঝেন না দেশটা কারা চালায়?

এভাবে বিনা অপরাধে সাত মাস দুই দিন জেল খেটেছেন এই প্রবীণ আলেম। প্রথমে নারায়ণগঞ্জে, পরে কেরাণীগঞ্জে এবং শেষে কাশিমপুর কারাগারে ছিলেন তিনি। মামলা ছিল নারায়ণগঞ্জ, মতিঝিল, পল্টন ও রমনায়, যেখানে আমরা কোনোদিন যাইনি, সেখানেও মামলা ছিল। একই দিনে একই সময়ে একাধিক থানায় মামলা হয়েছে। এসব মামলা তো আদালতে টেকারই কথা নয়। তারপরও আমাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, জেল খেটেছি, আমাদের হয়রানি করা হয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এভাবে হয়রানি চলে। মামলাগুলো এখনও চলমান আছে, তবে বর্তমান সরকারের সময়ে এসব মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের পর তার পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। কোনো অপরাধ প্রমাণ না করতে পারলেও আদালতে জামিন পেতেন না মুফতি বশিরউল্লাহ। কারণ ওই সরকারের পক্ষ থেকে জামিন দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। তার পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে দেওয়া হতো না। আর দীর্ঘ সাত মাস জেলে থাকায় তার পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবনযাপন করেন। সে সময় মাদানীনগর মাদরাসা থেকে কিছু সহযোগিতা করা হয় পরিবারকে। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চলে তার পরিবার। তার জামিন নিতেও মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হয়েছে।

মুফতি বশিরউল্লাহ বলেন, আলেম-ওলামাদের নিয়ে জঙ্গি নাটক সাজাত শেখ হাসিনার সরকার। বহির্বিশ্বের সুনজর পেতেই তিনি এটা করতেন। আসলে শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা বা ধর্মবিদ্বেষী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের জন্মই হলো ধর্মবিদ্বেষের মধ্য দিয়ে।

কাঁদতে কাঁদতে মায়ের চোখের পানি শুকিয়ে যায়

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৩ জানুয়ারি ২০২৫, ০৮: ৫২
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৫, ১৪: ৫৬

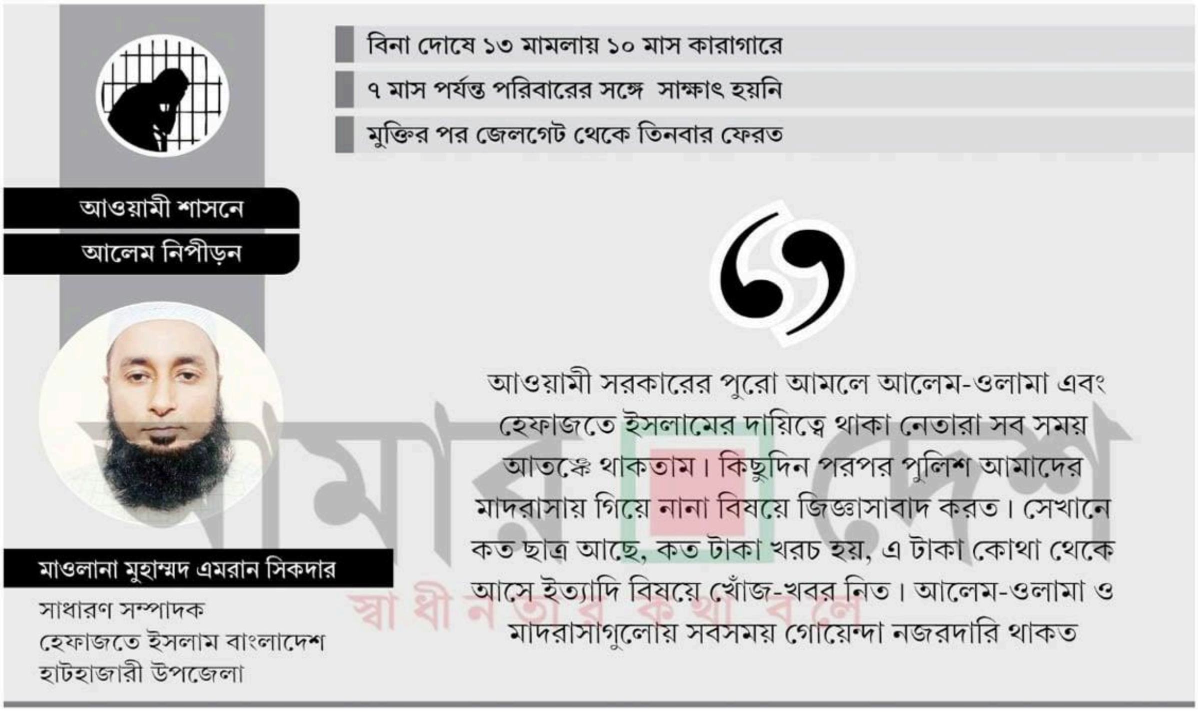

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশসহ বিভিন্ন কারণে বেশ আলোচিত ছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা এলাকা। বিগত আওয়ামী সরকারের দমন-নির্যাতনেরও তাই অন্যতম টার্গেট ছিল ওই এলাকার মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা।

ধর্মীয় ইস্যুতে যাতে কোনো প্রতিবাদ-বিক্ষোভ গড়ে উঠতে না পারে, সে জন্য সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি আর পুলিশি হয়রানি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এমনই নজরদারির একপর্যায়ে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার হন হাটহাজারীর মারকাজুল কোরআন ইসলামিক একাডেমির পরিচালক মাওলানা এমরান সিকদার।

নিজ প্রতিষ্ঠানে আসরের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় খুব অপমানজনকভাবে তাকে আটক করে ডিবি পুলিশ। জামা-জুতা পরার সুযোগ না দিয়েই সন্ত্রাসী কায়দায় ধরে নিয়ে যায় একজন রোজাদার আলেমকে। চার দিন রিমান্ডে মানসিক নির্যাতন ছাড়াও একে একে ১৩টি মামলা দিয়ে ১০ মাস কারারুদ্ধ করা হয় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, হাটহাজারী উপজেলার এই সাধারণ সম্পাদককে। জেলজীবনে নিজের কষ্টের প্রভাব পড়ে শিশুসন্তান, বৃদ্ধা মাসহ পরিবারের সদস্যদের ওপর।

আওয়ামী শাসনামলের সেসব কালো দিনগুলোরর কথা স্মরণ করে মাওলানা এমরান সিকদার বলেন, আওয়ামী সরকারের পুরো আমলে আলেম-ওলামা এবং হেফাজতে ইসলামের দায়িত্বে থাকা নেতারা সবসময় আতঙ্কে থাকতাম। কিছুদিন পর পুলিশ আমাদের মাদরাসায় গিয়ে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। সেখানে কত ছাত্র আছে, কত টাকা খরচ হয়, এ টাকা কোথা থেকে পান ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর নিত। আলেম-ওলামা ও মাদরাসাগুলোয় সবসময় গোয়েন্দা নজরদারি থাকত।

দীর্ঘ ১৪ বছর হাটহাজারীর একটি মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন মাওলানা এমরান সিকদার। পরে মারকাজুল কোরআন ইসলামিক একাডেমি নামে নিজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে সেখানেই পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এ ছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গণশিক্ষার একটি শাখা ছিল তার মাদরাসায়। কিন্তু হেফাজতের ঘটনায় ধরপাকড়ের সময় তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে, এতে ওই কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন এই আলেম। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১০ রমজানের দিন বিকালে নিজের মাদরাসায় আসরের নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে মাদরাসার চারপাশ ঘেরাও করে ফেলে। আমি অজু করে বের হয়েছি মাত্র।

গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা ছিলাম। এমন সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে দেওয়ার জন্য সময় চাইলে তারা বলে, জামা-টামা পরা যাবে না। বের হওয়ার সময় দরজার পাশে জুতাটা পরতে চেয়েছি, তাও পরতে দেয়নি। এভাবে খালি পায়ে, গেঞ্জি-লুঙ্গি পরা অবস্থায় আমাকে ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়। রাত একটা/দেড়টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। সেখানেই ইফতার ও সাহরি সারি। পরে পাঁচলাইশ থানায় আমাকে সোপর্দ করা হয়।

মাওলানা এমরান সিকদার বলেন, পাঁচলাইশ থানায় রাতে আমাকে এমন দুটি কম্বল দেয়, যা খুবই অপরিচ্ছন্ন। পরিবেশটা ছিল খুবই নোংরা। মশার যন্ত্রণায় ঘুমানোর সুযোগ ছিল না। এভাবে বসেই রাত কাটিয়ে দিই। পরের দিন দুপুর দেড়টা/দুটার দিকে আমাকে জেলে পাঠায়। প্রথমে তিনটা মামলায় জড়ানো হয় তাকে। কী মামলা দেওয়া হয়েছে, তা ওই সময় জানতাম না। সেই মামলায় চার/পাঁচ মাস জেলে থাকার পর পর্যায়ক্রমে ১৩টি মামলা দেওয়া হয়।

পুলিশের ওপর হামলা, ভাঙচুরসহ এমন কোনো ধারা নেই, যাতে মামলা দেয়নি। আটকের পরই চার দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। দুটি মামলায় দুদিন করে এই রিমান্ড নেওয়া হয়। তিনি বলেন, হাটহাজারী এলাকায় কোনো সমস্যায় পড়লে মাদরাসার শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে ডাকত পুলিশ। ২৬ মার্চ মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে হাটহাজারীতে যে ঘটনা ঘটে, সেদিন তিনি ও হেফাজতের অন্য অনেক দায়িত্বশীল গ্রামের বাড়িতে ছিলেন।

মাদরাসার ছাত্ররা হঠাৎ বের হয়ে যখন রাস্তায় আন্দোলন করছিল, তখন ইটপাটকেল নিক্ষেপের অভিযোগে গুলি করা শুরু করে পুলিশ। তাদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই চার ছাত্র নিহত হন। অথচ তাদের আন্দোলন ঠেকাতে টিয়ারশেল বা অন্য পদক্ষেপ নিতে পারত। সরাসরি রাইফেলের গুলি দিয়ে মানুষ হত্যার তো কোনো যুক্তি নেই।

এমরান সিকদার বলেন, চার ছাত্র নিহতের ওই সময় থানা থেকে পুলিশ আমাকে ফোন দেয়, ছাত্ররা থানায় হামলা করেছে। তখন কী করতে হবে আমি জানতে চাইলে ওসি কিছু বলেনি। পরে এনএসআইয়ের একজন ফোন দিয়ে কী করা যায় জানতে চান। তখন আমি বলি, আপনারা এভাবে মারমুখী না হয়ে আমাদের দায়িত্বশীলদের ব্যবহার করেন।

তখন আমাকে সেখানে যেতে বলেন। তার ডাকে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে আমি সেখানে যাই। তার আগে দুই-আড়াইটার মধ্যেই সেখানে হতাহতের সব ঘটনা ঘটে। অথচ পরে সব

ঘটনায় আমাকে আসামি বানায় পুলিশ। আমরা পুলিশের ফোন পেয়ে তাদের সহযোগিতা করতে সেখানে গিয়েছিলাম অথচ আমাদেরই মামলার আসামি করে পুলিশ। জেলে ও রিমান্ডে আমাদের চরম কষ্ট করতে হয়েছে।

তিনি বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞাসা করত যে, আপনারা হেফাজতের টাকা কোথা থেকে পান। পুলিশের ওপর এই হামলার জন্য আমরা নাকি জুনায়েদ বাবুনগরী ও মামুনুল হকের সঙ্গে বৈঠক করে পরিকল্পনা নিয়েছি। এভাবে শতভাগ মিথ্যা সব অভিযোগ দেয় পুলিশ। চার দিনের রিমান্ডে মানসিকভাবে নানা টর্চার করে।

রিমান্ড শেষে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। সেখানেও কষ্টে-দুর্ভোগে দিন পার করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে এমরান সিকদার বলেন, আমরা জেলের ভেতরে আরেকটা জেলে থাকতাম। আমাদের কারও সঙ্গে কথা বলতে দিত না। অন্য বন্দিরা সপ্তাহে এক দিন ১০ টাকা দিয়ে কথা বলতে পারত। আমি সাড়ে ৯ মাসের মধ্যে মাত্র তিনবার কথা বলেছি, তাও ১০ মিনিটে ৫০০ টাকা দিয়ে।

কারারক্ষীদের বাড়তি টাকা দিলে অনেক কষ্ট করে তারা আমাদের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিত। পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কোনো সুযোগ দেয়নি। আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের কোর্টে তোলা হোক, তাহলে পরিবারের লোকদের অন্তত একবার দেখতে পাব। কিন্তু করোনার কারণে কোর্টেও ওঠায়নি। প্রথমদিকে ভার্চুয়াল কোর্ট চলে, শেষদিকে সাত-আট মাস পর আমাদের কোর্টে ওঠায়। এভাবে গ্রেপ্তারের সাত মাস পর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার ছিল নির্যাতনের আরেক মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে এমরান শিকদার বলেন, আমাদের মামলায় সহজে জামিন হতো না। দীর্ঘ সাত-আট মাস পর যখন জামিন পাই, তখন মুক্তির জন্য জেলে গেলে অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু বের হওয়ার আগে আমাকে জানায়, আপনার বিরুদ্ধে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আপনি বের হতে পারবেন না।

এভাবে নতুন মামলা দিয়ে তিনবার জেলগেট থেকে ফেরত দিয়েছে। তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের সময় আমার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছিল তিনটি। ছয়-সাত মাস পর্যন্ত ছিলাম সাতটা মামলা নিয়ে, সর্বশেষ ১৩টি মামলায় জামিন নিয়ে বের হতে হয়। এভাবে প্রায় ১০ মাস পর ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান তিনি।

মুক্তির পরও স্বাভাবিক কোনো জীবনযাত্রা ছিল না মাওলানা এমরান সিকদারের। সবসময় গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে থাকতেন তিনি। এমরান সিকদার বলেন, জামিনে মুক্তি পেলেও আমরা নজরবন্দি ছিলাম। মুক্তির সময় আমাদের বলে দেওয়া হয়, আপনাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে শুধু মাদরাসা দেখাশোনা এবং পরিবারকে সময় দেওয়ার জন। যদি বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আবার গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ সবসময় আমাদের খোঁজখবর রাখত। আমরা সাবধানে চলাফেরা করতাম।

এদিকে ১৩টি মামলায় হাজিরা দেওয়া নিয়েও বেশ ভোগান্তির শিকার হতেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে মামলার হাজিরা পড়ত তার। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত দু-এক দিন পরপরই আদালতে আমাদের হাজিরার তারিখ পড়ে। প্রথম দুই বছর তো প্রায় প্রতিদিন একটা করে হাজিরা পড়ত। এভাবে পুরো সপ্তাহ, পুরো মাস হাজিরা দিতে দিতে কেটে যেত। এটা ছিল আরেক হয়রানি। আমরা স্বাভাবিক কোনো কাজকর্ম করতে পারতাম না।

দীর্ঘদিন জেলে থাকায় চরম ক্ষতির মুখে পড়েছে তার পরিবারও। তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের সময় আমার ছোট ছেলেটার বয়স ছিল ১৮ মাস। জেল থেকে বের হয়ে দেখি ছেলেটা শুকিয়ে গেছে। এত দিন সে ঠিকমতো কোনো কথা বলতে পারেনি। কাঁদতে কাঁদতে আমার মায়ের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। ডাক্তার তাকে চিকিৎসা নিতে বলেছেন।

আমাদের পুরো পরিবারে হাসি কী জিনিস ছিল না। আর আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটা একদম ভেঙে পড়ার অবস্থায় ছিল। ছাত্র অনেক কমে গিয়েছিল, নানা দুরবস্থা ছিল, শিক্ষকরাও ছিলেন ভয়ে। আমি গ্রেপ্তারের পর একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, পরে ভয়ে সে পালিয়ে চলে গেছে। এতে মাদরাসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এমরান শিকদার বলেন, অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। সংসার চালানো এবং মামলা চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি।

জেলখানায় কষ্টের পাশাপাশি আলেমদের চরম অপমানও করা হয়েছে। এমদাদ নামের একজন কর্মকর্তা তাকে নানা কটূক্তি করতেন। আমাদের জঙ্গি বলতেন। আমরা জঙ্গি নাÑএ কথা বললে হেফাজত জঙ্গি হিসেবে ডাকত। কারও সঙ্গে কথা বলতে দিত না। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে যেতে দিত না। জামায়াতে নামাজ পড়ানোরও সুযোগ দিত না জেলে।

আমাদের মাদকাসক্ত, চোরাকারবারিদের পেছনে নামাজ পড়তে হতো। হাটহাজারীর সাবেক ওসি রফিক ও আরেকজন কর্মকর্তা রাজিব সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করেছেন। আমাকে হাটহাজারী থানায় না নেওয়ায় টর্চার থেকে রক্ষা পেয়েছি। তবে অন্য আলেমদের ওই থানায় নিয়ে সমানে পিটিয়েছে। ওসি রফিকের একটা স্বীকারোক্তি আছে, আমাকে কিছু এজেন্ডা দিয়ে এই হাটহাজারী থানায় পাঠিয়েছে সরকার। সে অনুযায়ী হাটহাজারীতে আলেম-ওলামারা বেশি নির্যাতন হন।

মামলা চালাতে খরচ হয় ৩৫ লাখ টাকা

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ১৩
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, ১১: ৪২

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার ছিলেন মাওলানা নুরুল আমিন। লেখালেখি ও বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে ওই সরকারের ইসলাম ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতেন তিনি।

পাশাপাশি নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও সময় দিতেন। একদিন ব্যবসায়িক কাজ শেষে মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে ফরিদপুর ফেরার পথে নবীনগর থেকে বিনা অপরাধে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। তিন দিন গুম করে রাখার পর আইসিটি আইনে মামলা দিয়ে রিমান্ডে নির্যাতনের পাশাপাশি জেলে পাঠানো হয় তাকে।

আওয়ামী লীগের বিরোধিতার অভিযোগে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার এই সন্তানকে জামিনে বিলম্ব করেন বিচারক। দীর্ঘ আট মাস কারাভোগের পর জামিন পান ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এই সদস্য। তবে কারামুক্তির পরও নানা হুমকির কারণে এলাকা ছেড়ে দুই বছর ঢাকায় আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। আওয়ামী সরকার পতনের আগ পর্যন্ত দিন কাটিয়েছেন আতঙ্ক নিয়ে। শেখ হাসিনার শাসনের সেই কালো দিনগুলোর কথা তুলে ধরেছেন আমার দেশ পাঠকদের জন্য।

২০১৬ সালের ২৭ জুলাই নবীনগর ব্রিজ এলাকা থেকে মোটরবাইকসহ মাওলানা নুরুল আমিনকে আটক করে পুলিশ। ধরেই চোখ বেঁধে একটি গাড়িতে নিয়ে যায়। সারা রাত গাড়িতে নিয়ে বেড়ায়। এ সময় কেউ কেউ বলেন, সে জঙ্গি, তাকে ক্রসফায়ার দিয়ে দাও।

গুলি লোড দিতে বলে একজনকে। এভাবে তিন দিন তাকে গুম করে রাখে। তবে প্রথম দিন রাতে আশুলিয়ার দিকে নিয়ে যায় বলে অনুমান তার। এ সময় কোনো নির্যাতন তারা করেনি। তবে তিন দিন পর ধামরাই থানায় নিয়ে বিভিন্নভাবে তাকে মানসিক নিপীড়ন করা হয়।

তিনি জানান, এ সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশে কথা বলি কেন? তাদের বিপক্ষে লেখালেখি কেন করি? শাপলা চত্বরে আমি কোরআন পুড়িয়েছি, শাপলা চত্বরের ঘটনায় আমার ভূমিকা ছিল। পরে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পেয়ে আইসিটি আইনে মামলা দেওয়া হয়।

কাপড়ের দোকানের মালপত্র কিনতে মোটরবাইক নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন মাওলানা নুরুল আমিন। জিনিসপত্র কুরিয়ারে পাঠিয়ে রাতে তেজগাঁও এলাকায় পরিচিত এক মাদরাসায় রাত কাটান।

পরের দিন ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পথিমধ্যে নবীনগরের পলাশবাড়ীতে যান এক ইমাম বন্ধুর কাছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই রাত ৮টার দিকে তাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি টাকাও নিয়ে যায় তারা।

নবীনগর সেতুর কাছ থেকে ধরলেও গ্রেপ্তার দেখানো হয় তিন দিন পর ধামরাইয়ের ইসলামপুর থেকে। গুমের তিন দিন তাকে ধামরাই থানাতেই রাখা হয় বলে তার ধারণা। এ

সময় বাইরের কোনো কিছুই তিনি দেখতে পারেননি। পশ্চিম মনে করে উত্তরদিকে নামাজ পড়েছেন। তাকে সুরা ইয়াসিন পড়তে বলার মধ্য দিয়ে অঘোষিত রিমান্ড শুরু হয়। এরপর পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, শেখ হাসিনা ভালো নাকি খালেদা জিয়া ভালো।

তিনি বলেন, আমার গাড়ি চালানো দেখে তারা নাকি সন্দেহ করে। এরপর আইসিটি আইনে মামলা দিয়ে সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের মাধ্যমে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল ধামরাই থানা-পুলিশ। আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

রিমান্ডে নিয়েই আমাকে হাত-পা বেঁধে পায়ের তলায় লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। অকথ্য ভাষায় গালাগাল, আলেম-ওলামাদের গালাগালসহ নানাভাবে নির্যাতন করা হয় রিমান্ডে। ওই থানার ওসি তদন্ত দীপঙ্কর সাহা তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন চালান। মামলার বাদী ছিলেন মাহমুদ।

গত ৮-১০ বছর আদালতে হাজিরার সময় তাদের চেহারা আর দেখেননি তিনি। আদালতে কোনো সাক্ষীও হাজির করতে পারেননি তারা। রিমান্ডে নিয়ে পরিবারকে ফোন দিয়ে ২ লক্ষাধিক টাকাও নেয় পুলিশ। এখনো পর্যন্ত তার কাছ থেকে নেওয়া তিনটি মোবাইল ফেরত দেওয়া হয়নি।

আটকের তিন দিন পর তার পরিবারকে ফোন দেয় পুলিশ। সে সময় তাদের টাকা নিয়ে ধামরাই থানায় আসতে বলে। আদালতে ওঠাতে ও কাপড়চোপড়ের জন্য খরচ লাগার কথা বলে তারা। তাদের ফোন পেয়ে তার ভাই, শ্যালক ও স্থানীয় কিছু লোকজন আসে।

মাওলানা নুরুল আমিন জানান, তাদের যখন আদালতে ওঠানো হতো, তখন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ফাইল ধরতে চাইতেন না, ফেলে দিতেন। প্রায় সাড়ে ৪ মাস পর তার আইনজীবী আদালতে বলেন, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তিনি নিরপরাধ। তাকে জামিন দেওয়া হোক।

এ সময় জজ বলেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হলে তিনি আওয়ামী লীগবিরোধী কেন? এ জন্য তাকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে, জামিন হবে না। দীর্ঘ আট মাস দুদিন কারাভোগের পর জামিন পান তিনি। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর পুলিশের সেই কর্মকর্তা দীপঙ্কর সাহা তাকে ফোন দিয়ে হুঁশিয়ারি দেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালালে আবার ধরে নিয়ে আসা হবে।

দলীয় কর্মসূচিতে বক্তব্যের পাশাপাশি আগে থেকেই ফেসবুক পেজে লেখালেখি করতেন মাওলানা নুরুল আমিন। সেগুলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকরা ফলো করেই তাকে টার্গেট করতে পারেন বলে ধারণা তার।

তিনি বলেন, মুক্তির পরও তার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা হুমকি-ধমকি আসে। একপর্যায়ে ব্যবসা ছেড়ে দেন তিনি। নিজ এলাকা নগরকান্দা ছেড়ে অনেকটা আত্মগোপনের

জন্য ঢাকার একটি মাদরাসায় চাকরি নেন তিনি। দুই বছর সেখানে চাকরি করেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লেখালেখি অব্যাহত ছিল।

পরিস্থিতি কিছুটা শিথিল হলে ২০১৯ সালে নগরকান্দায় গিয়ে নিজে 'মারকাজুল আশরাফ আল ইসলামী মাদরাসা ও কওমি একাডেমি' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে সেখানেই পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাশাপাশি চলছে ব্যবসা-বাণিজ্যও।

তবে দীর্ঘদিন কারাবাসে থাকায় আয় বন্ধ আর ব্যাপক খরচের কারণে অনেকটা জীর্ণশীর্ণভাবেই দিন কাটাচ্ছেন তিনি। কারণ মামলা চালাতে গিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে তার। কারাগারে থাকার সময় খাওয়া-দাওয়া করতে মাসে ৩০-৩৫ হাজার টাকা করে খরচ হয়েছে। আদালতেও ব্যাপক খরচ। শেষদিকে আইনজীবীর সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা চুক্তিতে তার জামিন হয়।

কারাগারের নানা স্মৃতিচারণ করে এই তরুণ আলেম বলেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জীর্ণশীর্ণ একটি কক্ষে থাকতে দেওয়া হয় তাকে। সেখানে কারও সঙ্গে কথাবলা ও চলাফেরা নিষেধ ছিল। কারাগারেও নজরদারিতে ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি তাফসির করতেন, একপর্যায়ে সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৫-২০ দিন পরপর কোর্টে ওঠানো হতো তাকে।

মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, আমি জীবনে কোনো ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত হইনি। অথচ একটা মিথ্যা মামলা দিয়েই আমার লাইফ শেষ করে দিয়েছে পুলিশ। ফরিদপুরে স্থানীয় কওমি মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ লেখাপড়ার পাশাপাশি পবিত্র কোরআনের হাফেজ তিনি। নগরকান্দার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আশরাফ আলীর সন্তান তিনি।

রিমান্ডের সময় হাত-পা বেঁধে মেঝেতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অনেক সময় দুই হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গ্রিলের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখত।

তিনি বলেন, কারাগারে অসংখ্য আলেমকে দেখেছেন তিনি। তাদের দীর্ঘদিন কোর্টে ওঠাত না, জামিন দিত না। সেখানে আলেম-ওলামা নির্যাতনের ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। গ্রেপ্তারের আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারবিরোধী সমালোচনামূলক লেখালেখির জন্য আওয়ামী লীগের লোকরা হুমকি দিত তাকে। গ্রেপ্তারের পর সেই ফেসবুক আইডি অকার্যকর করে দিয়েছে। সেটা আর উদ্ধার করতে পারেননি তিনি।

৫ আগস্টের আগের পরিস্থিতি সম্পর্কে মাওলানা নুরুল আমিন বলেন, সে সময় আমরা হুমকির মধ্যে থাকতাম। ঠিকমতো সভা-সমাবেশ করতে পারিনি। ঠিকমতো ধর্মীয় বক্তব্য দিতে পারতাম না, কথা বলতে পারতাম না। আমরা আমাদের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম।

জুলাই-আগস্টে ফরিদপুরের আন্দোলনে ছিলাম। ৫ আগস্টের দিনও বাজার করতে ঢুকলে নগরকান্দা থানার ওসি (তদন্ত), একজন হিন্দু অফিসার আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেন। অবশ্য বিকালেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। আজও দেখা হলে তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। আজও তিনি একই থানায় কর্মরত আছেন। তবে আল্লাহর রহমতে আমি মুক্ত অবস্থায় আছি।

‘আজ আপনার শেষ রাত, প্রস্তুত হন’

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ২২

নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতায় ব্যস্ত থাকতেন মুফতি ইব্রাহীম খলিল। পাশাপাশি জড়িত ছিলেন ইসলামি রাজনীতিতেও। হঠাৎ তার কর্মব্যস্ত জীবন স্তব্ধ করে দেয় পতিত আওয়ামী সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বিনা অপরাধে কুষ্টিয়া থেকে আটকের পর নেওয়া হয় রাজশাহী ডিবিতে। দুই মাস গুম রেখে অমানুষিক নির্যাতনের পর গ্রেপ্তার নাটক সাজিয় দেওয়া হয় ভিত্তিহীন মামলা।

এ সময় নানাভাবে নির্যাতন ও ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়েও জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি না দেওয়ায় ১৮ মাস কারাগারের অন্ধকার জগতে কাটাতে হয় ইসলামী ঐক্যজোটের যশোর জেলার সাবেক এই সেক্রেটারিকে। পুলিশি হয়রানি থেকে রেহাই পায়নি তার পরিবারও। আর আদালত ও থানা-পুলিশ করতে গিয়ে প্রায় ২৪ লাখ টাকা খরচ করে অনেকটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তিনি। জামিনে মুক্তির পরও বহাল ছিল পুলিশি হয়রানি। ৫ আগস্ট-পরবর্তী জীবনযাত্রায় স্বস্তি ফিরলেও থামেনি মামলার হাজিরার ভোগান্তি।

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার পারবাজারে জামিয়া আরাবিয়া কওমি বালক-বালিকা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি ইব্রাহীম খলিল। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ঝিকরগাছা থানার সেক্রেটারিও তিনি। আওয়ামী সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আলেম-ওলামা নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় নিজের কিছু করুণ অভিজ্ঞতা আমার দেশ-এর কাছে তুলে ধরেছেন তিনি।

২০২০ সালের ২ নভেম্বর কুষ্টিয়ায় এক বন্ধুর মাদরাসা উদ্বোধনে যোগ দিতে সকালে যশোরের চাঁচড়া মোড় থেকে বাসে উঠেছিলেন মুফতি ইব্রাহীম। একই গাড়িতে ওঠেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাদা পোশাকধারী ১০-১৫ জন সদস্য (পরে নিশ্চিত হন)। বাসটি কুষ্টিয়ায় পৌঁছানোর পর দুপুর ১২টার দিকে মজমপুরে স্ট্যান্ডে নামেন।

সেখানে তাকে রিসিভ করতে আসা বন্ধু হাফেজ মাওলানা হাসানের সঙ্গে রিকশায় করে মাদরাসাটির কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই শহরের কমলাপুর নামক স্থানে পেছন থেকে ইব্রাহীম ভাই বলে ডাক দেওয়া হয়। তারা বলেন, আমরা প্রশাসনের লোক, কোনো আওয়াজ করবেন না। এ বলেই তাদের দুজনকে পাঁজাকোলা করে ধরে সাদা মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে যায়। গামছা দিয়ে তাদের মুখ ও চোখ বেঁধে সাত-আট ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় রাজশাহীতে।

মুফতি ইব্রাহীম জানান, আমাকে রাজশাহীর ডিবি অফিসের দোতলায় 'ইন্টারোগেশন সেলে' নিয়ে চোখ খুলে দেয়। আর বন্ধুকে রাখা হয় আরেক স্থানে। ওই রুমে কোনো জানালা ছিল না। দরজা সব সময় লাগানো থাকত। সে সময় খুব গরম আবহাওয়া ছিল। কোনো পাখা, বালিশ কিছুই দেয়নি। দুই সপ্তাহ পর আবার শীত শুরু হয়। তখনো দেওয়া হয়নি কোনো কম্বল।

সেখানে বাথরুমে যাওয়ার সময়ও চোখ বেঁধে হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে নিয়ে যেত। সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকত দুই পুলিশ। তার গায়ে কোনো গেঞ্জি-জামা ছিল না। শুধু লুঙ্গি পরা অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হতো।

এ সময় হাঁটুতে আঘাত করত তারা। রাত ১টা, ২টা, ৩টার সময় ডাকত। এমনও হয়েছে, রাতে তিন-চারবার করে নিয়ে যায় সেখানে। বলত যে, আপনার কাছে অস্ত্র আছে, কাগজে যা যা লেখা আছে তার স্বীকারোক্তি দিতে হবে। নইলে আজই আপনার শেষ দিন। আমি বলতাম, আপনারা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করুন, এসবের সঙ্গে আমি জড়িত নই।

মুফতি ইব্রাহীম বলেন, ডিবির রুমটির দেয়ালে রক্তে লেখা নাম, মোবাইল নম্বর ও কষ্টের কথা চোখে পড়ত। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন নতুন নতুন অফিসার। মাঝেমধ্যে রাতে চোখে কালো কাপড় বেঁধে ও হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বাইরে নিয়ে যেত এবং বলত আজকে আপনার শেষ রাত, আপনি প্রস্তুত হন। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। তারা তার কাছ থেকে হাস্যকর বিষয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করত। যেমনÑ 'আমার কাছে এক ট্রাক অস্ত্র আছে, আমি শেখ হাসিনা হত্যাচেষ্টার জন্য গ্রেনেড সরবরাহ করেছি', 'দ্বিতীয় আরেকটি গ্রেনেড আমার কাছে আছে', 'যেকোনো সময় জঙ্গি হামলা করে বাংলাদেশ দখল করার পরিকল্পনা করছি' ইত্যাদি।

এভাবে দুই মাস গুম রেখে নির্যাতনের পর গ্রেপ্তার নাটক সাজায় পুলিশ। এ প্রসঙ্গে মুফতি ইব্রাহীম বলেন, ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ রাত ২টার দিকে পুলিশ এসে আমাকে কোমরে একটা বেল্ট পরতে দেয়। বলে, রেডি হন আজকে আপনাকে নিয়ে যাব।

আজকে আপনার শেষ, ফাইনাল দিন। হয় আপনাকে ক্রসফায়ার দেব, নইলে ছেড়ে দেব। আর না হয় মামলা দেব। এরপর রাত ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরায়। নোমান নামে নোয়াখালীর আরেকটি ছেলেকেও একইভাবে দুই মাস গুমের পর আমার সঙ্গে নিয়ে আসে। আর তার সেই বন্ধু হাসানকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার নাটকের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের দুজনকে রাত ৪টার দিকে রাজশাহীর মতিহার থানার খড়খড়িয়া বাজার (বাইপাস) এলাকায় ইজিবাইকে চড়িয়ে পাঠানো হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর গতিরোধ করে পুলিশ। আমাদের সঙ্গে রাখা ব্যাগে কিছু ধর্মীয় বই বের করে বলে এরা জঙ্গি, এরা নাশকতা করার জন্য, দাওয়াতি কাজের জন্য ঢাকা থেকে এসেছে।

এভাবে আমাদের আটক করে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরদিন সকালে সেখানে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জঙ্গি মামলায় গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানায় পুলিশ। সেখানে আগে থেকেই র‌্যাব, ডিবি, কাউন্টার টেরোরিজমের এক-দেড় শ সদস্য ছিলেন। এ সময় বলা হয়, আমি জঙ্গি অর্থায়ন করি। দুবাই থেকে লাখ লাখ টাকা এনেছি। আমি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কমান্ডার। অথচ আমি জীবনে রাজশাহী যাইনি। খুলনা শহরে জীবনে দু-এক দিন গিয়েছি।

দুই মাস পর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে তিনি বেঁচে আছেন। তার মাধ্যমে পরিবারকে ফোন দিয়ে কোর্টে আসতে বলা হয়। তিনি তার স্ত্রীকে ফোন দিয়ে শ্যালক ও অন্যদের আসতে বলেন। কোর্টের মাধ্যমে ফের পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।

রিমান্ড শেষে আলাদতে তোলার আগে আমাকে মুখস্থ করার জন্য একটি কাগজ দেওয়া হয়, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও ঠিক একই কাগজ দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে কাগজটি দেখিয়ে ঠিক আছে কি না জানতে চান। আমি বলি এগুলো কিছুই ঠিক নেই। তখন তিনি একটি সাদা কাগজে সই নেন। পরে দেখি আমার বক্তব্য নেই, পুলিশের সেই বক্তব্যই লেখা হয়েছে। আমাকে জেলে পাঠানোর আদেশ দেয় আদালত।

এরপর আরও ১৮ মাস রাজশাহী কারাগারে কাটাতে হয় এই মাদরাসা শিক্ষককে। এ সময় মাত্র দুদিন কোর্টে তোলে তারা। সাত মাস কারাভোগের পর হাইকোর্ট থেকে জামিন লাভ করলেও তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। ১৮ মাসের মাথায় আরেকবার জামিন হলে মুক্তির জন্য জেলগেট পর্যন্ত নিয়েও ফেরত পাঠানো হয়। দুদিন পর সংশ্লিষ্টদের টাকাপয়সা দিয়ে বের হন তিনি। এ মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছেন এই আলেম।

এ প্রসঙ্গে মুফতি ইব্রাহীম বলেন, এ মামলা চালাতে গিয়ে তার প্রায় ২৪ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এ কথা এত দিন কারও কাছে বলারও সুযোগ হয়নি। তিনি বলেন, গুম থাকা দুই মাসে তাকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই খরচ হয়েছে ৪ লাখ টাকা। দুই মাস তার সন্ধান না পেয়ে পরিবারের সবার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। দেশের এমন কোনো জেলখানা নেই, যেখানে খোঁজাখুঁজি করেননি তারা।

তার খোঁজ চেয়ে এক সপ্তাহের মাথায় যশোরে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। বিভিন্ন এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার ভাইপো। কোনো সন্ধান পায়নি তারা। দুই মাস পরও সন্ধান পাওয়ার পরও তাকে ছাড়াতে পুলিশকে অনেক টাকা দিতে হয়। ঝিকরগাছা থানা, ঢাকার ডিবিসহ বিভিন্ন অফিসে এসব টাকা দেওয়া হয়।

মুফতি ইব্রাহীম জানান, কাউন্টার টেরোরিজমের এডিসি একরামুলের নেতৃত্বেই তাকে কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার তত্ত্বাবধানেই শেষ পর্যন্ত ছিলেন তিনি।

তিনি বলেন, কোনো অপরাধ তিনি করেননি। তবে ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা হিসেবে সে সময় যশোরে বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে তিনি সোচ্চার ছিলেন। হেফাজতে ইসলামের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি।

গ্রেপ্তার-নির্যাতনের প্রভাব পড়ে তার পরিবারের ওপরও। মুফতি ইব্রাহীম জানান, তার স্ত্রী পর্দানশিন, কারও সামনে যেতেন না। কিন্তু তাকে অনেকভাবে হয়রানি করেছে পুলিশ। যেকোনো সময় প্রয়োজনে ডাকত পুলিশ, এমনকি রাতেও ডাকা হতো। এ সময় চরম আর্থিক কষ্টে পড়ে তার পরিবার। প্রয়োজন মেটাতে বাড়ির এক খণ্ড জমি বিক্রি করে দেয়। এ ছাড়া বিভিন্নভাবে ঋণ নিয়ে সংসার ও মামলা চালায় তারা। জেল থেকে বের হওয়ার পরও সাত-আট লাখ টাকা ঋণী ছিলেন তিনি।

মুক্তির পরও তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না পুলিশ। গভীর রাতেও তার বাসায় আসত ঝিকরগাছা থানা-পুলিশ। তল্লাশির পাশাপাশি নানা কথাবার্তা বলত। এতে আতঙ্কে ঠিকমতো ঘুম হতো না। সন্তানদের নিয়েও টেনশন হতো।

৫ আগস্টের পর সেই পরিস্থিতি কেটে গেছে। তবে এখন সমস্যা রাজশাহীর আদালতে হাজিরা দেওয়া নিয়ে। গত ৭ জানুয়ারিও তিনি হাজিরা দিয়ে এসেছেন। এতে যাতায়াত কষ্টের পাশাপাশি আর্থিক খরচ মেটানো তার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ভিত্তিহীন এ মামলা থেকে দ্রুত অব্যাহতি চান তিনি।

রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে ভারতীয় দূতাবাসের লোক

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৪৯

আওয়ামী সরকারের টানা তিন মেয়াদেই বিভিন্ন বাহিনীর যৌথ নির্যাতনের শিকার হন তরুণ আলেম মুফতি হারুন ইজহার। তিন দফায় গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছর জেলে কাটান তিনি। দফায় দফায় ৭০ দিনের রিমান্ডে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হয় তার ওপর। রিমান্ডে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদে ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন সম্পাদক ও ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা।

জেলখানায়ও ২৪ ঘন্টা লকআপে রাখা হয় ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে। গ্রেপ্তার-রিমান্ড ছাড়াও অনানুষ্ঠানিকভাবে দফায় দফায় আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানির শিকার হন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের এই যুগ্ম মহাসচিব। ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুমের শিকার হয় তার পরিবারও। স্ত্রী-সন্তানদের গ্রেপ্তারের হুমকিসহ নানা ভয়ভীতি দেখান আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা।

খ্যাতিমান এই আলেম আমার দেশকে জানিয়েছেন তার ওপর আওয়ামী সরকারের বর্বরতার অংশবিশেষ। মুফতি হারুন ইজহার দেশের বিভিন্ন কওমি মাদরাসার পাশাপাশি লেখাপড়া করেছেন ভারতের দেওবন্দ ও পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রামের জামিয়াতুল উলূম

আল-ইসলামিয়া লালখান বাজার মাদরাসায় শিক্ষকতা ছাড়াও নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ওয়াজ-মাহফিলের পাশাপাশি হেফাজতে ইসলামের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকায় বিগত আওয়ামী সরকারের রোষানলে পড়েন তিনি। তার বিরুদ্ধে সরকারের সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ ছিল তার ভারতবিরোধী অবস্থানের কারণে। এ জন্য গ্রেপ্তারের পর সরাসরি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করেছে বলে তার অভিযোগ।

আওয়ামী সরকারের সময়ে আলেম নির্যাতন প্রসঙ্গে লালখান বাজারের আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার নির্বাহী পরিচালক মুফতি হারুন ইজহার আমার দেশকে বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে জুলুমবাজ সরকার ছিলেন শেখ হাসিনা। একটানা ১৫ বছর শাসন করে গেছেন, এই দেড় দশকের পুরো সময়টাই ছিল নির্যাতনের বছর। ২০০৯ সাল থেকেই মূলত আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতনের সূচনা হয়।

তিনি বলেন, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের নভেম্বরে আমি প্রথম গ্রেপ্তার হই। জুলুমবাজ ফ্যাসিস্ট সরকারের পুরো সময়টাই ভিকটিম আমি। আমার নামে কোনো অভিযোগ দিতে না পারায় ডিটেনশনে রাখা হয়েছিল আমাকে। চট্টগ্রামের নিজের বাড়ি থেকে ধরে বিশেষ ক্ষমতা আইনে তিন মাস আটকে রাখা হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পাই। এরপরও চলাফেরার ওপর ছিল বিধিনিষেধ। নিরাপত্তাহীনতার কারণে ঘর থেকে বের হতে পারতাম না।

২০১৩ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। ২০১৬ সালের জুলাই পর্যন্ত তিন বছর জেলে ছিলেন তিনি। তৃতীয় পর্বে গ্রেপ্তার হন ২০২১ সালে। মোদির আগমনবিরোধী আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এক ডজন মিথ্যা মামলা দিয়ে বহু আলেম-ওলামার পাশাপাশি হারুন ইজহারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন তিনি।

তিন দফায় গ্রেপ্তার-নির্যাতন প্রসঙ্গে হারুন ইজহার বলেন, প্রথমবার গ্রেপ্তারের সময় ডিএমপি কমিশনার ছিলেন শহীদুল হক। তখন ডিবিপ্রধান ছিলেন মনিরুল। গ্রেপ্তারের পর তিন দিন গুম করে রাখা হয়েছিল তাকে। ওই সময় তাকে সরাসরি ক্রসফায়ারের হুমকি দেওয়া হয়। আর জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রথম আলোর নিউজ দেখিয়ে নির্যাতন করে।

তাকে জঙ্গি, লস্কর ই তৈয়বার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ এবং ভারতবিরোধিতার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। এ সময় একজন এডিসি বলেন, ইসলাম এ দেশে চলবে না, ইসলাম চাইলে পাকিস্তান চলে যাও।

তিনি জানান, কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় ৫৪ ধারায় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। ১৫ দিনের মাথায় জামিন নিয়ে বের হন তিনি। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট থেকে আবার ধরে ফেলে পুলিশ। বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমবার গ্রেপ্তারের পর তিনি দুই দফায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে ছিলেন। কোনো কিছু প্রমাণ করতে না পারায় আদালত সংশ্লিষ্টদের ভর্ৎসনাও করেছিলেন।

হারুন ইজহার জানান, তাকে মূল নির্যাতন শুরু করে ২০১৩ সালে গ্রেপ্তারের পর। সে সময় হেফাজতের চট্টগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ছিলেন তিনি। শাপলা চত্বরের ঘটনার দিন তিনি চট্টগ্রামেই ছিলেন। অথচ এ ঘটনায় প্রায় দুই ডজন মামলা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে।

পরে চট্টগ্রামের কিছু মামলায়ও তাকে যুক্ত করা হয়। সে সময় প্রত্যেকটা মামলায় প্রায় ১০ দিন করে রিমান্ড চাওয়া হয়। প্রথমে চার মামলায় এক নাগাড়ে ১৭ দিন রিমান্ডে ছিলেন তিনি। এরপর দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয় হারুন ইজহারকে। প্রথমে চট্টগ্রামে রিমান্ডে নেওয়া হয়, সেখানে র‍্যাব-পুলিশ-এনএসআইসহ অন্য সংস্থা যৌথভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

মুফতি হারুন ইজহার বলেন, চট্টগ্রামে রিমান্ডের সময় অফিসাররা সব হিন্দু ছিলেন। রিমান্ডে তার চোখা বাঁধা ছিল। এ সময় চেয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করা হয়। র‍্যাবের একজন তাকে কিল মেরেছিল। কয়েকজন মহিলা হিন্দু অফিসার ছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন অনন্দিতা রায়।

রিমান্ড শেষে তাকে আনা হয় ঢাকার ডিবিতে। তখন আবার আদালতে তুলে রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। পরে যতবারই তিনি জামিন পান, ততবারই তাকে জেলগেট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এভাবে তিনবার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জেলগেট থেকে শুধু আটক নয়, আবার গুম করে নির্যাতন করা হয়। ২০১৫ সালে এ ধরনের গুমের ৪৮ ঘণ্টা পর আদালতে হাজির করে পুলিশ। নতুন মামলা দিয়ে আবার রিমান্ড ও জেলে পাঠায়। এভাবে ২০১৩ সালে গ্রেপ্তার-পরবর্তী ৪৫ দিন রিমান্ডে নেয় তাকে।

সর্বশেষ ২০১৬ সালে হাইকোর্ট থেকে ‘নো অ্যারেস্ট, নো হ্যারেজ’ অর্ডার নিয়ে জেল থেকে বের হওয়ার পরও গ্রেপ্তার হন তিনি। তখন অর্ডারটি তার স্ত্রী দেখালে চট্টগ্রামের এসবিপ্রধান তা ছুড়ে ফেলে দেন। পরে আদালত অবমাননার মামলার হুমকি দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি জানান, রাজনৈতিক মামলায় আটক করলেও আলেম দেখলেই জঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করে পুলিশ। সন্ত্রাসীর মতো আচরণ করা হতো তাদের সঙ্গে।

তৃতীয় দফায় ২০২১ সালে গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টা গুম রেখে আদালতে পাঠায় তাকে। সে সময় র‍্যাবের রিমান্ডের পর হাটহাজারী থানায় নিয়ে বর্বর নির্যাতন করা হয় তাকে। ক্রিকেট স্টাম্প দিয়ে তাকে পেটায়। একটি ঘটনায় বিভিন্ন সংস্থা তাকে রিমান্ডে নেয়। পরে চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো হয় রাজশাহীতে। সেখানে জঙ্গি মামলায় একটি সংস্থা রিমান্ডে নেয়। পরে নেওয়া হয় ঢাকার সিটিটিসিতে। সেখানে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা ড. নিতিশ সেই জিজ্ঞাসাবাদে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

পিবিআইয়ের রিমান্ডে ভিন্ন ধরনের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চার দিনের রিমান্ডে তারা এক মুহূর্তও ঘুমাতে দিত না। চেয়ারে বসিয়ে রাখত। একপর্যায়ে নামাজের সেজদার মতো করে ঘুমানোর চেষ্টা করতেন তিনি। তবে তারা টের পেলেই জাগিয়ে তুলত।

তিনি বলেন, রিমান্ডে সবচেয়ে বড় যে ঘটনা ঘটেছে, তা দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ স্বাধীন একটি দেশের সরকারি সংস্থা সিটিটিসির রিমান্ডে হিন্দু পূজা উদযাপন পরিষদ নেতা এবং কালবেলা সম্পাদক ও প্রকাশক সন্তোষ শর্মা দোভাষী ছিলেন এবং ভারতীয় দূতাবাসের এডুকেশন মিনিস্টার বা গোয়েন্দা ভাষায় স্টেশন ম্যানেজার বলা হয়, তিনি তাকে দীর্ঘ সময় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রথমে সন্তোষ শর্মা নিজেকে মানবাধিকার কর্মী এবং আরেকজনেক শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছেন বলে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে তিনি কথা বলছিলেন হিন্দি ভাষায়।

ভারতীয় দূতাবাসের সেই কর্মকর্তা চলে যাওয়ার সময় একটা কাগজ এবং একটা থাম দিয়ে যান। থামে সম্ভবত টাকা দিয়ে যান। তার মানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তাদের টাকা লেনদেন হতো। পরে রাতে যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন দেখি সেই ভারতীয় কর্মকর্তার দেওয়া কাগজ দেখে প্রশ্ন করছিলেন। সে সময় ডিসি আব্দুল মান্নান, ডিসি ইমরান ও ডিসি আতিক ছিলেন। ওই রিমান্ডের সময় সিটিটিসিতে খাবারে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ করেন হারুন ইজহার।

তিনি বলেন, এখানে প্রথমত আওয়ামী লীগ। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বাহিনী এবং তৃতীয়ত, মিডিয়ার মাধ্যমে আলেমদের নির্যাতন করা হতো।

শুধু রিমান্ডে নির্যাতন নয়, জেলে পাঠানো হলেও গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা চাপ সৃষ্টি করে আরেক ধরনের নির্যাতন করতেন। এই নির্যাতন ছিল দীর্ঘমেয়াদি। ২৪ ঘন্টা লকআপে রেখে দিতেন। মাঝেমধ্যে বেড়ি পরিয়ে রাখতেন। সার্বক্ষণিক থাকত সিসি ক্যামেরা। আদালতে আনা-নেওয়ার সময় ডান্ডাবেড়ি, হ্যান্ডকাফ ও হেলমেট পরিয়ে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হতো। মাঝেমধ্যে হ্যান্ডকাফ পেছনদিকে পরানো হতো। এই জুলুমের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, পুলিশ, জেল কর্তৃপক্ষ, আদালত, গোয়েন্দা সংস্থা এবং দেশবিরোধী মিডিয়া জড়িত ছিল।

এর আগে গ্রেপ্তারের পরপরই ভারতবিরোধিতার বিষয়ে পুলিশ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি নেয়, তখন বলা হয়, এটা না দিলে আবার রিমান্ডে পাঠানো হবে এবং সব জেলায় ঘোরানো হবে। এরপর চট্টগ্রামে আদালতের বিচারক চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কামরুননাহার রুমি একইভাবে বলেন, পুলিশ যা লিখে দিয়েছে, তা বলেন, নইলে আবার রিমান্ডে পাঠিয়ে দেব। ওই আদালতের খাসরুমে ডিজিএফআইয়ের লোকও বসা ছিল।

গোয়েন্দা অত্যাচারে ইমামতি থেকে অব্যাহতি

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৫৪
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৪৪

পবিত্র রমজানে শত শত মুসল্লি নিয়ে তারাবির নামাজ পড়িয়ে বেশ ক্লান্ত ইমাম। একটু বিশ্রামের প্রস্তুতি নিতেই তিনি দেখেন মসজিদটি ঘিরে ফেলেছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ছড়িয়ে পড়ে গ্রেপ্তার আতঙ্ক।

পুরো এলাকায় পুলিশি কর্ডন আর অঘোষিত রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। একপর্যায়ে গভীর রাতে চতুর্থতলায় উঠে সন্ত্রাসীর মতো গ্রেপ্তার করা হয় রাজধানীর নিউমার্কেট অ্যারোপ্লেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা সানাউল্লাহকে। পরে সন্ত্রাস দমনের আইনে মামলা দিয়ে নেওয়া হয় সাত দিনের রিমান্ডে। আর সেই মামলার জাল থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘ ছয় মাস জেলে কাটাতে হয় তরুণ এই আলেমকে।

শুধু নিজেই নির্যাতনের শিকার হননি মাওলানা সানাউল্লাহ। তাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের অত্যাচারে ঘরছাড়া হয়েছিলেন তার বৃদ্ধ দাদা-দাদি ও মমতাময়ী মা। জামিনে মুক্তির পরও অব্যাহত ছিল পুলিশ ও গোয়েন্দা হয়রানি। যে কারণে মসজিদের খতিবের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন তিনি।

নিউমার্কেট মাদরাতুন নাজাতের প্রিন্সিপাল মাওলানা সানাউল্লাহ খান জানান, বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে মূলত ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশের আলেম-ওলামারা ব্যাপক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেকে শাহাদাত বরণ করেছেন, অসংখ্য আলেম গ্রেপ্তার হয়েছেন। পঙ্গুত্ববরণসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা। তারই অংশ হিসেবে ২০২১ সালের ২০ এপ্রিল তাকে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি বলেন, যারা ইসলামের কথা বলেন, হকের পক্ষ নেন, তাদের সেই কথা থামিয়ে দিতেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগে থেকেই তিনি ছিলেন গোয়েন্দা নজরদারিতে। আশঙ্কা করছিলেন গ্রেপ্তারের। কারণ ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রচুর লেখালেখি করতেন।

২০ এপ্রিল আট রমজানের তারাবি পড়িয়ে মসজিদেই অবস্থান করছিলেন মাওলানা সানাউল্লাহ খান। হঠাৎ দেখতে পান নিউমার্কেট থানার একটি গাড়ি মসজিদের সামনে অবস্থান করছে। তিনি কী করবেন ভেবে মসজিদেই অবস্থান রেন। রাত ১১টায় তারাবি শেষ হওয়ার পর থেকে ২টা পর্যন্ত তিনি সবাইকে পুলিশের উপস্থিতির বিষয়টি জানান। ওই সময় এত আতঙ্ক যে, কেউ তাকে সহযোগিতা করার মতো ছিল না। আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন তিনি। ফেসবুকেও স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো সাহায্য নেই।

একপর্যায়ে শুধু নিউমার্কেট নয়, শাহবাগ, পল্টন থানা-পুলিশের গাড়িও মসজিদের পাশের পুরো সড়কে অবস্থান নেয়। গাউছিয়া মার্কেটের পাশ থেকে বাটা সিগন্যাল পর্যন্ত সড়কে রেড অ্যালার্ট জারি করে জড়ো হয় ২০-৩০ গাড়ি পুলিশ। আড়াইটার দিকে চারতলায় তার রুমে ঢোকে পুলিশ। মসজিদের কোনো পবিত্রতাকে আমলে না নিয়ে বুট পায়ে মসজিদে প্রবেশ করে এবং একজন আলেম হিসেবে যে সম্মান পাওয়ার কথা ছিল, তা পাননি তিনি। বরং সন্ত্রাসীর মতো করে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাওলানা সানাউল্লাহ বলেন, তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে পুলিশ জানায়, কোনো কারণ নেই, ওপরের নির্দেশনায় গ্রেপ্তার করছি। তিনি বলেন, হাসিনার আমলের পুলিশ মসজিদ বলতে যে একটা সম্মানবোধ থাকে, জুতা খুলে প্রবেশ করতে হয়Ñসেটাও তারা করেনি। আসলে তারা বাংলাদেশের পুলিশ ছিল, নাকি অন্য কোনো রাষ্ট্রের লোক ছিল তা নিয়ে সন্দেহ হয়।

তিনি বলেন, আমাকে গ্রেপ্তারের দুটি কারণ থাকতে পারে। এক হলো, আমি খুব লেখালেখি করতাম। দ্বিতীয়ত, জুলুম-অত্যাচার, ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে মসজিদে কথা বলেছি। নিউমার্কেটের মতো গুরুত্ব জায়গার খতিব হিসেবে টার্গেট করেই তারা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের পেছনে আলেম-ওলামা নির্যাতনকে অন্যতম কারণ উল্লেখ করে মাওলানা সানাউল্লাহ বলেন, মসজিদের ইমাম পর্যন্ত নিরাপদ ছিলেন না। মসজিদগুলো কবজা করে সেখানে আল্লাহ ও রাসুলের কথা বন্ধ করতে চেয়েছিল।

কীভাবে নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত এবং লুটপাট ও দুর্নীতি অব্যাহত রাখা যায়, ইমামরা যেন জুলুম-অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে সেই কাজ করা হতো। তাদের এক ধরনের নির্দেশনা ছিল যে, মসজিদে মাটির ওপরের কথা বলবেন না, মাটির নিচের কথা

তথা কবর-হাশর ইত্যাদি। অনেক ইমামকে সাধারণ সুদ-ঘুষের বিরুদ্ধে কথা বলায় অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

মাওলানা সানাউল্লাহ বলেন, মসজিদ থেকে গ্রেপ্তার করেই তাকে নেওয়া হয় পল্টন থানায়। সেখানে আরও কয়েকজন আলেম-ওলামা ছিলেন। সন্ত্রাস দমনের একটি মামলা দিয়ে পরদিন আদালতে তুলে সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করানো হয়। রিমান্ডে পল্টন থানার ওসি আবু বকর আমাদের নির্যাতন দেখে কান্না করতেন।

উনি নিজের অপারগতা প্রকাশ করে বলতেন, সব অর্ডার আসে ওপরের ফ্যাসিস্ট দপ্তর থেকে। তিনি বলেন, অন্য সাধারণ বন্দিদের স্বাভাবিকভাবে আদালতে নেওয়া হলেও আমাদের হ্যান্ডকাফ ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ কখনও কখনও শারীরিক আক্রমণ করেছে। মানসিক আক্রমণ তো সব সময়ই চালাত।

তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশ থেকে এই নির্যাতন পরিচালিত হয়নি, র-এর এজেন্ট ও ভারতের কথায় আমাদের ওপর নির্যাতন হয়েছে। রিমান্ড শেষে কেরানীগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। সেখানে ১৭-১৮ দিন ছিলেন তিনি। সেখানেও তাদের খাবার-দাবারে প্রচুর কষ্ট দেওয়া হয়েছে। রমজানে ঠিকমতো ইফতার করতে পারেননি তারা। কোনো ধরনের পানি খেয়ে সাহরি করেন। ইফতারেও পর্যাপ্ত খাবার পাননি।

তবে জেলের অন্য বন্দিরা তাদের দেখে কান্না করতেন। কারণ তাদের স্বাভাবিক স্থানে রাখা হতো না। জেলখানার ভেতরেও আরেকটা জেলখানা স্থাপন করা হয় নির্যাতনের জন্য। কেরানীগঞ্জ থেকে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে নিয়েও তাকে জঙ্গি সেলে রাখা হয়।

তিনি বলেন, জেলে তাদের হাঁটাচলার সুযোগ ছিল না। সব সময় রুমবন্দি করে রাখা হতো। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কথার টর্চারিং ছিল। এভাবে ছয় মাস কারাজীবনে ব্যাপক কষ্টের মুখোমুখি হন তিনি।

হরতালের দিন বায়তুল মোকাররমে মিছিল করার হুকুমদাতা হিসেবে মামলা দেওয়া হয় মাওলানা সানাউল্লাহর বিরুদ্ধে। অথচ ওইদিন তিনি নিজের মসজিদে নামাজ পড়িয়েছেন। আদালতে বিষয়টি বলার চেষ্টা করা হলেও হেফাজতের মামলা হিসেবে ওঠানোর সুযোগ দেয়নি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে প্রথমে হাইকোর্ট থেকে ও পরে নিম্ন আদালত থেকে জামিন পান তিনি। তবে মামলা এখনও চলমান আছে। এগুলো অব্যাহতি দেওয়ার জন্য হেফাজতের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে যোগাযোগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, জামিনে মুক্তির পর সাধারণ মানুষের চাওয়া অনুযায়ী মসজিদের চাকরি ঠিক ছিল। তবে পরে আমি স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। সেখানে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের তৎপরতায় মসজিদ কমিটি বিরক্ত হয়ে যায়, আমাকে রাখা নিয়ে বিভক্তিও দেখা দেয়। একপর্যায়ে তিনি নিজেই মসজিদের চাকরি ছেড়ে দেন। বর্তমানে মাদরাসা পরিচালনায় আছেন তিনি।

নিউমার্কেট মাদরাতুন নাজাতের প্রিন্সিপাল মাওলানা সানাউল্লাহ খান বলেন, মাদরাসাতেও গোয়েন্দা নজরদারি ছিল। তারপরও আমাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিলাম। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের আবার গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হতো। এবার ধরলে ফাঁসিতে ঝোলানোরও হুমকি দেওয়া হয়। এসব উপেক্ষা করেই আলেমরা তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। তারই ধারাবাহিকতায় জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হয়েছে।

গ্রেপ্তারের পর তার পরিবারও নিরাপদ ছিল না। এ প্রসঙ্গে সানাউল্লাহ খান বলেন, পটুয়াখালীতে তার বৃদ্ধ দাদা-দাদিকে হয়রানি করা হয়েছে। নাতির বিষয়েও তাদের বিষয়ে নানা খোঁজখবর নেয় পুলিশ। তারা পাকিস্তানপন্থি কি না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করত। একপর্যায়ে তারা সেই বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি চলে যান। কেরানীগঞ্জে তার মা নিজের ঘরে ঠিকমতো থাকতে পারেননি। এলাকার মানুষ দিয়ে তাদের হয়রানি করা হয়। পুলিশ গিয়ে হররানি করত। পরিবার পরিজন পর্যন্ত নিরাপদে থাকতে পারেনি।

আলেম-ওলামা ধরেই জঙ্গি ট্যাগ দেওয়া হতো বলে জানান ঢাকা মহানগর হেফাজতে ইসলামের নির্বাহী সদস্য ও লালবাগ জোনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সানাউল্লাহ। রিমান্ডেও বারবার এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হতো। তারা বলত হেফাজতের এত সমাবেশের টাকা পান কোথা থেকে? আমরা বলতাম, আমাদের কোথাও লিঙ্ক নেই। ধর্মীয় জায়গা থেকে আমরা এসব কাজ করি। কিন্তু তারা জঙ্গি কানেকশনে জড়ানো ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসূত্রতা প্রমাণে বারবার নির্যাতন করত।

মাওলানা সানাউল্লাহ বলেন, যারা মসজিদগুলো পরিচালনা করতেন, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে বেশি। কারণ মসজিদগুলো আলেম-ওলামাই নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সেখান থেকে জুমায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেসেজ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের বড় একটা আয়ত্তের জায়গা ছিল মসজিদ। বিভিন্ন খতিবের ওপর তাই নির্যাতন করা হয়। ৫ আগস্টের আগেও জুলাই-বিপ্লব নিয়ে কথা বলায় এক দিনেই অন্তত ১০০ খতিবের চাকরি গেছে। শহীদদের জন্য দোয়া করায় এই শাস্তি। অনেক খতিবকে হত্যা করা হয়েছে, গুম করা হয়েছে। জুলাই বিপ্লবেও ১১৭ জন আলেম ও ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে মসজিদগুলোয় মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ধর্মের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন তারা। এটা একা আত্মতৃপ্তির বিষয়। যারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, অতিদ্রুত তাদের এ দেশের রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত। একই সঙ্গে আওয়ামী ফ্যাসিস্টের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে যথাযথ শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত। ফ্যাসিস্ট হাসিনা যে অপরাধ করেছে, তাতে তার কয়েকবার ফাঁসি হওয়া উচিত। তার সহযোগী ও হুকুমদাতাদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহলে এ দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ধর্মীয় স্বাধীনতাও ফিরে পাবে সবাই।

রিমান্ডে সাত দিন ঘুমানোর সুযোগ পাইনি

রকীবুল হক

প্রকাশ : ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ২০

আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৫১

মিরপুরে নিজের মাদরাসায় সকালে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমী। পবিত্র রমজানের সেই সময়ে হঠাৎ সেখানে ডিবির একটি দল হানা দেয়। পরে ডিবি অফিসে নিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয় তার কাছ থেকে।

একপর্যায়ে পুলিশ হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রথমে সাত দিন রিমান্ড এবং পরে জেলে পাঠানো হয় ঢাকা মহানগর হেফাজতে ইসলামের এই সহ-প্রচার সম্পাদককে। এভাবে সাড়ে তিন মাস কাটাতে হয় জেলের অন্ধকারে।

মিরপুর তাহজিবুল উম্মাহ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমী এসব তথ্য জানিয়ে আমার দেশকে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের আলেম-ওলামাদের ওপর যে ধরনের জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা সহজে ভোলার নয়।

আল্লাহর দ্বীন কায়েমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কারণেই আলেম-ওলামাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। আলেম-ওলামারা সত্যের কথা বলেন, হকের কথা বলেন, ন্যায়ের কথা বলেন এবং অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলেন। এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই বাধার সম্মুখীন হন তারা।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের পবিত্র রমজান মাসে প্রায় আড়াই হাজার হেফাজতে ইসলাম নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে আওয়ামী সরকার। বিশেষ করে আল্লামা মামুনুল হককে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেদিন সকাল সাড়ে ৯টায় আমি মিরপুরে আমার মাদরাসায় এসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডিবির আট কর্মকর্তা উপস্থিত হন। তারা আমাকে বলেন, আপনি তো হেফাজতের বড় নেতা। আমি বললাম, আমি তো সহ-প্রচার সম্পাদক। আমার ওপরে আরও ৫০ নেতা আছেন।

তারা বলেন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে ডিবি অফিসে যেতে হবে। কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি রেডি হয়ে তাদের সঙ্গে যাওয়ার আগে আমার কাছে থাকা মোবাইলটা সরাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা দ্রুত আমার মোবাইলটা নিয়ে নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে রাখা একটি মাইক্রোতে করে মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে নিয়ে যান।

সেখানে কয়েকজন অফিসারের সামনে হাজির করে বলা হয়, আপনার কপাল খারাপ। 'কেন'—জানতে চাইলে তারা বলেন, মাওলানা মামুনুল হক এইমাত্র গ্রেপ্তার হয়েছেন, আরও আগে গ্রেপ্তার হলে আপনারটা এড়িয়ে যাওয়া যেত। তাদের রহস্য বোঝা মুশকিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই রাখা হয়। সেখানে আরও কয়েকজন আলেম আটক ছিলেন।

আমার নাম-ঠিকানা জানার পর সেখানেই ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। পরে একটি রুমে রাখা হয়, যেখানে এর আগে আরও বড় বড় নেতাকে রাখা হয়েছিল। যে রুমে সর্বোচ্চ চারজন থাকা যায়, সেখানে আমাদের ১০ জনকে রাখা হয়। এতে অনেক সময় বড় আলেমদের গায়ে পা লেগে যেত। গাদাগাদি করে আমাদের রাখা হয়।

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, মামুনুল হককে সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যখন ওই রুমে আনা হয়, তখন তার বসারও জায়গা ছিল না। পরে রাতে মামুনুল হককে একটি খাঁচার মতো রুমে রাখা হলো। সেখানেই তিনি রাতভর নামাজ পড়েন।

সারাদিন রোজা রেখে সেখানকার খাবার খাওয়া কতটা যে দুরুহ ব্যাপার ছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না। টয়লেটে যাওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। অর্থাৎ যেখানে অমুসলিম দেশেও রমজান মাসকে শ্রদ্ধা করে, সেখানে ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে রমজানের পবিত্র সময়ে আলেম-ওলামাদের ছোট রুমে আবদ্ধ রেখে নির্যাতন করা হয়।

পরের দিন পুলিশ হত্যা চেষ্টার মামলা দিয়ে আদালতে তোলা হয় মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমীকে। একটি মামলা হলেও তার ধারা ছিল অনেকগুলো। আদালতে বিচারক আমার বক্তব্য জানতে চাইলে আমি বলি, আমি তো বিগত দুই বছর গুলিস্তানের ওপারে যাত্রাবাড়ী এলাকায় কোনোদিন আসিনি।

রমজানের পবিত্র মাসে আমাকে ভিত্তিহীন মিথ্যা পুলিশ হত্যাচেষ্টার মামলা দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রশ্নই আসে না। আমরা জীবনে কাউকে ছোট ঢিলও ছুড়িনি, অথচ অন্যায়ভাবে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। ধর্মকর্ম পালনের সুবিধার্থে রিমান্ড না দিয়ে বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাই। তখন বিচারক বলেন, আমাদের কিছুই করার নেই। তখন সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ডিবিতে রিমান্ডে নেওয়া

হয়। সেখানে আবার ১১ জনকে একটি রুমে গাদাগাদি করে রাখা হয়। সাত দিনে আট-দশবারের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে।

এ সময় একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়; বলা হয়, আপনারা কেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যাকাণ্ড ঘটালেন? বায়তুল মোকাররমের সংঘাতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলেছি, এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সেখানে হেফাজতের কোনো কর্মসূচিও ছিল না। বারবার তারা এ ঘটনার সঙ্গে হেফাজতকে জড়ানোর চেষ্টা করে।

রিমান্ডে শীর্ষ আলেমদের সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো, দিনে কয়েকবার করে তাদের ডাকা হতো। একদিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীবের চেহারা খুব মলিন দেখা যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, যেভাবে তারা চাপ প্রয়োগ করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আগামীকাল যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে কিছু একটা করে ফেলব। তখন তাকে যুগে যুগে আলেম-ওলামা নির্যাতনের বিষয় স্মরণ করিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করা হয়।

মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমী বলেন, রিমান্ডে আমাকে বারবার মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে আমি রাজি হইনি। সাত দিন ধরে নানাভাবে মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমেও স্বীকারোক্তি নিতে ব্যর্থ হয় তারা। রিমান্ড শেষে ডিবি থেকে তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে আদালতে নিয়ে গারদে রাখা হয়।

তবে আদালতে হাজির করা হয়নি। তাকে এক রুম থেকে আরেক রুমে নেওয়ার সময় হ্যান্ডকাফ পরানো হতো। আমরা বলতাম, আমরা তো চোর-ডাকাত নই। আমাদের কেন হ্যান্ডকাফ পরাতে হবে? মারাত্মক অপরাধীকেও তো হাতকড়া পরানো হয় না। শীর্ষ আলেমদের কেন এক রুম থেকে আরেক রুমে নিতে হ্যান্ডকাফ পরাতে হবে? পুলিশ বলত, কিছুই করার নেই। আমাদের ওপরের নির্দেশ, হ্যান্ডকাফ পরাতেই হবে।

ডিবিতে রিমান্ড চলাকালে খাবারের খুব কষ্ট ছিল। ডাল-ভাত আর শুকনো টাটকিনি মাছ দেওয়া হতো। তাই সাহরিতে খাওয়া হতো। আর ইফতারে সামান্য কিছু আইটেম দেওয়া হতো। সেখানে নামাজ আদায় করা ছিল খুবই কষ্টকর। ছোট রুমে প্রচণ্ড গরমে কোনো রকমে নামাজ আদায় করতাম। সাত দিনে সেখানে ঘুমানোর কোনো সুযোগ পাইনি।

মুক্তির পরও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল না এই আলেমের। এক মাস পর আবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় তাকে। এ সময় তাকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। একদিন এনএসআই থেকে তাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়। তাদের দাওয়াতে গেলে নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন তারা। একপর্যায়ে তাকে কিছু খেদমতের নামে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি কোনো সহযোগিতা নিতে রাজি না হলে তারা হতাশ হয়ে যান।

গ্রেপ্তারের পর পরিবারকেও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। মিরপুরে তার বাসার আশেপাশে কেউ যেতে সাহস পেতেন না, কারণ কাউকে সেখানে যেতে দেখলেই আওয়ামী

লীগের লোকজন বা গোয়েন্দা ও অন্যান্য প্রশাসনের লোকেরা সন্দেহ করতে পারে এবং তাদের আটক করতে পারে বলে তারা মনে করতেন।

আশপাশের সবাই গ্রেপ্তার আতঙ্কে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা যেভাবে আতঙ্কিত ছিলেন, এই মাওলানার বাড়ির আশপাশের বাসিন্দাদেরও একই অবস্থা হয়েছিল। প্রায় এক মাস সবাই সতর্কভাবে চলাফেরা করেছেন। এসময় তার পরিবারের খোঁজখবর নেওয়ার মতো, বাজার করে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। তাদের চরম অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে। আইন-আদালত করা, আইনজীবী ধরা—এসব কাজ করাও ছিল অসম্ভব।

সরকারের বিরুদ্ধে অপছন্দনীয় বক্তব্য দেওয়ায় মসজিদের খতিবের পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল মাওলানা জাকির হোসাইন কাসেমীকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিরপুরের বায়তুল মোমেন জামে মসজিদের খতিব থাকাকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।'

এটা তো কোনো মুসলমানের বক্তব্য হতে পারে না। এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের লোকেরা থানায় ও এলাকাবাসীর মাঝে তাকে জঙ্গি হিসেবে প্রচার করতে থাকে। তারা জঙ্গি মামলায় গ্রেপ্তার করানোর হুমকি দেয়। একপর্যায়ে ওসি তাকে ডেকে তিনি কী বক্তব্য দিয়েছেন, তা জিজ্ঞাসা করেন। তবে স্থানীয় কিছু মানুষের প্রতিবাদের কারণে সেই ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পান তিনি।

তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ ছিল বিগত সরকারের একটা কৌশল। এটা দিয়ে পশ্চিমাদের হাতে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আলেম-ওলামা ও দাড়ি-টুপিধারীদের জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল তারা। আজকে কোথায় সেই জঙ্গিবাদ।

সবাই তো দেশপ্রেমিক, এখানে কেউ জঙ্গি নয়। এভাবে দেশের তৌহিদি জনতা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এখনও অনেককে মামলায় হাজিরা দিতে হচ্ছে। এখনও জুলুম থেকে অনেকে রেহাই পাননি। সরকার যেন সেসব মামলা থেকে নির্যাতিতদের রেহাই দেন। একইসঙ্গে যারা এসব জুলুমের সঙ্গে জড়িত, তাদের যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করারও আহ্বান জানান তিনি।

হ্যান্ডকাফ ও জমটুপি পরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

রকীবুল হক
প্রকাশ : ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৪৭
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, ১১: ৪২

দেশের সর্বত্রই আলেম-ওলামা গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লেও নিজেকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না মাওলানা এহতেশামুল হক সাখী। একদিন মসজিদে হাদিসের একটি ক্লাস নিচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ সেখানে ডিবি পুলিশের হানায় উদ্বিগ্ন হন মসজিদটির ইমাম।

একপর্যায়ে তাকে আটক করা হয়। স্থানীয়রা বাধা দিয়ে আটকের কারণ জানতে চাইলে ডিবি অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এরপর একের পর এক মামলা সাজিয়ে নেওয়া হয় রিমান্ডে। মিথ্যা স্বীকারোক্তির জন্য নির্যাতনও করা হয় তাকে। কোনো তথ্য না পেলেও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই মেলেনি তার। দীর্ঘ ছয় মাস কারাগারে জঙ্গি-সন্ত্রাসী আসামিদের মতো কাটাতে হয় আরমানিটোলা মসজিদের সাবেক এই ইমামকে।

একজন তরুণ আলেম হিসেবে সুপরিচিত মাওলানা এহতেশামুল হক সাখী। হেফাজতে ইসলাম ঢাকা মহানগরের সহকারী দপ্তর সম্পাদকের পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পতিত সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার ছিলেন এই আলেম। তার এই তৎপরতা থামাতেই মূলত আওয়ামী সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তার ওপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয় বলে তার অভিমত।

মাওলানা সাখী বলেন, আওয়ামী শাসনামলে আলেম-ওলামাদের ওপর যে নির্বাতন করা হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। সেই নির্যাতনের কথা বলতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে। ধর্মীয় কর্মসূচি পালন করতে গেলেই পুলিশি হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটত। শাপলা চত্বরে আলেমদের ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি রিমান্ডে গিয়ে আলেম নির্যাতনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়েছি। ছোট একটা রুমে তাদের রাখা হয়েছে। সেখানে আসলে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। বয়স্ক আলেমদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল আর তরুণদের প্রচণ্ড মারধর করত। বিশেষ করে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য আদায়ের জন্য হাঁটুতে লাঠি দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি দিত পুলিশ। যখন কোনো অফিসারের কাছে নিয়ে যেত, তখন হাত পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ ও মাথায় জমটুপি পরিয়ে নিয়ে যেত।

পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে মসজিদ-মাদরাসায় পুলিশ আর গোয়েন্দা হয়রানি ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা এহতেশামুল হক সাথী বলেন, আমি একটি মসজিদের দায়িত্বে ছিলাম, বিভিন্ন সময় গোয়েন্দারা সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিত। আমাকে ধরে নিয়ে আসাও হয়েছে মসজিদ থেকে।

মামলা দিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এভাবে কোনো ওলামায়ে কেরামের মসজিদে বা মাদরাসায় শান্তিতে থাকার সুযোগ ছিল না। বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হতো। মাদরাসার ছাত্ররাও ছুটিতে এলাকায় গেলে ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুন্ডারা তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছে। তারা শিক্ষকদের কাছে বিষয়গুলো জানালেও আমাদের পক্ষে কিছুই করার ছিল না। তাদের ধৈর্যধারণের জন্য বলতাম।

একইভাবে মাদরাসার মুহতামিমরাও স্থানীয় আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের হয়রানির শিকার হয়েছেন। মিরপুরের একটি মাদরাসার একজন মুহতামিমকে জোর করে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এর কারণ ছিল তার ছাত্রদের তিনি ইসলামি ইস্যুতে বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে আসার জন্য বলতেন।

তিনি বলেন, জেলখানায় গিয়ে এক ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সে জানায়, যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। লাথির আঘাতে জেলে গিয়েও তার বমি হয়, রক্ত বের হয়।

২০২১ সালের ২২ এপ্রিল আরমানিটোলা মসজিদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মাওলানা সাথীকে। তখন ছিল রমজান মাস। ওই রমজানেই বাংলাদেশের অনেক ওলামায়ে কেরামকে গ্রেপ্তার করা হয়। হেফাজতের ঢাকা মহানগর নেতা হিসেবে তাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়ার পাঁচ মিনিট আগেই তাকে হেফাজতের নায়েবে আমির বর্তমানে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন ফোন করে কয়েকজন আলেমের খোঁজ নেন এবং আমাকে সাবধানে থাকতে বলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আরমানিটোলা মসজিদে হাজির হয় ডিবি পুলিশ। ওই মসজিদের ইমাম ছিলাম আমি। জোহরের পর মসজিদে হাদিসের ক্লাস নিচ্ছিলাম।

ডিবিতে নিয়ে নাম-তথ্য এন্ট্রি করেই ঢোকানো হয় লকআপে। ছোট একটা রুমে আরও অনেক আলেমকে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই রুমে আসলে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। অথচ মাওলানা মামুনুল হকসহ অনেককেই সেখানে রাখা হয়।

আসরের সময় তাকে সেখানে ঢোকানো হয়। ইফতারের পর তাকে ডাকা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এসময় লকআপ থেকে বের করার সময় হাত দুটি পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাতিরঝিল জোনের দায়িত্বে থাকা এক অফিসার কিছু কথাবার্তা বলার পর আবার ডাকা হবে বলে জানান। পরদিন পল্টন থানায় সহিংসতার একটি মামলা দেওয়া হয়।

মাওলানা সাখী জানান, ওই মামলার অভিযোগ লেখার সময় তাকে সহিংসতার নির্দেশদাতা হিসেবে জুনাইদ বাবুনগরীর নাম বলতে বলা হয়। বাবুনগরী পাকিস্তান গিয়েছেন, তিনি রাজাকার ছিলেন—এ ধরনের স্বীকারোক্তি আদায়ে বেশ চাপাচাপি করেন। এ সময় পাশের রুমে একজনকে মারা হচ্ছিল, তা দেখিয়ে তাকেও হুমকি দেওয়া হয়। তাদের কথা না শুনলে নির্যাতনের ভয় দেখায়, কিন্তু তাতে রাজি না হওয়ায় আদালতে পাঠিয়ে দেয়। আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। তাকে আবার ডিবিতে নেওয়া হয়।

রিমান্ডে নিয়ে মাওলানা হাসান জামিল সম্পর্কে তথ্য জানতে চায় পুলিশ। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে মাওলানা সাখীকে ছেড়ে দেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয়। তিনি তার অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাতে না পারায় হাঁটুতে বারবার লাঠি দিয়ে বাড়ি দেয়। এরপর ২৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে সহিংসতার সঙ্গেও সম্পৃক্ততার চেষ্টা করে পুলিশ। এসময় সাখী বলেন, আমি তো খতিব।

অন্য মসজিদে জুমা পড়িয়েছি। আমি কীভাবে বায়তুল মোকাররমে সহিংসতা করব। তখন তারা বলেন, তাদের কাছে তথ্য আছে। এভাবে মিথ্যা তথ্য স্বীকার না করলে হাঁটুতে জোরে জোরে বাড়ি দেয়। ওই আঘাত ব্রেইনে গিয়ে লাগত। এসময় তারা অশ্রাব্য গালাগালও করে।

প্রথম দফায় চার দিনের রিমান্ড শেষে মাওলানা সাখীকে নেওয়া হয় পল্টন থানায়। সেখানে নতুন মামলা দিয়ে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেখানেও ডিবির মতো একই রকম আচরণ করা হয়। চাহিদামতো তথ্য না দিলে পরিবারের লোকদের উঠিয়ে আনারও হুমকি দেওয়া হয়।

ঈদের আগের দিন মাওলানা সাখীকে নেওয়া হয় কাশিমপুরের হাইসিকিউরিটি কারাগারে। সেখানে জেল সুপার খুব সাবধানে থাকার জন্য নির্দেশনা দেন। সাখী বলেন, যে রুমে তাকে রাখা হয় সেখানে পানি নেই, মশার উৎপাত। যে ফাঁসির সেলে একজন থাকার কথা, সেখানে তাদের রাখা হয় আট-দশজনকে। এভাবে নির্মম নির্যাতনের মধ্যে ১০ দিন রাখার পর আরেকটি রুমে রাখা হয়।

ওই ভবনটি ছিল সবচেয়ে সিকিউরড। সেদিকে নাকি অন্য কোনো আসামির তাকানোও নিষেধ। সেখানে গিয়ে দেখেন কথিত জঙ্গিরা সব সেখানে। আমরা বললাম, আমরা তো জঙ্গি নই। আমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে। তবে সরকার চেয়েছে হেফাজতে ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠন হিসেবে দেখাতে।

মাওলানা সাখী বলেন, কারাগারের অন্য ভবনের আসামিদের সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ হলেও এখানকার আসামিদের সেই সুযোগ নেই। এতে মামলা পরিচালনা ও উকিল

ধরার মতো কোনো সুযোগ পায়নি পরিবার। প্রায় চার মাস পর ওই ভবন থেকে বের হন তিনি।

তারপর মামলার জামিন নেওয়ারও প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের পর তার পরিবারে হতাশা নেমে আসে। তবে আলেম পরিবার হওয়ায় তারা ধৈর্যের সঙ্গেই তা মোকাবিলা করেন। তারা আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ডিবিতে গিয়ে বড় ভাই আমার সঙ্গে দেখা করেন। এরপর আবার যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাকে কোন কারাগারে রেখেছে, তা কেউ জানতে পারেনি। প্রায় দুই মাস পর পরিবার জানতে পারে আমি গাজীপুরে আছি।

জামিনে মুক্তির পর সংশ্লিষ্ট মসজিদে আর দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়নি এই ইমামকে। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়, আমাদের ওপর চাপ আছে, আমরা আর আপনাকে রাখতে পারব না। পাশে একটি মাদরাসার শিক্ষা সচিব ছিলেন, সেখান থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, ডিবিতে দেখেছি অনেক সাধারণ মাদরাসা শিক্ষককে ধরে এনে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়। ছোট রুমে নির্মম কষ্ট দেওয়া হয়। এরপর বাইরে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার নাটক সাজিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়। জঙ্গি বলে স্বীকারের জন্য নির্যাতন করা হয় তাকে।

তিনি বলেন, আমরা এখন মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি চাই। কারণ বারবার হাজিরা দেওয়াও মানসিক চাপের বিষয়। এছাড়া শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ যাদের নির্দেশে আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, তাদের বিচার দাবি করেন তিনি।

জেলে মৃত্যুর মুখে লেখেন অসিয়তনামা

রকীবুল হক

প্রকাশ : ২০ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ২২

আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৩৫

একজন আলেম ও অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনের নেতার পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন মাওলানা নাছির উদ্দীন মুনির। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর জনপ্রিয় এই ব্যক্তিকেও বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরানো হয়, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় আর দীর্ঘ দুই বছর জেলে রেখে নির্মম অত্যাচার করেছে পতিত আওয়ামী সরকার।

নির্যাতনের একপর্যায়ে জেলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায় পরিবারের জন্য অসিয়তনামাও লিখেছিলেন তিনি। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের এই যুগ্ম মহাসচিবের পরিবারও হয়রানি থেকে বাদ পড়েনি। জোর করে ভাড়া বাসা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দুই সন্তানের পাবলিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। জেলে থাকায় বন্ধ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। মুক্তির পর অনেকটা মানসিক ও শারীরিক নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন হাটহাজারী উপজেলার সাবেক এই ভাইস চেয়ারম্যান।

নিজের করুণ অভিজ্ঞতা ছাড়াও দেশের আলেম-ওলামা নির্যাতনের বহু ঘটনার সাক্ষী মাওলানা মুনির। নিজের চোখে দেখেছেন শাপলা চত্বরের নির্মম হত্যাকাণ্ড। ২০১৩ সালের ৫ মের সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দমন-পীড়ন, দুঃশাসনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কনসেপ্ট নিয়ে এগোয়।

তারই ধারাবাহিকতায় আলেম-ওলামাকে মূল প্রতিপক্ষ মনে করে শুরু করে নির্যাতন। সেদিন রাত ২টার পর শাপলা চত্বরে কীভাবে তারা জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড, ব্রাশফায়ার এবং সরাসরি গুলি করে হত্যা করেছে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। র‍্যাবের সাবেক ডিজি বেনজীর আহমেদকে সেদিন মঞ্চের পেছনে প্ল্যানিং করতে দেখেন এই আলেম।

শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরও আলেম-ওলামাদের নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ প্রসঙ্গে নাছির উদ্দীন মুনির বলেন, লালবাগ জোনের সাবেক ডিসি হারুন আল্লামা আহমদ শফিকে দিয়ে একটি বক্তব্য প্রচারে বাধ্য করেছিলেন। আল্লামা শফীসহ শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে বিমানে দ্রুত ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে ফ্লাইট ধরতে লালবাগ থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বের হলে পলাশী থেকে গ্রেপ্তার হন আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী। পরের দিন হেফাজত নেতাদের নামে দেওয়া হয় ৭০-৮০টি মামলা।

২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে হেফাজত নেতাকর্মী ও আলেম নির্যাতন করে আওয়ামী সরকার। বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন স্থানে গুলি করে আলেমদের হত্যা করা হয়। আর এসব ঘটনায় উল্টো শতাধিক মামলা হয় আলেম-ওলাদের বিরুদ্ধে।

মাওলানা মুনির জানান, হাটহাজারীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে একটি অলিখিত চুক্তি হয় যে, কোনোপক্ষে কোনো মামলা হবে না। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এক মাস পর হাটহাজারীতে ১২-১৪টা মামলা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় শতাধিক আলেম ওলামাকে।

এ সময় গ্রেপ্তার এড়াতে হাটহাজারী মাদরাসায় প্রায় দুই মাস অবরুদ্ধ ছিলেন শীর্ষ আলেমরা। তাদের বের করে দিতে জুনায়েদ বাবুনগরীকে চাপ দিলেও তিনি অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে রমজান মাসে সেখানে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির প্রায় দুই হাজার ফোর্স ঘেরাও করে। এ সময় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুনগরীকে হেফাজতের কমিটি স্থগিত করতে বলেন।

একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ওই কমিটি স্থগিত করে সরকারি প্রেসক্রিপশনে নতুন অস্থায়ী কমিটি ঘোষণা করা হয়। দুই মাস পর স্থানীয় এমপি তাদের গ্রেপ্তার না করার আশ্বাসে স্বাভাবিক চলাফেরার পরামর্শ দেন। কিন্তু বাস্তবে সেদিন একটি কাজে শহরে বের হওয়ার পরই ডিবির হাতে আটক হন মাওলানা মুনির।

প্রতারণার ফাঁদ পেতে একজন জনপ্রতিনিধি ও আলেমকে গ্রেপ্তারের বর্ণনা দিয়ে নাছির উদ্দীন মুনির বলেন, সেদিন ছিল ২০২১ সালের ২০ জুন। তাকে গ্রেপ্তার করে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম কারাগারের কনডেম সেলে ঢোকানো হয় তাকে।

সেখানে মানবেতর জীবন কাটাতে হয়েছে। প্রায় ছয় মাস। ২৪ ঘন্টা লকআপে ছিলেন। সেই কষ্ট জানানোর ভাষা নেই। শুধু দিনে ২০ মিনিটের জন্য খোলা হলে বালতিতে ব্যবহারের পানি আনতেন আর গোসল করতেন। এক মিনিট দেরি হলেই কারারক্ষীরা চিল্লাতেন।

এ সময় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে ডিবি অফিসে নতুন করে নির্যাতন চলে এই আলেমের ওপর। ডিবিতে ছোট একটি রুমে ছিল না কোনো কম্বল-বালিশ। ফ্লোরেই কাটাতে হয়েছে চার দিন। দুই হাতে লকআপ অবস্থায় বসে ঘুমাতে হতো। রাত ২টায় এসে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ঘুমাতে চাইলে বলা হয়, আপনি ঘুমাতে পারবেন না। এভাবে সেখানে ১৬৪ ধারায় অনেক ধরনের মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়। তাদের লিখে দেওয়া বিষয়গুলো মুখস্থ করে আদালতে বলতে হয়।

মুনির বলেন, সেখানে ডিবির তৎকালীন ওসি কেশব ভট্টাচার্য্য তার পেছনে হাতকড়া পরা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি কষ্টের কারণে বসতে চাইলে ওসি বলেন, আসামি কখনো বসতে পারে? বেশি কথা বললে লটকায়ে ফেলব। আপনার নেতৃত্বেই হাটহাজারীর সব ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতন সইতে না পেরে এবং আবার রিমান্ডে নেওয়ার হুমকি দেওয়ায় তার লিখে দেওয়া বিষয়গুলো মুখস্থ করে পরদিন কোর্টে বলেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ নিলে তিনিও একই কথা বলেন।

এক মাসের মাথায় দ্বিতীয় দফায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয় মাওলানা মুনিরকে। পিবিআইয়ের সেই রিমান্ডেও একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ এবং স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। রিমান্ড শেষে আবার জেলে পাঠানো হয় তাকে। এভাবে ১৪টি মামলায় দীর্ঘ দুই বছর জেলে কাটিয়ে ২০২৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জামিনে মুক্তি পান তিনি।

মাওলানা মুনির বলেন, গ্রেপ্তারের পর প্রথম এক বছর হেফাজত নেতাকর্মীদের জামিন দেওয়া হয়নি। এক বছর পর অন্যদের জামিন দেওয়া শুরু হলেও তার জামিন আটকে রাখা হয়। আদালতকে বলে দেওয়া হয়েছিল, আমি সবচেয়ে বড় নেতা, সবকিছু আমার নির্দেশেই ঘটেছে। এ জন্য আমাকে জামিন দেওয়া যাবে না। তাই বারবার জামিন আবেদন করলেও তা নাকচ করে দেয় আদালত।

তিনি বলেন, জেলে সাধারণ কয়েদিদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে, তা হেফাজত নেতাকর্মী হিসেবে আমরা পেতাম না। প্রথম ছয় মাস পুরো সময় কনডেম সেলে বন্দি এবং পরের ছয় মাস আধা ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হতো। এক দিন কোর্টে নেওয়ার সময় আমাকে হ্যান্ডকাফ ছাড়াও ডান্ডাবেড়ি পরানোর জন্য চাপাচাপি করে পুলিশ। আমি প্রতিবাদ করেও ঠেকাতে পারিনি।

শুধু তাই নয়, জেলজীবনে চরম নির্যাতনের একপর্যায়ে মৃত্যুর শঙ্কা থেকে একজনের মাধ্যমে কিছু কাগজ জোগাড় করে ১৬ পৃষ্ঠায় একটা খাতা বানিয়ে তাতে বিস্তারিত অসিয়তনামা লিখি। সেটি রুমমেটকে আমার লাশের সঙ্গে বিছানার মধ্য দিয়ে দিতে বলি।

মাওলানা মুনিরের ১৪টি মামলার মধ্যে ১২টিই ছিল ২০২১ সালে হাটহাজারীতে জ্বালাও, পোড়াও ইত্যাদি অভিযোগের। আর দুটি ছিল ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ডের। দুই বছর জেলে ও রিমান্ডে কাটানো শেষে মুক্তির পরও মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে মুক্তির পর অনেক অনুরোধ করে এনএসআই হেডকোয়ার্টারে ডেকেছিলেন তাকে। সেখানে তার গ্রেপ্তার-জেলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সরকারের জন্য বিব্রতকর কোনো কাজ না করার অনুরোধ জানানো হয়। এ ছাড়া ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় তাকে প্রার্থী হওয়ার প্রলোভন দেওয়া হয়। তবে মানসিকভাবে একটু সুস্থ হওয়ার পর এসব প্রত্যাখ্যান করে এবং হুমকি উপেক্ষা করেই তিনি তার কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।

তিনি বলেন, গ্রেপ্তারের আগে শুধু প্রেশার ছাড়া আমার কোনো রোগ ছিল না। কিন্তু জেল থেকে বের হওয়ার পর হার্ট ও প্রোস্টেটে সমস্যা, কোলেস্টেরল বাড়াসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। এসবের চিকিৎসা চলছে। এ ছাড়া ১৪টি মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। মামলাগুলো এখন থাকলেও সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তা অব্যাহতির প্রক্রিয়া চলছে।

মাওলানা মুনির বলেন, গ্রেপ্তারের আগেই মাদরাসায় অবরুদ্ধ অবস্থায় হঠাৎ এক দিন দুই ঘন্টা সময় নিজের ভাড়া বাসা ছাড়তে বাধ্য করে পুলিশ। এতে মালপত্র বাড়িতে পাঠিয়ে দুই বছর এলোমেলো ও বিপন্ন অবস্থায় আমার পরিবার জীবনযাপন করেছে।

একইভাবে দুদিনের মধ্যে অফিসও খালি করতে বলা হয়। পরে বন্ধুরা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করে অর্ধেক জায়গায় অফিসটি রাখার ব্যবস্থা করে। তিনি বলেন, জেলে থাকা অবস্থায় আমার বড় মেয়েকে এইচএসসি পরীক্ষা দিতে দেয়নি। ছোট মেয়েটাও দাখিল পরীক্ষা দিতে পারেনি। আমার মুক্তির পর এক বছর লস দিয়ে তাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন বলে জানান মাওলানা মুনির। তিনি বলেন, এখন নতুন করে ব্যবসাগুলো শুরু করতে হচ্ছে। যারা এভাবে আলেম-ওলামাসহ সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, যারা দেশকে এই পরিস্থিতির মুখে এনেছে, সেই ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচার দাবি করেন তিনি।

কোরআন পড়তেও অনুমতি লাগত

রকীবুল হক

প্রকাশ : ২১ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ১৭

আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ১৮

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার তরুণ শিক্ষক মাওলানা এহসানুল হক। বিগত আওয়ামী সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে লেখালেখি ছাড়াও হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে নানা কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন তিনি। এ কারণে কোনো অপরাধ না করেও ফ্যাসিস্ট সরকারের টার্গেটে পড়েন তিনি।

তার এই তৎপরতা থামাতে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা ১০টি মামলা দিয়ে জেলে রাখা হয় ১১ মাস। কয়েক দফায় সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। কারাগারের লকারে অমানবিক আচরণ করা হয় তার সঙ্গে।

এ সময় স্বাভাবিক বন্দির কোনো সুবিধাতো দূরের কথা, সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়। জেলে কোরআন পড়তেও অনুমতি নেওয়া লাগত। হাইকোর্ট থেকে জামিন নিলেও একের পর এক জেলগেট থেকে আটক করে নতুন নতুন মামলা দেওয়া হয়। কারাজীবনে বাইরের সব সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এই সদস্যকে।

আওয়ামী আমলের সেই নির্যাতন প্রসঙ্গে মাসিক রাহমানী পয়গামের অন্যতম কর্ণধার মাওলানা এহসানুল হক বলেন, বিগত ১৬ বছরের আগেও ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী দেশের ইসলামপন্থি ও আলেমদের ওপর বিদ্বেষমূলক আচরণ করতে দেখেছি। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত জুলুম-নির্যাতন চালায়। ২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে আলেমদের ওপর সবচেয়ে বড় নির্যাতন শুরু করে আওয়ামী সরকার। একটি ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে আলেমদের ওপর অত্যাচার করে।

তিনি বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছিলেন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, আল্লামা নুর হোসাইন কাসেমী এবং মাওলানা মামুনুল হক। তাদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে আমাদের মতো তরুণ আলেমদের একটা ভূমিকা ছিল।

বিশেষ করে করোনার শেষদিকে লেখালেখির অনেক গুরুত্ব ছিল। আমি নিজেও লেখালেখি করতাম। তখনই আমি সরকারের টার্গেটে পড়ি। সেই সময় ঢাকা মহানগর হেফাজতের সহকারী প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম আমি। ২০২১ সালের মার্চে মোদিবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ হরতালের পরই সরকার আলেমদের ধরপাকড় শুরু করে।

শীর্ষ আলেমদের গ্রেপ্তারের বেশ কিছুদিন পর কিছুটা স্বাভাবিক পরিবেশে ১ আগস্ট মাওলানা এহসানুল হককে গ্রেপ্তার করে আওয়ামী সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি গ্রেপ্তারের কোনো আশঙ্কায় ছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ লালবাগে তার বাসায় আশপাশে বিপুলসংখ্যক সাদাপোশাকের লোক উপস্থিত হয়।

সেটা অনুমান করে পাশের ফ্ল্যাটে চলে যান তিনি। তবে পরিস্থিতি দেখে গ্রেপ্তার নিশ্চিত জেনে নিজেই বের হয়ে আসেন। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। তারপরও সিআইডি থেকে আসার লোকজন তাকে নিয়ে সোজা চলে যান মালিবাগের সংস্থাটির কার্যালয়ে।

মাওলানা এহসানুল হক বলেন, সিআইডি কার্যালয়ে নিয়ে প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি পরিত্যক্ত ভবনের করিডরে তাকে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, সিআইডি কার্যালয়ে বড় বড় ভবন থাকলেও বন্দিদের রাখার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা খুবই দুঃখজনক। এর চেয়ে নোংরা আর কিছু হতে পারে না। সেখানে একটি করিডরের দুই পাশে ছিল নোংরা-পরিত্যক্ত ছোট ছোট সেল। সেখানে মানুষ ঢোকার মতো কোনো পরিবেশ ছিল না।

একটা ডাস্টবিনের মতো। মাঝখানের করিডরটা চার ফিট আকারের। সেখানেই আরও কয়েকজন বন্দি ছিল। রুমে কেউ থাকে না, করিডরেই রাখা হয়। তার এক পাশে ডাস্টবিনের মতো একটি বাথরুম ছিল। সেখানেই তাকে দুদিন থাকতে হয়। লম্বা হয়ে শোয়া যায় না। জড়ো হয়ে মাথায় পানির বোতল বা অন্যকিছু দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল সবাই। সেখানে দিন-রাত কিছুই বোঝা যেত না। খাবার দেওয়ার সময় বুঝতাম দিন না রাত। এই পরিবেশেই একজন ২১ দিন পর্যন্ত ছিল বলে জানান।

তিনি বলেন, সিআইডি কার্যালয়ে এক দিন কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করা হয় তাকে। ডিআইজি, এসপিসহ বড় অফিসারদের সামনে বসিয়ে হেফাজতের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলানোর চেষ্টা করেন তারা। এ সময় তুমি কেন হেফাজত করো, তুমি কেন এত লেখালেখি করো ইত্যাদি বলে চরম গালাগালসহ মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। তাদের কথা শুনে মনে হয়েছে, হেফাজত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম।

ঢাকার লালবাগ থেকে আটক করলেও এই আলেমের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায়। তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবেই আমাকে কেরানীগঞ্জ

কারাগারে নেওয়ার কথা। কিন্তু সিআইডি কার্যালয় থেকে জানানো হয়, আপনার নামে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা দেওয়া হবে, নারায়ণগঞ্জ থেকে পুলিশ আসবে নিতে।

তার নামে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ভাঙচুরসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দুটি মামলা দেওয়া হয়। তবে তাকে ওই থানায় না নিয়ে নেওয়া হয়েছিল নারায়ণগঞ্জ সিআইডি অফিসে। সেখান থেকেই মামলার পর নেওয়া হয় কোর্ট গারদে। সেখানকার অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে যে আসামিদের রাখা হয়েছিল, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল আমার ওপর হামলে পড়বে। ভেতরে ঢোকার পর কিছুটা স্বাভাবিক হই। এই যুগেও এ রকম গারদ কীভাবে থাকে? রাজনৈতিক নেতারাও তো জেলে গারদে যান, তারাও বিষয়গুলো দেখেন, কিন্তু কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নাÑ এটা দুঃখজনক। সারাদেশের গারদেই একই অবস্থা।

গারদ থেকেই নারায়ণগঞ্জ কারাগারে নেওয়া হয় মাওলানা এহসানুল হককে। সেখানে ঢোকার পর জানতে পারেন যে তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রথমে কোয়ারেন্টাইন হিসেবে ব্যবহৃত ‘রজনী’ নামের কক্ষে রাখা হয় তাকে। যে রুমে ৩০-৩৫ জন থাকতে পারেন, সেখানে ছিলেন ৭০-৮০ জন। প্রচণ্ড গাদাগাদি করে তাকে সেখানে থাকতে হয়। এই পরিবেশেই ১৪ দিন থাকতে হয় তাকে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা সম্পূর্ণ লকআপে রাখা হয়। দুটি বাথরুমের একটি ছিল নষ্ট।

১৪ দিন পর তাকে দুদিনের রিমান্ডে নেয় সিআইডি। সেই এসপি হারুনের মুখোমুখি করা হয় তাকে। তিনি তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করেন, সিদ্ধিরগঞ্জে যে সংঘাত ঘটেছে, তা হেফাজতের নির্দেশে করা হয়েছে। কী নির্দেশনা ছিল তা জানতে চান তিনি। একপর্যায়ে সাদা কাগজ দিয়ে বিষয়গুলো লিখতে বলা হয়। এ সময় তিনি তার ইচ্ছামতো লেখেন, তিনি জীবনে সিদ্ধিরগঞ্জ আসেননি, এসব ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নেই। এতে তারা আবার তার সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করেন। এভাবে দুদিন রিমান্ডের পর আবার কারাগারে নেওয়া হয়। আবার ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়।

তিনি বলেন, হেফাজত নেতাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী তার যে ‘কেস কার্ড’ ছিল সেখানে এক কর্নারে লাল কালি দিয়ে সন্ত্রাস লেখা থাকত। এতে তারা স্বাভাবিক কোনো সুবিধা পেতেন না। এর মধ্যে টাকার বিনিময়ে ফোন করা, পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, লকআপ খোলা রাখার সুযোগ ছিল না তাদের। সব সময় লকআপে রাখা হতো।

মাওলানা এহসানুল হক বলেন, কারাগারে এমন অবস্থায় থাকত, রাতে ঘুমানো শেষে সকালে বালিশ নাড়া দিলে প্রচুর ছারপোকা বের হতো। একটা বাথরুমে দিনে দুই ঘণ্টার জন্য পানি আসত। সব কাজ দ্রুত শেষ করতে হতো। চারজন করে কথা বলতে দেখলেও তারা খারাপ ব্যবহার করত। সাড়ে ৩ মাস বাইরের সব খবর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

হেফাজতের আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী মারা গেলে তা সেলের পেছন দিকের একটি জানালা দিয়ে এক নারীর মাধ্যমে জানতে পারেন। ইউনুস নামের একজন তার মা মারা

যাওয়ার দেড় মাস পর সংবাদ পান। স্বাভাবিকভাবে বন্দিরা মা-বাবা মৃত্যুর পর প্যারোলে মুক্তির সুযোগ পেলেও হেফাজতের নেতারা সংবাদও পাননি।

কারা নির্যাতনের একপর্যায়ে দুই মাসের মাথায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলে মুক্তির জন্য দিন গুনছিলেন তিনি। প্রক্রিয়া শেষে বের হওয়ার সময় জেলগেট থেকে আবার তাকে আটক করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তখন নতুন করে আরও চারটি মামলা দেওয়া হয়। সেই মামলাগুলোর জামিন নিয়ে মুক্তির পর আবারও একইভবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এভাবে তিন দফায় জেলগেট থেকে ফেরত দেওয়া হয় তাকে। জামিন আটকাতে আদালতেও কাগজ আটকে রাখা হয় বহু দিন। তার মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টিতে। এসব মামলায় সিআইডিতে চার দিন, ডিবিতে দুদিন এবং পিবিআইতে এক দিনসহ সাত দিনের রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয় এই আলেমের ওপর।

এভাবে ১১ মাস দুদিন কারা নির্যাতনের পর অবশেষে ২০২২ সালের ২ জুলাই জামিনে মুক্তি পান তিনি। তবে এসব মামলা চালাতে তার বিপুল অঙ্কের টাকা খরচে পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুক্তির পরও গত ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত তার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল না। মুক্তির কিছুদিনের মাথায় তাকে এনএসআই কার্যালয়ে ডেকে নানা বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এ সময় মাসে অন্তত ১০ দিনই আদালতে কাটাতে হয় মামলার হাজিরা দিতে।

৫ আগস্টের পরও হাজিরা দিতে হয়েছে তাকে। বর্তমানে হাজিরা শিথিল হয়েছে, মামলাগুলো থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে ক্ষুব্ধ হয় সরকার

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২২ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ২৯

দাওয়াতি কাজ শেষে সৈয়দপুর থেকে একটি ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছান মুফতি যুবায়ের আহমদ। বিমান থেকে নামতেই ঘোষণা দেওয়া হয় নিচে দেখা করতে। এরই মধ্যে সেখানে হাজির হয় পুলিশ। ছবি দেখিয়ে পরিচয় নিশ্চিত হয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দর থানায়। কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির হন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের একদল সদস্য। একটি গাড়িতে তুলে তাকে নেওয়া হয় সিটিটিসি কার্যালয়ে।

সেখানে তিন দিন গুম করে রাখা হয় তাকে। পরিবারের খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে নেওয়া হয় তিন দিনের রিমান্ডে। কোনো অপরাধের প্রমাণ না মিললেও তাকে জেলে কাটাতে হয় ছয় মাস। এ সময় তার শিশু সন্তান হাতে এক টাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত বাবার মুক্তির জন্য। পুলিশ দেখলেই বাবাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আকুতি জানাত সে।

বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে এভাবেই নির্যাতনের শিকার হন ঢাকার মুগদায় অবস্থিত ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মুফতি যুবায়ের আহমদ। তাকে জঙ্গি সংগঠন আনসার আল-ইসলামের সঙ্গে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হয়। শুধু নিজে নন, তার প্রতিষ্ঠানের আরও বেশ কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক একইভাবে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানান তিনি।

আমার দেশকে মুফতি যুবায়ের আহমদ বলেন, আমি মূলত অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করি। দেশের সাংবিধানিক অধিকারের পাশাপাশি ইসলামের নির্দেশনা এবং শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ীই এ কাজ করি। বিশেষ করে যেসব এলাকায় মুসলমান

থেকে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছেন, তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে। এই ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের দাওয়াতি কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এই কাজ করতে গিয়ে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে নানা রকম বাধাবিঘ্ন আসে। জঙ্গি হিসেবে জেলে পাঠানোরও হুমকি দেওয়া হতো। হিন্দুরাই এই ফোন বেশি দিত বলে আমি মনে করি।

তিনি আরও বলেন, দাওয়াতে তাবলিগের মতো বিভিন্ন এলাকায় আমরা যাই। দেশের বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে আমাদের তিনটি জামাত যায় দিনাজপুরের তিনটি মসজিদে। আমি ১৭ তারিখে সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য এক দিন আগে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী থানার আনন্দবাজার এলাকার একটি গ্রামে যাই। মুসলমানদের ওই গ্রামে চারটি গির্জা হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি গির্জার প্রধান আজগর আলী নামে এক ব্যক্তি মুসলমান থেকে খ্রিষ্টান হয়েছেন। একসময় তিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন। এখন পর্যন্ত তিনি খ্রিষ্টানই আছেন।

যুবায়ের আহমদ বলেন, ওই ব্যক্তি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারও করেন। তবে আমাদের দাওয়াতের প্রভাবে দুটি গির্জা বন্ধ হয়েছে, কয়েকজন মুসলমান হিসেবে ফিরেও এসেছেন। ওই খ্রিষ্টান প্রচারককে দাওয়াত দিতেই সেখানে যাই আমরা। সেদিন লালমনিরহাট হয়ে রংপুর এসে জানতে পারি রাতেই আমাদের তিনটি জামাত থেকে ৪২ জনকে ধরে নিয়ে আসেন সিটিটিসির সদস্যরা। স্থানীয়ভাবে তিনটি মামলা দিয়ে কয়েকজনকে সেখানে রাখেন আর সাতজনকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনার কারণে আমি আর সেখানে না গিয়ে আগে থেকেই কাটা টিকিটে সৈয়দপুর থেকে বিমানে ঢাকায় আসি।

মুফতি যুবায়ের বলেন, মাগরিবের আগে বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই ভেতর থেকে ঘোষণা দিয়ে নিচে পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। বিমানের গেটে আসতেই সেখানে অপেক্ষমাণ পুলিশ সদস্যরা আমার ছবি দেখিয়ে পরিচয় নিশ্চিত হন। তারা আমাকে ধরে নিয়ে যান বিমানবন্দর থানায়। এ সময় তার পকেটে থাকা মোবাইল নিয়ে নেন তারা। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিতে পারেনÑ এ ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে যান তিনি। বিমানবন্দর থানায় ওসির সঙ্গে কথা বললে তিনি আটকের কোনো কারণ জানাতে পারেননি। বললেনÑ ওপরের নির্দেশ। ওই থানায় মাগরিবের নামাজ পড়ার পর আমি দেখতে পাই, সিটিটিসির একটি গাড়ি সেখানে আসে। এ সময় বিমানবন্দর থানা-পুলিশ আমাকে এন্ট্রি করতে চাইলেও সিটিটিসির লোকরা তাতে বাধা দেন। তারা তাদের গাড়িতে তুলে হ্যান্ডকাফ পরান।

মুফতি যুবায়ের জানান, ওপরের নির্দেশের কথা বলে তাকে নেওয়া হয় সিটিটিসি কার্যালয়ে। সেখানে প্রথম দিনে একা একটি রুমে রাখা হয়। রাতের বেলা সেখানে নামাজের সুযোগ চাইলেও তা দেওয়া হয়নি। যে রুমে রাখা হয়েছিল, তা পাক-পবিত্র বলেও মনে হয়নি। তারপরও সেখানে নামাজ পড়েন তিনি।

তিনি বলেন, সেখানে দিনাজপুর থেকে আটক করে আনা সেই দাওয়াতি কর্মীদেরও রাখা হয়েছিল। তাদের দুদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দুটি থানায় মামলা দেওয়া হয়। তবে মুফতি যুবায়েরকে তিন দিন পর্যন্ত গুম করে রাখা হয়েছিল। কোনো গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। এ সময় তাকে বারবার ডেকে নানা হুমকি-ধমকি, গালাগাল করা হয়। শফিক নামের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'মাদার তেরেসা যদি জান্নাতে না যায়, তাহলে সেই জান্নাত আমার দরকার নেই'। তাকে বারবার প্রেশার দিচ্ছিল যে, কেন আপনি অমুসলিমদের দাওয়াত দেন, আনসার আল ইসলামের সঙ্গে জড়িত কি না ইত্যাদি।

এদিকে তিন দিন গুমের কারণে ২০ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে তার পরিবার। এ বিষয়ে তার স্ত্রী তুরাগ থানা ও বিমানবন্দর থানায় জিডি করতে গেলেও তা নেয়নি পুলিশ। এ ছাড়া ডিবি কার্যালয়ে গিয়েও তার কোনো সন্ধান পাননি তারা। এই সংবাদ সম্মেলনের দিনই মুফতি যুবায়েরকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক বছর আগে গাবতলীতে জঙ্গি কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট একটি বৈঠকের নামে সাজানো ঘটনায় জড়ানো হয় তাকে। দারুস সালাম থানায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। একই মামলায় তার প্রতিষ্ঠানের আরও তিনজনকে জড়ানো হয়। বাকি চারজনের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় খিলগাঁও থানায় মামলা। মুফতি যুবায়েরকে আনসার আল ইসলামের লিডার, প্রচারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ এর সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতাই ছিল না। সেই মামলায় তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এ সময় তাকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নির্যাতন করা হয়। ভয়ভীতিও দেখান ও খারাপ আচরণ করেন তারা। অথচ তাদের কোনো কাজ গোপন নয়, সবকিছু প্রকাশ্যে হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, কোনো অপরাধ ছাড়াই গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে তারা বলেনÑ ওপরের নির্দেশ। আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি আমার অপরাধ কী? এটাই আমার দুঃখের বিষয়। বিনা অপরাধে ছয় মাস জেলে কাটাতে হয়েছে আমাকে।

মুফতি যুবায়ের আহমদ বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নই। দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করি। একসময় হেফাজতে ইসলামের থানাপর্যায়ের সহসভাপতি ছিলাম। এখনো হেফাজতের কর্মকাণ্ডে সমর্থন আছে, তবে কোনো পদে নেই।

তিনি বলেন, তিন দিনের রিমান্ড শেষে তাকে পাঠানো হয় কাশিমপুর কারাগারের শতাব্দী ভবনে। তাকে আদালতে আনা-নেওয়ার জন্য হিন্দু পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হতো। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাকেও ইসলামের দাওয়াত দিতেন তিনি।

জেলে থাকা অবস্থায় তার পরিবার চরম অসহায় অবস্থায় ছিল। পাঁচ বছরের ছোট ছেলে হাতে এক টাকা নিয়ে রাস্তায় ঘুরত আর বলত, এই টাকা পুলিশকে দিয়ে তার বাবাকে ছাড়িয়ে আনবে। পুলিশ দেখলেই বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলত সে। এই কথা পরে শুনে খুব কষ্ট পান তিনি। তবে তার মায়ের সান্ত্বনায় শক্ত থাকতেন তিনি। তাকে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে ধৈর্যধারণের জন্য পরামর্শ দিতেন তার মা। এ সময়

অর্থনৈতিকভাবে বড় ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলে থাকায় আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। জামিন নিতে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হয়ে গেছে।

তিনি জানান, জামিনের জন্য বারবার আবেদন করলেও তা নাকচ করে দেওয়া হতো। বেশ কয়েকবার ঘোরানোর পর জামিন দেওয়া হয়। জামিনে মুক্তির পরও সিটিটিসিসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তার খোঁজখবর নেওয়া হতো। তার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইত। এ সময় বেশ আতঙ্ক নিয়েই দাওয়াতি কাজ চালান তিনি। কোথাও প্রোগ্রামে গেলে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি থাকত। বিভিন্ন সময় তার প্রতিষ্ঠানেও পুলিশ ও গোয়েন্দাদের আনাগোনা থাকত বলেও তিনি জানান।

তিনি জানান, বিগত সরকারের সময় আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থিদের জঙ্গি বানানোর তৎপরতায় ব্যস্ত থাকত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফাঁদ পেতে জঙ্গি নাটকে জড়াত তারা। জেলে থাকা অবস্থায় এ ধরনের অনেক ভুক্তভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তার। তাদের অভিযোগÑ প্রথমে ফেসবুকে বিভিন্ন নামে কথাবার্তা চালাতে থাকে। একপর্যায়ে চাকরির প্রলোভন দেখানো হয়। দেখা করার কথা বলেই আটক করে জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেকে জঙ্গি কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই জানে না অথচ তাদের নাটক সাজিয়ে জঙ্গি বানানো হয়েছে।

১৩ মিথ্যা মামলায় ২৯ দিন রিমান্ড

রকীবুল হক

প্রকাশ : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৫৭

আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, ১১: ৪১

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি ধর্মীয় ইস্যুতে সোচ্চার থাকতেন মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়জী। একইভাবে দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে লেখালেখিও করতেন তিনি। এতেই পতিত আওয়ামী সরকার ও ভারতীয় এজেন্টদের টার্গেটে পড়েন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের এই সহকারী মহাসচিব।

তার চলাফেরা ও কাজকর্মে নজরদারি করতে থাকে গোয়েন্দারা। একপর্যায়ে তার ওপর সরাসরি নির্যাতন শুরু হয়। তাকে ধরতে বাড়িতে, অফিসে চলে পুলিশের তল্লাশি ও লুটপাট। পরিবারকে করা হয় হেনস্তা।

একপর্যায়ে তাকে আটক করে একে একে ১৩টি বানোয়াট মামলা দেওয়া হয়। দফায় দফায় ২৯ দিন রিমান্ডে নিয়ে চালানো হয় ব্যাপক নির্যাতন। এতে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ডিবির ওসি কেশব কুমার। ১৪ মাস জেলে থাকা অবস্থায় তাকে পরিবার থেকে শুধু যোগাযোগ বিচ্ছিন্নই রাখা হয়নি, বরং পরিবারকেও নানাভাবে হেনস্তা করা হয়।

ছেলের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে তিনবার হাসপাতালে ভর্তি হন তার মা। তার চাচার মৃত্যুতেও প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়নি। জেল থেকে জামিনে মুক্তির পরও স্বস্তিতে থাকতে পারেননি এই আলেম। নানা সতর্কতা আর গোয়েন্দা ও পুলিশের হয়রানি অব্যাহত ছিল তার ওপর।

নোমান ফয়জী জানান, ২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ২৬ মার্চ হাটহাজারী মাদরাসায় যে সংঘাতের ঘটনা ঘটে, সেদিন তিন কিলোমিটার দূরে নিজের মাদরাসায় একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই ফোনে খবর পান যে ওসি রফিকের নির্দেশে চারজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরে বেশ কয়েকটি মামলা করে পুলিশ। তাতে হেফাজত নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়। শুরু হয় ধরপাকড়।

গ্রেপ্তার অভিযানের অংশ হিসেবে ২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল ৭০টি গাড়ি নিয়ে জাকারিয়া নোমান ফয়জীর বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি ও সবকিছু তছনছ করে পুলিশ। তার অফিসেও লুটপাট চালানো হয়। এ সময় তাকে না পেয়ে গাড়িচালক মামুনকে ধরে নিয়ে যায়।

একে একে আটটি মামলা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়ার নানাশ্বশুরের বাড়িতে অবস্থান করেন। কিন্তু সেই বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ। ৫ মে ওই বাড়ির আশপাশে আড়াই কিলোমিটার এলাকা কর্ডন করে গ্রেপ্তার করা হয় নোমান ফয়জীকে। সেখানে পুলিশ প্রায় ৬৫টি গাড়ি নিয়ে যায় তাকে ধরতে।

তিনি বলেন, আসরের সময় গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় ডিবি অফিসে। একে একে ১৩টি বানোয়াট মামলা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে। এ সময় মিডিয়ায় নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়। তিনি তখন হেফাজতের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। ডিবির ওসি কেশব কুমারের নেতৃত্বে এই গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়। ডিবিতেও তার নেতৃত্বে চলে নানা ধরনের টর্চার ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল।

এত আক্রোশের কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতেন। তার একটি বইয়ের নাম ছিল ‘ভারতীয় আগ্রাসনের একাল-সেকাল’। আরেকটি আর্টিকেল ছিল ৫০ বছরে ভারত কী দিয়েছে, কী নিয়েছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে শিরোনামে আরেকটি বই ছিল। এ জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মূল বিষয় ছিল ভারতবিরোধিতা কেন?

ডিবিতে নির্যাতন প্রসঙ্গে মাওলানা নোমান ফয়জী বলেন, সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। চরম খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেশব কুমার চক্রবর্তী, এসআই আবদুল হান্নান ও আরেকজন এসআই মিলে চরম অশালীন আচরণ করে তার সঙ্গে।

ডিবিতে এক দিন রাখার পর আদালতে ওঠানো হয় তাকে। পুলিশের ওপর গুলি চালানোর মামলা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আদালত তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দেয়। তিনি বলেন, রিমান্ডে নামাজ ছাড়া কোনো সময় হ্যান্ডকাফ খুলে দেওয়া হয়নি।

হ্যান্ডকাফের কারণে পিঠটাও চুলকানো যেত না। এমনকি নামাজ পড়তে দাঁড়ালেও হিন্দু অফিসাররা নানাভাবে ব্যাঘাত ঘটাতেন। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে নোমান ফয়জী বলেন, আমি কেন ভারতবিদ্বেষী, আমি কেন আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলি, আমি কেন লেখালেখি করি। এ সময় তারা অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে তারা বলেন, ‘লটকায়ে পিটালে ও গরম ডিম ঢোকালে’ সব বলে দেবে। এ সময় ক্রসফায়ারে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হতো রাতের বেলায়, ডিবি থেকে এ সময় পাশের পাঁচলাইশ থানায় নেওয়া হতো। সেখানে সন্ত্রাসী, মাদকসেবকদের সঙ্গে একটি গারদে রাখা হয়। নামাজের জন্য জায়নামাজ চাইলেও তা দেয়নি। বাধ্য হয়ে স্যাঁতসেতে স্থানে নামাজ পড়তেন তিনি। এ সময় আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলানোর চেষ্টা করে তারা।

তার পরিবারের ওপরও নির্যাতন চালানো হয়। তার দুই ভাইকে হাটহাজারী থানায় ডেকে নানাভাবে হেনস্তা করে। তার অফিসে গিয়ে তল্লাশি চালায়। এ সময় তার দুটি মোবাইল নিয়ে নেয়। সেই মোবাইলের নম্বর দেখে দেখে রিমান্ডে নানা প্রশ্ন করে। একপর্যায়ে তার ফেসবুক থেকে এক হাজার পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে নিয়ে এসে পড়ে শোনায়। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

নোমান ফয়জী বলেন, পাঁচ দিনের রিমান্ডের শেষপর্যায়ে একটি স্বীকারোক্তি নিতে চাইলেও আমি তা দিইনি। পরে ম্যাজিস্ট্রেট তার মতো করে জবানবন্দি লেখেন। রিমান্ড শেষে আরেকটি বানোয়াট মামলা দিয়ে কোর্টে তোলা হয় আমাকে। সেই মামলায় আবার তিন দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়। এ সময়ও একইভাবে নানা অশ্লীল গালাগাল, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

পরে বুঝতে পারি যে, আমাকে বড় একটি টার্গেট করে এ ধরনের নির্যাতন চালায়। মিডিয়ায় নানা বানোয়াট খবর প্রকাশ করায়। এমনকি একজন নারীকে প্রেশার দিয়ে একটি মামলা করানো হয়। যদিও সেটি পরে প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এভাবে একের পর এক মামলায় ২৯ দিন রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়।

তিনি বলেন, জেলখানায় ১৪ মাস ৯ দিন থাকাকালে আমার চিন্তায় আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আমার ছোট ছেলেটাকে হিফজখানা থেকে তুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। একটা লাইব্রেরি ছিল, সেটা চার মাস খুলতে দেওয়া হয়নি। পারিবারিক মাদরাসাটি নিয়েও নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে পুলিশ।

মাওলানা নোমান ফয়জী বলেন, তার বিরুদ্ধে দুদুকের মামলা দেওয়া হয়েছে। এনবিআরের মামলা দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। নানা ধরনের হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছে। খুঁজে কিছু না পেয়ে টাকা কোথায় রেখেছি জিজ্ঞাসা করত। বলত পাকিস্তানে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। সৌদি আরবে পাঠিয়েছি কি না।

জেলখানায় নেওয়ার পর তার কেস কার্ডে লাল দাগ দেওয়া ছিল। বলা হয়েছিলÑ হেফাজত নেতা হিসেবে তিনি নামাজ পড়াতে পারবেন না। মোবাইলে কথা বলাসহ সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৪ মাস ৯ দিন জেলজীবনে মোবাইলে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এক দিন লুকিয়ে কথা বলতে গেলে গোয়েন্দারা ধরে ফেলে টাকা আদায় করে। আদালতেও কারো সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবে কারা কর্তৃপক্ষের নিষেধ থাকলেও ওয়ার্ডবাসীর চাওয়া অনুযায়ী নামাজ পড়াতেন তিনি।

২০২২ সালের ৫ মে নোমান ফয়জীর চাচা মারা যান। তার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য নিয়মানুযায়ী প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু মিথ্যা অজুহাতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, ছয় মাসের মাথায় সব মামলায় হাইকোর্টে জামিন হয়েছিল। আপিলে একে একে ১০টি মামলায় জামিনের আদেশ স্টে করে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে সব মামলায় জামিন নিয়ে

মুক্তি পান তিনি। এসব মামলা চালাতে প্রায় ৩৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান এই আলেম। তার নামে মোবাইল চুরির মামলা দেওয়ার হুমকি দেয় পুলিশ।

মুক্তির পরও নাজেহাল করা হয় এই আলেমকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বারবার ফোন দিয়ে যোগাযোগ করত পুলিশ ও গোয়েন্দারা। কোন কোন কথা বলা যাবে না, লেখালেখি করা যাবে না ইত্যাদি বিষয় সতর্ক করা হয় তাকে। এনএসআই হেড অফিসে ডেকেও তাকে সতর্ক করা হয়েছিল। মামলায় হাজিরা দিতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। তার পাসপোর্ট নবায়নেও বাধা দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, রিমান্ডে না দেওয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করত পুলিশ। প্রথম মামলার পর আর মামলা না দেওয়ার জন্য তার কাছে ২০ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন হাটহাজারী থানার ওসি রফিক।

মাওলানা জাকারিয়া বলেন, সেই ওসি কেশব কুমার এখন কোথায় আছেনি, তা জানা নেই। তার বিরুদ্ধে হাটহাজারীর চার হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। যারা এসব জুলুম-নির্যাতনে জড়িত ছিল, সবার নামে আরও মামলা হবে।

নির্যাতনে বেহুঁশ, তারপরও পেটায় ওসি রফিক

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৪ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ১৩

পতিত আওয়ামী সরকারের সময়ে পুলিশি নির্যাতনের ভয়াবহ রূপ দেখেছেন হাটহাজারী মাদরাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা আসাদুল্লাহ। মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য গ্রেপ্তারের পর থেকেই তার ওপর শুরু হয় নির্যাতন। রিমান্ডে নিয়ে চালানো হয় বর্বর শারীরিক নিপীড়ন। হ্যান্ডকাফ আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে বেদম মারধরে যখন নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল, তখনো তার ওপর নতুন করে শুরু হয় পিটুনি। প্লাস দিয়ে তার নখ তুলে ফেলে সেখানে সুঁই ঢোকানো হয়। কারেন্টের শক দেওয়া হয় পায়ে। ১৩টি মামলায় কয়েক দফায় ১১ দিন রিমান্ড ছাড়াও ১৬ মাস কারাজীবনও ছিল অনেক কষ্টকর।

হাটহাজারী থানার সাবেক ওসি রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে চলে এসব নির্যাতন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুতে ওই এলাকায় সোচ্চার থাকায় তরুণ আলেম মাওলানা আসাদুল্লাহর ওপর নির্যাতনের মাত্রাটা বেশি ছিল বলে মনে করেন তিনি। শুধু নিজের ওপর নয়, তার দুই ভাইকেও গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। তার বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের পাশাপাশি বাকি দুই ভাইকেও বাড়িছাড়া করা হয়। সন্তানদের ওপর এই অত্যাচারে বৃদ্ধ বাবা স্ট্রোক করে প্যারালাইজড হয়ে আছেন। এখনো শয্যাশায়ী তার মা। সার্বিকভাবে অনেকটা নিঃস্ব ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তার পরিবার।

মাওলানা আসাদুল্লাহ বলেন, হেফাজতে ইসলাম এবং সংগঠনটির মরহুম আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর গতিকে থামিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল আওয়ামী সরকারের। এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ একটি মিছিলে সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে গুলি চালিয়ে

হাটহাজারী মাদরাসার চার ছাত্রকে শহীদ করে পুলিশ। সরকারদলীয় লোকরা ব্যাপক তাণ্ডবও চালান। তারা থানা ভাঙচুর, ডাকবাংলো ও ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন স্থাপনায় জ্বালাও-পোড়াও করেন। এ ঘটনায় হেফাজতকে টার্গেট করে তারা অন্তত ১৩টি মামলা করেন।

এরপর থেকেই গ্রেপ্তার শুরু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকের সঙ্গে হাটহাজারী মাদরাসায় আশ্রয় নেন মাওলানা আসাদুল্লাহ। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালায় পুলিশ। তারা জানতে পারে, মাওলানা আসাদুল্লাহসহ তার ঘনিষ্ঠজনরা জুনায়েদ বাবুনগরীদের সাহস জুগিয়ে আসছেন। এ জন্য তার ওপর রোষটা একটু বেশি ছিল।

মাওলানা আসাদুল্লাহ বলেন, আল্লামা শফীর ছেলে আনাস মাদানী, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মঈনুদ্দিন রুহী ও আবু রেজা নদভী গ্রুপ যখন হেফাজতে ইসলাম এবং কওমি অঙ্গনকে আওয়ামী সরকারের দালাল বানানোর তৎপরতা চালাচ্ছিলেন, তার বিরুদ্ধে হাটহাজারীতে সোচ্চার ছিলাম আমরা। এ জন্য আমার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল তারা। তিনি বলেন, প্রথমে আমাকে না পেয়ে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার, বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর এমনকি পরিবারের নারীদেরও মারধর করে পুলিশ। আমার মেজো ভাইকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারে হাটহাজারী থানার তৎকালীন সেকেন্ড অফিসার রাজিব শর্মা ও এসআই মুকিব আল হাসান। তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে আমার দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। পরে থানায় নিয়ে গিয়ে তার ওপর ব্যাপক অত্যাচার এবং প্লাস দিয়ে টেনে টেনে হাত-পায়ের নখ তুলে ফেলা হয়। পরে চারটি মামলা দিয়ে আদালতে চালান দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, এর আগের দিন তার ছোট ভাই আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়। তার হাত-পায়ের নখ তুলে ফেলা হয়। একে একে ১৪টি মামলা দিয়ে তাকে দুবছর জেলের কনডেম সেলে রাখা হয়।

হাটহাজারী মাদরাসার সাবেক এই ছাত্র বলেন, এর আগেও ২০২০ সালের দিকে ডিজিএফআই, এনএসআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। দিনের পর দিন তাদের অফিসে নিয়ে বসিয়ে রাখা হতো। হুমকি-ধমকিসহ বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি করা হতো।

গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিন মাদরাসায় অবরুদ্ধ থাকার পর ২০২১ সালে কোরবানির ঈদের দিন কিছুটা নিরাপদ মনে করে পরিবারের সদস্য ও চার মাসের শিশুসন্তানকে দেখতে বাড়িতে যান মাওলানা আসাদুল্লাহ। ঈদের নামাজ পড়ে সকাল ৯টার দিকে বাড়িতে পৌঁছাতেই সাদা পোশাকে র‍্যাব সদস্যরা ওই এলাকা ঘিরে ফেলেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হ্যান্ডকাফ ও কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে র‍্যাব-৭-এর অফিসে নেওয়া হয় তাকে। পথে তার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ ও গালাগাল করা হয়। র‍্যাব অফিসে চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে অনেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিকালের দিকে হেফাজতসংশ্লিষ্ট মিথ্যা চারটি মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে মামলা বেড়ে

১৩টিতে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, আমাকে নির্যাতন করাতে ওসি রফিককে টাকাপয়সা দেওয়া হয়েছে আনাস মাদানী গ্রুপের পক্ষ থেকে।

কারাগারে থাকার এক মাসের মাথায় পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। সেই রিমান্ডে নিয়ে আসাদুল্লাহকে ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। তাকে রিমান্ডে নেওয়ার বিষয়টি কেউ যাতে জানতে না পারেন, সেই নির্দেশনা দিয়েছিলেন ওসি রফিক। রাত আড়াইটার দিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। তিনি বলেন, ওসি রফিকের রুমে গিয়ে দেখি সেখানে আরো কয়েকজন অফিসার বসে আছেন। তাকে হাতে হ্যান্ডকাফ ও পায়ে বেড়ির মতো কিছু পরানো হয়। চোখ ছিল বাঁধা। একটি চেয়ারে বসিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হয়। সেখানে দেখতে পান যে লোহার রড, স্ট্যাম্প, ক্রিকেট ব্যাট, প্লাস, রশি ও কারেন্টের শক দেওয়ার মতো কিছু যন্ত্র রয়েছে।

প্রথমে ওসি রফিক প্রশ্ন করেন, হিন্দুরা জান্নাতে যাবে না- এ কথা তোদের কে বলেছে? উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় চারদিক থেকে তাকে বেদম মারধর করা হয়। স্ট্যাম্প ও রড দিয়ে হাঁটুতে জোরে জোরে বাড়ি দেন তারা। পেছন দিক থেকে হ্যান্ডকাফ বাধা অবস্থায় তাতে রডের চাপ দিয়ে হাড় ভেঙে ফেলার মতো অবস্থা করে। লাথি, কিল-ঘুসি আর অকথ্য ভাষায় গালাগাল তো আছেই। এ সময় শীর্ষ আলেমদের নামেও গালাগাল করা হয়।

রিমান্ডে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে, জুনায়েদ বাবুনগরী ১৯৭১ সালে হালদা সেতুর কাছে দু-তিন শ মানুষ মেরে পানিতে ফেলে দিয়েছেন। ৭১ সালে তার জন্মও হয়নিÑ এমন কথা বললে নতুন বিষয়ে বলা হয়, বাবুনগরী পাকিস্তান থেকে ৪০০ কোটি টাকা খেয়ে তোদের জঙ্গি কার্যক্রমে রাজপথে নামিয়েছেন। হাটহাজারীর সব ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত বলেও অভিযোগ করা হয়। এসব জিজ্ঞাসাবাদের সময় মারধর করে পুলিশ। একপর্যায়ে প্রচণ্ড পিপাসায় পানি চাইলে মুখে পেশাব করে দেওয়ার কথা বলেন। পায়ে কারেন্টের শক দিয়ে এমন অবস্থা করেন যে, মনে হচ্ছিল পা জ্বলে যাবে।

তিনি জানান, রিমান্ড চলাকালে তাকে খেতে দেওয়া হতো ছোট একটি বনরুটি আর এক বোতল পানি। তাকে অজুর পানি দেওয়া হতো না, নামাজ পড়তে দিতেন না। শুধু গালাগাল করতেন, দাড়ি-টুপি নিয়ে অকথ্য ভাষায় কথা বলতেন। ভারতের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি, সে বিষয়েও তারা জিজ্ঞাসা করতেন। এ সময় পরিচিত কয়েকজন পুলিশ তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার চেষ্টা করলে তা বুঝতে পেরে তাদের বদলির হুমকি দেন ওসি রফিক।

পুলিশকেও গালাগাল করতেন তিনি অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেননি তারা।

রিমান্ডে নির্যাতনের একপর্যায়ে যখন বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলেন, নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল, সে অবস্থায় তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়েই সেলে নিয়ে যান। সেখানে এক পুলিশ তার মরণাপন্ন অবস্থার কথা বললে ওসি রফিক সেই অবস্থায় আবার পেটানো শুরু করেন।

বে-ইজ্জতি করতে পাশের একজন হত্যা মামলার আসামির পা টিপতে বলা হয়। একপর্যায়ে তাকে আবার রিমান্ডের রুমে নিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চাপ দেন। তাতে রাজি না হওয়ায় কয়েকজন মিলে ধরে প্লাস দিয়ে টেনে হাতের নখ তুলে ফেলেন। সেই নখের স্থানে সুঁই ঢুকিয়ে দেন।

এ সময় জান বাঁচাতে তিন পৃষ্ঠার একটি স্বীকারোক্তি মুখস্থ করার পরামর্শ দেন এক পুলিশ। নইলে তারা মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেন। তবে তার একটাই কথা, জীবন গেলেও মিথ্যা স্বীকারোক্তি তিনি দেবেন না। রিমান্ডে নির্যাতনে তার স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। যথাসময়ে চিকিৎসা না পাওয়ায় শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন তিনি।

রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হলে সেখানেও নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। হেফাজতের কোনো নেতা নামাজ পড়াতে, ধর্মীয় কথাবার্তা বলতে পারবেন না। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও ফোনকল ছিল নিষিদ্ধ। সেখানে হেফাজতের লোকদের কোনো চিকিৎসাও দিতেন না। আসাদুল্লাহ বলেন, রিমান্ডে নখ তুলে ফেলায় রক্ত বের হচ্ছিল, হাঁটু ফুলে গেছে, হাঁটতে পারতাম না, নামাজ পড়তে পারতাম না, তারপরও কারা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হতো না। কারাগারে রুহুল ও এমদাদ নামের দুই নিরাপত্তারক্ষী অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতেন। আমার ভাইকে এক দিন মুমূর্ষু অবস্থা মেডিকেলে নিয়ে গেলেও সেখানে আড়াই ঘন্টা ফেলে রাখা হয়। পরিবারের খবর নিতে এক দিন ফোন করতে গেলে গোয়েন্দারা আমাকে ধরে প্রচণ্ড মারধর করেন, চোখে ঘুসি মারেন। অনেক দিন ঠিকমতো চোখে দেখতে পাইনি।

মাদরাসাছাত্রদের হত্যার হুমকি দিতেন ওসি রফিক। তিনি বলতেন, হাটহাজারীর ছাত্রদের ধ্বংস করতেই তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

আসাদুল্লাহ বলেন, হাটহাজারীতে হত্যা মামলায় শুধু ওসি রফিকই গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাকিদের কেউ লুকিয়ে, কেউ বহাল তবিয়তে আছেন। কয়েকজনকে মামলা থেকে বাদ দিয়েছে পুলিশ। তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন ওলামায়ে কেরামের। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

প্লায়ার্স দিয়ে নখ তুলে ফেলেছে, দাড়ি ছিঁড়েছে

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ০২
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ০৩

পুরানা পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে একদিন দুপুরে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাওলানা আরিফুল ইসলামসহ পাঁচজনকে। পরে অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলে র‌্যাব-৩ কার্যালয়ে নিয়ে চলে দফায় দফায় নির্যাতন।

বিবস্ত্র করে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয় তাদের। জ্ঞান হারালেও থামেনি নির্যাতন। নামাজ পড়তেও বাধা দেওয়া হয় তাদের। এমনকি 'আল্লাহ' শব্দ নিয়ে ব্যঙ্গ করেন র‌্যাব অফিসাররা। আইসিটি আইনের বানোয়াট একটি মামলায় রিমান্ডে নির্যাতন ছাড়াও ২৬ দিন জেলের কষ্ট সহ্য করতে হয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তরের এই সেক্রেটারিকে।

মাওলানা আরিফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার শুধু নির্দিষ্ট কোনো ওলামায়ে কেরাম বা কোনো দলের নেতাদের ওপর নির্যাতন চালায়নি। ইসলামপন্থি বলতে যাদের বোঝায়, সেই ওলামায়ে কেরাম বা ইসলামী দলের নেতাকর্মী সবার ওপরেই তারা নির্যাতন চালিয়েছে।

তারই ধারাবাহিকতায় নির্যাতনের শিকার হন তিনি। একইসঙ্গে আরও পাঁচজনকে নির্যাতন করা হয়। তারা হলেন—আব্দুল রহমান গিলমান, এমদাদুল্লাহ ফাহাদ, রহমতুল্লাহ বিন হাবিব, শেখ মুহাম্মাদ মারুফ ও সিরাজুল ইসলাম।

২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সাংগঠনিক কাজে পুরানা পল্টনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন মাওলানা আরিফুল ইসলাম। হঠাৎ সেখানে সাদা ও র‌্যাবের পোশাকে বেশ কয়েকজন সদস্য প্রবেশ করেন। তারা মাওলানা আরিফের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে কিছু কথা বলতে চাইলেন।

তারা সংগঠনটির ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজের তথ্য-সংবলিত কিছু প্রিন্ট করা কাগজ দেখিয়ে জানতে চাইলেন, এগুলো তাদের কি না। তিনি তাদের হ্যাঁ-সূচক জবাব দিয়ে দেখলেন, কাগজে তাদের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য-বিবৃতি এবং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার বিষয়গুলো আছে। এর সঙ্গে আরও কিছু কাগজ দেওয়া ছিল, যেগুলো তাদের নয়।

এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে র‍্যাব সদস্যরা তাদের আটক করে র‍্যাব-৩ কার্যালয়ে নিয়ে যান। এ সময় তাদের অফিসের কম্পিউটার এবং সবার মোবাইল-আইপ্যাড জব্দ করা হয়।

মাওলানা আরিফুল ইসলাম বলেন, আমাদের আটক করে নিচে নেওয়ার পর দেখলাম, অফিসের নিচের রাস্তা থেকে শুরু করে অফিস বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন তলায় র‍্যাব সদস্যরা যেন রণসাজে সজ্জিত। আমাদের সাদা একটি মাইক্রোবাসে নিয়ে টিকাটুলিতে র‍্যাব-৩ কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে সবার তথ্য সংগ্রহ করেন র‍্যাব সদস্যরা। এরই মধ্যে আছরের ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়তে চাই। নামাজের সুযোগ দিলে অজু করার জন্য একটি রুমে গিয়ে দেখি ভয়ংকর অবস্থা। সেখানে ছিল ইলেকট্রিক চেয়ার ও বহু প্রকারের লাঠি।

তিনি বলেন, অজু করে নামাজের প্রস্তুতি নিতেই বাইরে থেকে একজন আওয়াজ দিয়ে বললেন, হুজুরেরা কোথায়? ‘নামাজে গেছেন’ বলায় তিনি র‍্যাবের এক সদস্যের ওপর রেগে চরম গালি দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের চোখ খোলা কেন? নামাজের জন্য চোখ খোলা হয়েছে বলে জানালে তিনি বললেন, কীসের নামাজ? নামাজ পড়া যাবে না বলেই তাদের চোখ বেঁধে ফেললেন।

জামা-টুপিও খুলে ফেলা হয়। তাদের ছোট একটি রুমে নিয়ে যায়। মাওলানা আরিফ বলেন, আয়নাঘরের কথা শুনেছি, আমি নিজেও সেই আয়নাঘরে ছিলাম। দুই ফুটের মতো চওড়া রুমটিতে শুলে পা ধরে না, দাঁড়ালেও মাথা বেধে যায়। সেই রুমে চোখবাঁধা অবস্থায় পশ্চিম দিক অনুমান করে বসেই নামাজ পড়েন তারা।

আরিফুল ইসলাম বলেন, নামাজের পর সেই অফিসারের রুমে তাদের ডেকে পাঠানো হয়। একজন করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় পাশের রুমে নির্যাতনের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। একপর্যায়ে আমাকে সেই রুমে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের সোজা কথা—‘গেঞ্জি খোল।’ গেঞ্জি খোলার পর পায়জামাও খুলতে বলেন। তখন গালাগালি করে সেটিও খুলতে বাধ্য করেন।

এসময় তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে মোটা লাঠি দিয়ে পেঠানো শুরু করে র‍্যাব। আরিফুল বলেন, আমাকে এমনভাবে পেটায় তা বলার ভাষা নেই। যতক্ষণ মনে চেয়েছে ততক্ষণ পিটিয়েছে। আমাদের সাথী ভাইদের মধ্যে এমদাদুল্লাহ ফাহাদ ও শেখ মারুফের হাতের আঙুলের নখগুলো প্লায়ার্স দিয়ে উঠিয়েছে। একপর্যায়ে তাদের দাড়িগুলো টেনে টেনে উঠিয়েছে।

সব নির্যাতন শেষ করে তার কাছে তারা জানতে চাইলেন, এর সঙ্গে কারা কারা জড়িত। ফেসবুক কে চালায়, প্রচার সম্পাদক কে প্রভৃতি। এর আগে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বেদম পেটানো হয় তাদের। পেটানো শেষে তাদের হাতে তারা জামা-কাপড় দিয়ে দেন। তাদের প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধও দেন।

একজনের এই ছবি তোলার কাজ শেষ হওয়ার আগেই আবার আগের অফিসারের রুমে ডাক পড়ে। সেখানে সিভিলে ও পোশাকে আরও ১০-১২ জন ছিলেন। তাদের একজনের হাতে ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল। এ সময় মাওলানা আরিফের চোখ খোলা দেখে আবার রেগে যান সেই অফিসার। পরে তাদের সেই টর্চার রুমে নিতে বলেন। এ সময় 'আজরাইল' নামে একজনকে ডাকা হয় সেখানে। সম্ভবত তিনি র‍্যাব ৩-এর নির্যাতক।

মাওলানা আরিফুল বলেন, আমাকে নিয়ে সেখানে কাপড় দিয়ে হাতদুটো শক্ত করে বাঁধা হয়। গেঞ্জি খুলে ফেলা হয়। সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে নেমে আসে একটি অটোমেটিক রশি। সেটা হাতের সঙ্গে বাঁধা হয়। মেশিনে চাপ দিতেই তিনি ওপরের দিকে উঠে যান। তাকে বিবস্ত্র করা হয়। সাধ্যমতো চেষ্টায় লজ্জাস্থান ঢাকতে তিনি ডান পা বাঁ পায়ের ওপর উঠিয়ে দিলেন।

এই সুযোগে তার পেছনে ও সামনে থেকে ব্যাপকভাবে পেটানো হয়। অনেকটা জ্ঞান হারানোর কারণে কতক্ষণ পেটানো হয়েছে, তা তিনি স্মরণে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, যত নির্যাতনই হোক সহ্য করার মানসিক শক্তি আমার ছিল। আমি শুধু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবির শব্দ বলতে থাকি। এই আল্লাহু আকবার শব্দ নিয়ে তারা ব্যঙ্গ করে সর্বশক্তি দিয়ে পেটান। এরপর পায়ের তলায় পেটানোর নির্দেশ দেন অফিসার। তাদের মনমতো নির্যাতন শেষ করেন। একইসঙ্গে ছবি তোলার ফ্লাশ লাইট পড়ে সেখানে। ভিডিও করতে বলা হয় তখন।

আরিফুল ইসলাম বলেন, আমাকে যেসব প্রশ্ন করেছে, তার স্বাভাবিক উত্তর দিয়েছি। আমার ওপর নির্যাতনের শব্দ পাশের রুমে থাকা অন্য সাথিরাও শুনেছেন। একপর্যায়ে আমাকে ছেড়ে দিলে দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাদের দুজনের কাঁধে ভর করে রুমে আসি। এসময় হাতে কাপড় দেওয়া হয়। সেগুলো পরার পর রুমের বাইরে বের হই। একইভাবে বাকি পাঁচজনকেও বিবস্ত্র করে নির্যাতন করে। অনেকের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। নির্যাতন শেষে সেই ছোট রুমে দুজন করে আমাদের রাখা হয়।

এদিকে র‍্যাব অফিসে আনার পর থেকে আর কোনো খবর দলীয় কার্যালয়ে দেওয়া হয়নি। খবর নিতে এলেও কোনো তথ্য না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সারা রাত সেই রুমে রেখে পরদিন মিডিয়ার সামনে হাজির করা হয়। তখন তাদের জঙ্গি হিসেবে এবং দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ দেওয়া হয়।

ওই র‍্যাব সদস্য কারও সঙ্গে কথা বলে পাশে পুলিশ লাইনস হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার ডাক্তার ভীষণভাবে রেগে গিয়ে র‍্যাব অফিসারকে বললেন, এভাবে তো কোনো মানুষ কাউকে মারতে পারে না।

মাওলানা আরিফ জানান, ২৬ দিন জেলে থাকা অবস্থায় অনেকবার কোর্টে তোলা হয় তাদের। এর মধ্যে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। তবে পল্টনে না নিয়ে কারাগার থেকে সোজা এয়ারপোর্টের পেছনে র‍্যাব ১-এ নিয়ে গেলেন। প্রিজনভ্যানের পাহারায় থাকা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলে র‍্যাব ১-এর কথা বলা হয়। এতে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়।

একটি ফাঁকা জায়গায় গাড়ি থামানো হয়। সেখানে র‍্যাবের একটি গাড়ি আসে। সবাইকে গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে পেছনে হ্যান্ডকাফ দিয়ে মাথা নিচু করে বসতে বলা হয়। মাথা ওঠালে গুলি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরে একটি ভবনে ছোট রুমে নেওয়া হয়। একজন করে ডেকে ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া হয়। সেখানে চোখ সবসময় বাঁধা থাকত। খাওয়ার সময় হাত এবং বাথরুমে যাওয়ার সময় চোখ-হাত খোলা হতো।

সেই রাত সেখানে কাটিয়ে পরদিন আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টার মতো জিজ্ঞাসাবাদ করেন তারা। পল্টন থানার এসআই ও অন্যরা সাদা পোশাকে ছিলেন। সেখানেও একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে দুই দিনের মাথায় পল্টন থানায় নেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারাগারে, পরে কাশিমপুরে নেওয়া হয়। অন্তত ১০ বার জামিন চেষ্টার পর ২৩ অক্টোবর জামিনে মুক্তি পান তিনি।

চরিত্র হননের জন্য নারীর সঙ্গে ‘শুটিং’ করায় পুলিশ

রকীবুল হক

প্রকাশ : ২৭ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ২১

দেশের আলোচিত ইসলামি প্রচারক মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী 'শিশু বক্তা' হিসেবেই বেশি পরিচিত। ওয়াজ মাহফিল ছাড়াও দেশ ও ইসলামবিরোধী বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও দেখা যেত তাকে। তার এই তৎপরতা থামাতে জঘন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেয় পতিত আওয়ামী সরকার।

বিনা অপরাধে আটকের পর একের পর এক বানোয়াট মামলা দিয়ে ৩২ মাস কারাবন্দি ও ২৬ দিন রিমান্ডে নির্যাতন করে ফ্যাসিবাদী সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

দেশের জনপ্রিয় একজন তরুণ আলেমের চরিত্রহননে পর্নোগ্রাফির অভিযোগ ছাড়াও শার্ট-প্যান্ট পরিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে অচেনা নারীর সঙ্গে 'ফটোশুটিং' করে পুলিশ। রিমান্ডে চড়-থাপ্পড় আর গালাগাল ছিল স্বাভাবিক বিষয়। গ্রেপ্তারের আগে এবং সাত মামলায় জামিনের পরও তাকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হতো। বাধা দেওয়া হতো ওয়াজ মাহফিলেও।

আওয়ামী শাসনামলে আলেম-ওলামাদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী আমার দেশকে বলেন, এ দেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থিদের একেবারে বিলীন করে দেওয়ার বড় একটি পরিকল্পনা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের।

ভারতের ইন্ধনে, সরাসরি তাদের দিকনির্দেশনায় এবং 'র'-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থিদের কোণঠাসা করে দেওয়ার মাস্টারপ্ল্যান ছিল তাদের। সেই প্ল্যানের অংশ হিসেবেই ২০২১ সালে শত শত আলেম-ওলামাকে বন্দি করা হয়। আর সে সময় সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার হন তিনি।

একের পর এক আলেম-ওলামা গ্রেপ্তারের খবরে এমনতিতেই শঙ্কায় ছিলেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী। কারণ ২০২১ সালের ২৫ মার্চ মতিঝিল শাপলা চত্বরে মোদির আগমনবিরোধী ছাত্রদের একটি বিক্ষোভে অংশ নিয়ে একবার আটক হন তিনি। পল্টন থানায় চার ঘন্টা আটকে রাখার পর বিভিন্ন গালাগাল ও হুমকি-ধমকি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপর ২০২১ সালের ৬ এপ্রিল গভীর রাতে র‍্যাব পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে আটক করে। এরপর ৩২ মাস ধরে তার ওপর চলে অত্যাচারের স্টিমরোলার।

রফিকুল ইসলাম মাদানীকে গাড়িতে তুলেই র‍্যাবের একজন ওয়্যারলেসে কাকে যেন বলেন, স্যার মিশন সাকসেস, নিয়ে আসছি। গাড়িতে চোখ খুলে দেওয়া হয়। একই বাড়ি থেকে তার এক ভাই ও ভাগনেকে ধরে নিয়ে আসে। পথে ভাইকে ছেড়ে দিলেও ভাগনেকে তার সঙ্গেই নেওয়া হয়। গাজীপুরের কাছাকাছি পৌঁছালে আবার তার মুখে কালো কাপড় লাগিয়ে দেয়। তাকে উত্তরার র‍্যাব-১-এর কার্যালয়ে আনা হয়। পথে ফজরের ওয়াক্ত চলে গেলেও তাকে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়নি।

সকাল ৭টার দিকে সেখানে পৌঁছালে বাথরুম সেরে একটি রুমে ফজরের নামাজ পড়েন তিনি। পরে একজন প্রবেশ করেন সেই রুমে। তার আচরণ ছিল চরম মাস্তানিসুলভ। চেয়ারে বসা ব্যক্তি রফিকুল ইসলাম মাদানীর সামনে রাখা টেবিলে দুই পা উঠিয়ে মুখে সিগারেট ফুঁকে হাস্যরস করেন। হুট করে ভয়ংকর হয়ে মা-বাবা তুলে গালি দেওয়া শুরু করেন তিনি।

এভাবে একের পর একজন এসে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাকে। হঠাৎ একজন তাকে জোরে থাপ্পড় মারেন। বীভৎস চেহারায় গালাগালও চলে সমানে। প্রচণ্ড আঘাতে কানে অনেকক্ষণ আওয়াজ শোনা বন্ধ ছিল, চোখ দিয়ে পড়ছিল পানি। পরে দুজন তাকে ধরে ছোট একটা রুমে নিয়ে যায়। সেখানে বিদ্যুতের চেয়ার, ঝোলানোর যন্ত্র এবং ওয়ালে ছিল বীভৎস চিত্র। বিশেষ ধরনের লাঠি, চাকুসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখে আতঙ্কিত হওয়ার মতো একটি রুম। সেখান থেকে চিৎকার করলেও বাইরে কোনো আওয়াজ যাবে না। রুমের সামনে উচ্চ শব্দের দুটি ফ্যান চালিয়ে রাখা হয়।

সেখানে তাকে কোনো আঘাত না করলেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আরেকটি রুমে নেওয়া হয়। এ সময় সেখানে হিন্দি ভাষায় কথা বলতে শোনেন তিনি। দিনভর এসব নির্যাতনের পর রাতে নেওয়া হয় থানায়। র‍্যাবের পক্ষ থেকে করা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা। সেখানে অবস্থানকালে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন নন্দলাল নামের একজন কর্মকর্তা। পর্যায়ক্রমে সপ্তাহখানেকের মধ্যে গাজীপুরের বাসন, ময়মনসিংহ, রাজধানীর মতিঝিল, পল্টন, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধীসহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা করা হয়। এসব মিথ্যা মামলায় ২৬ দিন রিমান্ডে ছিলেন তিনি।

পরদিন ৮ এপ্রিল গাজীপুর আদালতের মাধ্যমে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয় রফিকুল ইসলাম মাদানীকে। সেখানে ‘৬০ সেল পূর্ব’ নামে ভবনের নিচতলায় এমন জায়গায় রাখা

হয়, যেখানে সব ফাঁসির আসামি বা কুখ্যাত অপরাধীদের রাখা হয়। টয়লেটের পাশের ওই রুমটি ছিল খুব দুর্গন্ধময়। লকআপে বন্দি অবস্থায় প্রায় আট মাস খুবই কষ্টে কাটে তার।

মাঝে কয়েক দিন কেরানীগঞ্জেও নেওয়া হয় তাকে। এ সময় স্বাভাবিক কোনো সুবিধা পাননি, পরিবারের কেউ দেখা করতে এলে হয়রানি করা হতো। এক/দেড় মাসের মাথায় শুধু তার মা সাক্ষাতের সুযোগ পান। অন্য রুমে যেতে আট মাসের মাথায় অনশন করলে বেহুঁশ হয়ে পড়েন তিনি। তখন তাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে। পরে তাকে ওপরতলায় রাখা হয়।

কারাগারে অবস্থানের দেড় মাসের মাথায় দুদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয় মাদানীকে। স্বাভাবিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পাঠানো হয় কেরানীগঞ্জ কারাগারে। সেখানে মামুনুল হকসহ অনেক আলেমের সঙ্গে দেখা হয় তার। ওই কারাগারে ঢোকার সময় গেটে চেক করার নামে লুঙ্গির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে নির্লজ্জ আচরণ করা হয়।

রফিকুল ইসলাম মাদানী বলেন, আমরা আসরের নামাজের পর আলেমরা মিলে কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে জালেমের বিরুদ্ধে কান্নার সঙ্গে দোয়া করতাম। কিন্তু কেরানীগঞ্জ জেলের হিন্দু সুপার সেটা বন্ধ করে দেন।

তরুণ এই আলেম সবচেয়ে জঘন্য ও নাটকীয় অত্যাচারের শিকার হন তেজগাঁও থানার পাঁচ দিনের রিমান্ডে। আর এই নির্যাতনের মূল পরিচালক ছিলেন তেজগাঁও জোনের তৎকালীন ডিসি হারুন (ডিবির হারুন অর রশীদ)। এক দিন তার শরীরের মাপ নেওয়া হয় (পরে বুঝতে পারেন, সেই মাপ অনুযায়ী শার্ট-প্যান্ট বানানো হয়)।

রমজান মাসে মধ্যরাতে হঠাৎ তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরঝিলে। গামছা দিয়ে তার মুখ-চোখ ঢেকে দেওয়া হয়। ওসি শাহ আলম ও এসআই শোয়েব একটি গাড়িতে করে তাকে নিয়ে যান। একটি লেকের কাছে নিয়ে তার চোখ খুলে দিতেই সেখানে ২৫/৩০ বছর বয়সি বোরকাধারী এক নারীকে দেখতে পান।

সেখানে তাকে শার্ট-প্যান্ট পরাতে তার লুঙ্গি-ফতোয়া টেনে খোলার চেষ্টা করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে নিজেই সেগুলো পরে নেন। হালকা আলোয় কারও চেহারা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। দূরে আশপাশে অনেক লোক থাকলেও নারীটি কাছে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। এ সময় আল্লাহর সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে কান্না করেন তিনি।

মেয়েটি তাকে থামিয়ে বলেন, আমি আপনার বোনের মতো। মেয়েটির কাঁদের ওপর তার হাত দিয়ে দেয়, সেটি সরিয়ে নিলে আবার দিয়ে দেয় এক পুলিশ। এ সময় 'ফটোশুটিংয়ের' জন্য চারদিক থেকে অনেকগুলো ক্যামেরার লাইট জ্বলছিল। সব যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মাদানী বলেন, মূলত তাকে প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে সিগারেট টানা অবস্থায় মেয়ের পাশে ছবি তুলে খুব খারাপ-জঘন্য মানুষ হিসেবে প্রচারের উদ্যোগ নেয়। শুটিংয়ের মতো তাকে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার স্টাইল তারাই বারবার শিখিয়ে দেয়। আলেমদের হেয় করার প্ল্যান ছিল

এটা। প্রকাশ্যে উলঙ্গ করে নির্যাতনের সময় লজ্জা বাঁচাতে তিনি সরকারবিরোধী কিছু না বলার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। সেই বক্তব্য পরে সরকার প্রচার করে। দুই ঘন্টাব্যাপী ওই 'শুটিংয়ে' পুলিশের সঙ্গে মিডিয়া ও 'র'-এর লোকও ছিল বলে তার ধারণা।

হাতিরঝিল থেকে ফেরার পথে গাড়িতে ওসি শাহআলম তাকে বলেন, হুজুর আমাদের কিছুই করার নেই। ডিসি হারুন এটা জানেন কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হারুন সাহেবই তো এটার মাস্টারমাইন্ড। এই গ্রেপ্তারের সপ্তাহখানেক আগেই ডিসি হারুন রফিকুল ইসলাম মাদানীকে হেলিকপ্টারে করে তার এলাকায় কিশোরগঞ্জের মাহফিলে নিয়ে যান। ফেরার সময় পকেটে হাদিয়াও দেন তিনি। মাদানী বলেন, এসব নির্যাতনের ভয়ংকর পরিণতি হয়েছে। আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। হারুন এখন পলাতক।

তেজগাঁও থেকে আবার তাকে ডিবিতে রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেখানে তৎকালীন ডিবিপ্রধান হাফিজ আখতার তাদের অনেক গালাগাল করেন। এক দিন জিজ্ঞাসাবাদ টিমের বাইরের একজন হঠাৎ তাকে থাপ্পড় দিয়ে চেয়ার থেকে ফেলে দেয়। সেখানে ১২ দিন রিমান্ড থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে হাসপাতালে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

চরিত্রহননের জন্য তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফির অভিযোগও করেছিল পুলিশ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সে সময়টা ভাবতেও লজ্জা লাগে। চরিত্রহননের জন্য তারা অনেক কিছু করেছে।

১৯৯৪ সালের ২ এপ্রিল জন্মগ্রহণকারী রফিকুল ইসলাম মাদানী পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। মাত্র আট বছর বয়সে দরিদ্র বাবাকে হারান তিনি। ২০১২ সাল থেকে 'শিশু বক্তা হিসেবে' বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে সারাদেশে মাহফিলে ব্যস্ত সময় কাটান এই আলেম।

কারেন্টের শক দেওয়া হয় ঘাড়ে ও গোপনাঙ্গে

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, ০৮: ৫০

হাটহাজারী মাদরাসা এলাকায় বেশ পরিচিত মুখ মাওলানা আমিনুল ইসলাম। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকতেন তিনি।

সংগঠনটির হাটহাজারী পৌরসভা কমিটির সহকারী দাওয়াহ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। শীর্ষ আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসার কারণে বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের টার্গেটে পড়েন তিনিও। বিনা অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে হেফাজতের সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ১৯ দিন রিমান্ডে নিয়ে চালানো হয় বর্বর নির্যাতন। চট্টগ্রামের তৎকালীন এসপি রশিদুল ও ডিবির ইন্সপেক্টর কেশব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা, নখ উপড়ে ফেলা এবং কারেন্টের শক দেওয়া হয়।

এমনকি তাকে ক্রসফায়ারে দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। রিমান্ডে অব্যাহত নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়েও দীর্ঘ ২৩ মাস বিনা চিকিৎসায় জেলে চরম দুর্ভোগে কাটে তার সময়। মুক্তির পর নানা শারীরিক সমস্যায় এখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি তরুণ এই আলেম।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম জানান, ২০২১ সালে নরেন্দ্র মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা এলাকায় শুরু হয় আলেম-ওলামা নির্যাতের মহোৎসব। এ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার এড়াতে হাটহাজারী ছেড়ে ফটিকছড়িতে নানাবাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি, কিন্তু সেখানেও গ্রেপ্তার হতে হয় তাকে।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে ফটিকছড়ির লেলাংয়ের রায়পুর গ্রামের সেই বাড়িতে হানা দেয় র‍্যাব, ডিবি ও সোয়াত টিমের ২৭টি গাড়ি। ওই বাড়িতে ঢুকেই নারী-পুরুষ সবাইকে জিম্মি ও হেনস্তা করে গ্রেপ্তার করা হয় আমিনুলকে। একই সঙ্গে তিন দিন আগে বিবাহিত তার এক মামাতো ভাইকেও নিয়ে যায় তারা। বাড়িতে অস্ত্র-গুলির সন্ধানও জানতে চায় তারা।

হেলমেট পরিয়ে ও পেছনে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে হেফাজতের 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এর সদস্য আখ্যা দিয়ে কড়া নিরাপত্তায় অনেক পথ ঘুরিয়ে আমিনুলকে নেওয়া হয় চট্টগ্রাম এসপি কার্যালয়ে। সেখানে এসপি এসএম রশিদুল হক তাকে প্রশ্ন অনুযায়ী জবাব দিতে বলেন। সেক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয় তাকে। বলা হয়, 'তুমি বাবুনগরীর নির্দেশে পুলিশকে মেরেছ, ভূমি অফিসে আগুন দিয়েছ—এসব স্বীকার কর?' এসবে জড়িত নয় জানালে তাকে কিছুক্ষণ পর নেওয়া হয় পাঁচলাইশ থানায়।

সেখানেও একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ায় মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করার হুমকি দেয় তারা। পরে তাকে কালোক্যাপ ও হ্যান্ডকাফ পরিয়ে পাশের রুমে নিয়ে কয়েকজন মিলে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। এতে তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তারা রক্ত মুছে দিয়ে দুজন ধরে আরেকটি রুমে নিয়ে বসায়। এ সময় পানি চাইলেও দেয়নি তারা। এভাবে সকাল পর্যন্ত সেখানে বসিয়ে রাখা হয়। সকালেও পানি চাইলে ময়লা-আবর্জনা দিতে বলে একজনকে।

সকাল ৯টায় আদালতের ওয়েটিং রুমে নিয়ে বসিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেওয়ার প্র্যাকটিস করানো হয়। স্বীকারোক্তি দিলে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয় তারা। সে সময় মাথাঘুরে বেহুঁশ হয়ে যান আমিনুল। হুঁশ ফেরাতেও ব্যাপক নির্যাতন করে পুলিশ। অনেক চেষ্টার পরও হুঁশ ফেরাতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে মেডিকেলে নিয়ে যায়।

অবস্থা খারাপ দেখে ডাক্তার তাকে বেডে নিতে বলেন। কিন্তু পুলিশ তাতে রাজি না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা সুস্থ করার পরামর্শ দেয়। সেখানে ডিবির ইনস্পেক্টর কেশব চক্রবর্তী গিয়ে দ্রুত চিকিৎসা দিতে বলেন। এরপর একটি ইনজেকশন দিলে তার ব্যথা কমে। আবার তাকে নেওয়া হয় এসপি কার্যালয়ে। সেখানে দুপুর ১২টায় তিনজন এসে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং এরপর তাকে নেওয়া হয় কোর্টে। পরে একবার পাঁচলাইশ থানায়, আরেকবার এসপি কার্যালয়ে, সর্বশেষ পাঁচলাইশ থানায় নিয়ে তাকে বিস্ফোরক মামলায় জড়িয়ে ফের কোর্টের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

রাত ৯টায় কারাগারে নিয়ে মাওলানা আমিনুল ইসলামকে খুব সাবধানে রাখার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয় পুলিশ। সে অনুযায়ী তাকে কনডেম সেলে (কবর সেল হিসেবে পরিচিত) ২৪ ঘন্টা লকাপে রাখা হয়। তার দুপাশের সেলে জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী ও হেফাজত নেতা আজিজুল হক ইসলামাবাদী ছিলেন।

সকালে তাকে কারা মেডিকেলে নিয়ে চেকাপ করে নিয়ে আসে। সেখানে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি হিসেবে তার পরিচয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। করোনার কারণে সে সময় ভার্চুয়াল কোর্টে

উপস্থাপন করা হলে মহিলা জজ তাকে দ্রুত সুস্থ করার নির্দেশ দেন। এতে কারা মেডিকেলের ডা. শামীম রেজা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে বলেন, 'তুই মরোছ না কেন?'

আট দিন পর কিছুটা সুস্থ হলে তাকে ভার্চুয়াল কোর্টে তোলা হয়। তাকে দেখে ঠিক আছে বলে আগের ১০ দিনের রিমান্ড ক্যানসেল করে ১২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। পরে তাকে শীর্ষ সন্ত্রাসীর মতো ১২টি গাড়ির স্কোয়াড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম জজকোর্টে।

সেখানে পুলিশ ছাড়া আর কেউ ছিল না। মহিলা জজের সামনে উপস্থাপন করলে তিনি রিমান্ডে নেওয়ার মতো ফিট আছে বলে জানান। পরে তাকে এসপি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে একটি রুমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। মিথ্যা স্বীকারোক্তি নিতে নানাভাবে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করা হয়। এসময় গাড়ি, বাড়ি, নারী—সবকিছু দেওয়ার প্রলোভন দেওয়া হয় তাকে।

নগদ ১০ লাখ টাকা দেখিয়ে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়—পাকিস্তান থেকে কত টাকা কার কাছে এসেছে, আইএসআইয়ের সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক, হাটহাজারী মাদরাসার আয়ের উৎস কী প্রভৃতি। এভাবে দুদিন ধরে কোনো স্বীকারোক্তি না নিতে পেরে নির্যাতনের হুমকি দেয় পুলিশ। একপর্যায়ে এসপি রশিদুল টেবিল থাপড়িয়ে উপস্থিত ডিবির ইন্সপেক্টর কেশব চক্রবর্তী, এসআই হান্নান ও পারভেজকে নির্যাতনের নির্দেশ দেন।

তখন তাকে পাশে টর্চার সেলে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে শুরু হয় মারধর। মরার মতো অবস্থা হয়ে যায়। পরে তাকে ঝোলানো হয়। হাত-পায়ের তালুতে মারা হয়। এসময় তিনি পানি চাইলে কেশব চক্রবর্তী প্রস্রাব করে দেওয়ার কথা বলে। এভাবে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তাকে। দাঁড়াতে না পারলে পাশে জানালার গ্রিলের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

রিমান্ডের সময় খাবার হিসেবে তিন বেলা দেওয়া হতো একটা পরোটা ও এক বোতল পানি। এ সময় তারা সহজে প্রস্রাব-পায়খানা করতে দিত না। গোসল করতে দেয়নি। নামাজের সময় দিত ৫ মিনিটের মতো। বেশি সময় লাগলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। এভাবে দীর্ঘ ১২ দিনের রিমান্ডেও কোনো স্বীকারোক্তি না পেয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মাওলানা আমিনুলকে। এরই মধ্যে হাটহাজারী, পটিয়া ও পাঁচলাইশ থানায় একে একে ১৪টি মামলা করা হয় তার বিরুদ্ধে।

মাত্র ছয় দিন পর আবার ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। তাকে নেওয়া হয় এসপি কার্যালয়ে। সেখানে তাকে প্রতি কথায় থাপ্পড় আর দাড়ি ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন ডিবির ইনস্পেক্টর কেশব চক্রবর্তী। একপর্যায়ে রাতে তাকে মুখে কালো কাপড় পরিয়ে কালো গাড়িতে তুলে বাইরে নিয়ে যায় পুলিশ। এসময় তাকে বিভিন্ন পথে ঘোরায় আর ক্রসফায়ারে দেওয়ার কথা বলে।

সুবিধাজনক জায়গা খুঁজছিল তারা। গাড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বলে। নইলে মেরে ফেলে রাখার হুমকি দেওয়া হয়। এসময় তিনি মৃত্যু অনিবার্য জেনে

কালেমা পড়ছিলেন, আর মা-বাবার কথা স্মরণ করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাকে আবার গাড়িতে তোলা হয়। আনুমানিক আধা ঘণ্টা গাড়ি চলার পর ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়।

এসপি কার্যালয়ে অবস্থিত ডিবির সেই টর্চার রুমে আবার তাকে নিয়ে পেটানো শুরু হয়। এ সময় কোনো ঘুমের সুযোগ ছিল না। বাথরুম করতে হতো তাদের ইচ্ছামতো। একপর্যায়ে তার কোমরে একটা ইনজেকশন দেওয়া হয়। এভাবে রিমান্ডে চার দিন নির্যাতন চালিয়েও কোনো স্বীকারোক্তি না পেয়ে প্লায়ার্স থেরাপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

আরেকজনের পরামর্শে প্লায়ার্স থেরাপির আগে কারেন্টের শক দেওয়া হয় ঘাড়ে ও গোপনাঙ্গে। এরপরও কোনো স্বীকারোক্তি দেননি তিনি। পরে রাত ১২টায় তার হাত-পা বেঁধে একের পর এক হাতের সব নখ প্লায়ার্স দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়। এ অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে যান তিনি। হুঁশ ফিরলে দেখেন তার গায়ে ঘাম, আর রক্ত নিচে পড়ে ভিজে যাচ্ছে। তবে ব্যথানাশক কিছু দেওয়ায় ব্যথা লাগছিল না।

পরের দিন তাকে কোর্টে তুলে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। হাত দিয়ে স্বাক্ষর দিতে না পারায় তারাই ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে কোর্টে জমা দেয়। এ সময় মহিলা জজও তাকে স্বাক্ষর ও মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে চাপ দেন। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। টানা আট মাস ২৪ ঘণ্টা লকাপে রাখা হয় তাকে।

এসময় হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা আর পুঁজ পড়া শুরু হয়। ব্যথায় সারা দিনরাত চিৎকার করতেন তিনি। এজন্য পাশের বন্দিরাও কারারক্ষীদের কাছে প্রতিবাদ করতেন। তারপরও কোনো চিকিৎসা দেওয়া হতো না তাকে। শুধু ব্যথার ইনজেকশন দেওয়া হতো।

দীর্ঘ আট মাস পর জাতিসংঘের একটি পরিদর্শন টিম এসে তার এই নির্যাতনের অবস্থা দেখে তাকে কারা মেডিকেলে রাখার পরামর্শ দেয়। পরে আরও একটি টিম এসে একই পরামর্শ দেয়। সে অনুযায়ী তাকে মেডিকেলে বেডে দেওয়া হয়। সেখানে পাঁচ-ছয় দিন নামমাত্র চিকিৎসা শেষে আবার কনডেম সেলে ঢোকানো হয়। সেখানেই ২৩ মাস কাটে তার। একপর্যায়ে সব মামলায় জামিন নিয়ে মুক্তি পান তিনি।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম জানান, মুক্তির পরও তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন। আর্থিক সংকটের কারণে ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি। এখনো তার নখগুলোতে ব্যথা। চোখে কম দেখেন। ব্রেনেও সমস্যা হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। কোনো কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারেন না তিনি।

ওয়াজের কারণে হত্যা ও সন্ত্রাসবিরোধী মামলা

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১১: ০২
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১১: ০৬

মসজিদের খতিব থেকে ওয়াজ মাহফিলের বক্তাদের কন্ঠ নিয়ন্ত্রণ আর হয়রানি ও নির্যাতন ছিল পতিত আওয়ামী সরকারের অন্যতম কৌশল। শুধু খুতবা আর ওয়াজের কারণে গ্রেপ্তার-নির্যাতনের শিকার হন দেশের অন্যতম ধর্মীয় আলোচক ও খতিব হাফেজ মাওলানা মীর্জা ইয়াসিন আরাফাত। ধর্মচর্চার নামে বিকৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল হত্যা মামলা।

আর ওয়াজ মাহফিলে সরকারের অপছন্দের কিছু কথা বলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘ দুই মাস তাকে কাটাতে হয় জেলে। জজ কোর্টে জামিনের আবেদনে মেলেনি জামিন। হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পরও কাগজ আটকে মুক্তিতে বিলম্ব করা হয়। মাহফিল বন্ধ বা দাওয়াত বাতিলের ঘটনাও ঘটেছে অনেক।

এসব নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে মাওলানা মীর্জা ইয়াসীন আরাফাত আমার দেশকে বলেন, বিগত স্বৈরাচার সরকারের আমলে সাড়ে ১৫ বছরে দেশের অধিকাংশ বিরোধী মতের মানুষ, যারা রাজপথে মাঠে-ময়দানে কথা বলেছেন অথবা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের সুযোগমতো নানা প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করা হয়েছে। কখনো মামলা দিয়ে, কখনো হুমকি অথবা গ্রেপ্তার ও জেলে নিয়ে এই নির্যাতন করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

মাওলানা ইয়াসীন আরাফাত বলেন, প্রতিটি মাহফিলেই ইনসাফের কথা, জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তিনি। ২০২২ সালে ফরিদপুরের কানাইপুরে একটি মাহফিলে প্রধান আলোচক ছিলেন আবু ত্বহা আদনান। বিশেষ অতিথি ছিলেন তিনি। সেই মাহফিলে বাধা দেয় আওয়ামী সরকারের লোকরা।

সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'কোনোভাবেই একটি রাষ্ট্র পুলিশের ভয় দেখিয়ে, আইনশৃঙ্খলার ভয় দেখিয়ে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে মানুষের ওপর চেপে বসেছে- এভাবে কখনো কোনো মানুষকে কন্ট্রোল করা যায় না, যদি আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে না থাকে। আল্লাহর ভয় থাকলে মানুষ বিভিন্ন অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু পুলিশ, র‍্যাব ও আইনের ভয় দেখিয়ে মানুষকে কন্ট্রোল করা যায় না। তাই আমি সরকারের প্রতি আবেদন করব- তিনি যেন ওয়াজ মাহফিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করেন, অনুমতির প্রয়োজন যেন না হয়।'

এই বক্তব্যের পরই ফরিদপুর সদর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মাওলানা ইয়াসীন আরাফাতের নামে মামলা করে পুলিশ। এরপরই বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতেও তিনি কিছু মাহফিল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের একটি জামিন আদেশ পান তিনি।

একই সঙ্গে ফরিদপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হয়েছিল। সে অনুযায়ী ২০২২ সালের ২৪ মার্চ ফরিদপুর আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে শুনানি শেষে জামিন আবেদন

নাকচ করে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়। সেই আদেশ অনুযায়ী তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

এর আগেও মামলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কারাগারে যেতে হয়নি। সেবারই প্রথম কারাগারে যান তিনি। কারাগারে নেওয়ার আগে আদালতের গারদে রাখা হয়েছিল মীর্জা ইয়াসীন আরাফাতকে। সেখানে তেমন পরিবেশ না থাকলেও নামাজ পড়ে কিছু খাবার খান তিনি। কারাগারে নেওয়ার প্রস্তুতিকালে পুলিশের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

কারণ জানতে চাইলে তারা জানান, তার গ্রেপ্তারের খবরটি ফেসবুকে প্রচার হয়ে যাওয়ায় মিছিল-মিটিংয়ের আশঙ্কা করছিলেন তারা। এ জন্য ঢাকা থেকে তাকে সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত কারাগারে পাঠাতে বলা হয়। একপর্যায়ে প্রিজনভ্যানে তুলে ফরিদপুর কারাগারে নেওয়া হয় তাকে। সম্পূর্ণ বিনা কারণে মামলা ও কারাভোগ করতে হয় এই আলেমকে।

কারাগারে থাকা অবস্থায় জামিনের জন্য জজ কোর্টে তিন দফায় আবেদন ও শুনানি করলেও জামিন দেওয়া হয়নি। এমনকি হাইকোর্ট থেকে জামিন নেওয়ার পরও মুক্তি পেতে ১৭ দিন অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কারণ জামিন আদেশের পরও তার কাগজ দেওয়া হচ্ছিল না। কারণ বিচারপতি মানিকের একটি শ্বেতপত্রে তার নাম ঢোকানো হয়েছিল।

এ জন্য জামিনের কাগজ দিতে গড়িমসি করা হয়। অনেক দেনদরবার করে সেই কাগজ নিতে হয় তাকে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তারদের কোনোভাবেই যেন জামিন না দেওয়া হয়, সে জন্য ওপর থেকে নির্দেশনা ছিল তিনি জানতে পারেন। বিশেষ করে জেলা কোর্টগুলোকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এটার শিকার তিনিসহ সব আলেম।

মাওলানা ইয়াসীন আরাফাতকে কারাগারের কনডেম সেলে রাখার জন্য বলা হয়েছিল কারা কর্তৃপক্ষকে। তবে একপর্যায়ে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যান সংশ্লিষ্টরা। তবে নানা বিধিনিষেধের মধ্যে কারাগারে দুই মাস কাটান তিনি। অবশ্য এ সময়ে আলেম হিসেবে কেউ কেউ তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের চেষ্টা করেন। তবে আলেমদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তাদের জামায়াত-শিবির ট্যাগ দিয়ে নানাভাবে হয়রানির শঙ্কা থাকে বলে জেল-সংশ্লিষ্টরা তাকে জানান। মামলায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে বেশ কষ্ট হয়েছে তার। পরে মামলার চার্জশিট থেকে তার নাম বাদ দেওয়া হয়।

এর আগে ধর্মের নামে বিকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে রাজধানীর কদমতলী থানায় তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল। সেই মামলায় দীর্ঘ প্রায় এক বছর হাজিরা দিতে হয়। একপর্যায়ে সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এভাবেই হয়রানির শিকার হন তিনি।

বিগত সময়ে ওয়াজ মাহফিল নিয়ে সব সময় আতঙ্কে থাকতে হতো জানিয়ে মাওলানা ইয়াসীন আরাফাত বলেন, কওমি ঘরানার আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাহফিলের বক্তব্যে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম নেওয়ার কারণে তাকে জামায়াত-শিবিরের বক্তা আখ্যা দিয়ে দাওয়াত না দিতে প্রচার করা হয়। এভাবে অনেক মাফফিল থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। অনেক সময় মাহফিলে যাওয়ার পথে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় অথবা কয়েক দিন আগে

বলা হয় যে আপনার দাওয়াত বাতিল করা হয়েছে। এভাবে অসংখ্য বাধার শিকার হন তিনি।

মাওলনা ইয়াসীন আরাফাত বলেন, ২০১৫ সালের দিকে একটি মাহফিলের অনুমতির জন্য থানায় গিয়েছিল কমিটি। ওসি অতিথিদের নাম জানতে চাইলেন। নামের তালিকা ইয়াসীন আরাফাতের নাম দেখেই সেটি ফেলে দিলেন তিনি। ওসি বললেন, ইয়াসীন আরাফাত নামে শিবিরের একজন নেতা আছে। নামের মিল থাকলে বা কিছু নামের প্রতি তারা কঠোর অবস্থান ছিল। এভাবে বিরোধী মত দমনে চরিত্রহনন করতে যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই তারা করেছে।

ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোকরা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাহফিলের মঞ্চে উঠে বলা হতো-এখানে রাজনৈতিক কোনো কথা বলা যাবে না। অথচ মাহফিলে তাদের দলের লোকরাই সেখানে গিয়ে রাজনীতির কথা বলেন। আলেমরা তো কোরআন-হাদিস ও ন্যায়সংগত কথা বলেন। এ জন্য এসব কথা তাদের সহ্য হয় না। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও তাদের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা এভাবে বাধা দিতেন। তাদের অত্যাচারে একসময় সমাজে ভালো মানুষ থাকতে পারতেন না। তারা ওয়াজ মাহফিলে সরকারবিরোধী কথা না বলতেও নির্দেশনা দিতের।

আওয়ামী আমলে আলেম-ওলামা ও দাড়ি-টুপিধারীদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করায় তাদের সব সময় আতঙ্কে চলতে হতো। হেফাজতের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে তিনি এই অভিজ্ঞতার শিকার হন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের কর্মসূচি চলাকালে শাহবাগ এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে 'রাজাকার' যাচ্ছে বলে আওয়াজ করা হয়। বিগত সরকার আলেম-ওলামাদের পোশাকটাকেই রাজাকারের পোশাক বানিয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেতে অনেকে দাড়ি কেটে ফেলত।

অনেক মা-বোন তাদের সন্তানদের ওয়াজ মাহফিলসহ ধর্মীয় কাজে যেতেও সতর্ক করতেন। কারণ কোন সময় কাকে ধরে জঙ্গি বানিয়ে দেয়, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। মূলত, আলেম-ওলামাদের ওপর এত বেশি নির্যাতন হয়েছে, যার কারণে সেই আওয়ামী সরকারের খুব নিকৃষ্টভাবে পতন হয়েছে। তাই আগামীতে কেউ যেন ইসলাম ও আলেমদের প্রতিপক্ষ না বানায়, সেই আহ্বান জানান তিনি।

স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে সহিংসতার মামলার আসামি

রকীবুল হক
প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৫৯

কওমি মাদরাসা থেকে হাফেজি এবং দাওরা পাসের পাশাপাশি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন মাওলানা মাজহারুল ইসলাম। আর এই পড়ালেখা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার-নির্যাতনের পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন তিনি। বানোয়াট মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। জামিনে মুক্তির সময়ও দুই দফা আটক করা হয় জেলগেট থেকে। দীর্ঘ প্রায় তিন মাস কারাভোগের প্রভাব পড়ে কর্মজীবনেও। নানা আতঙ্ক নিয়ে গ্রামের বাড়িতে অবস্থান, ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াত বন্ধ, মাদরাসায় চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার হন তরুণ এই আলেম। বানোয়াট মামলায় হাজিরার নামে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে দীর্ঘদিন। পুলিশি আতঙ্কে থাকতে হয়েছে তার পরিবারকেও।

পতিত আওয়ামী সরকারের সময়ে ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করতেন হাফেজ মাওলানা মাজহারুল ইসলাম। এর মধ্যে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির আবাসিক হলে ছিলেন তিনি। তারপর সেখানে ছাত্রলীগের হামলা হয়। শিবির সন্দেহে অনেক শিক্ষার্থীকে মারধর করে তারা। এমনই পরিস্থিতিতে ট্রাউজার-গেঞ্জি পরা অবস্থায় এক কাপড়ে বের করে দেওয়া হয় মাজহারুল ইসলামকে। সে সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেও মাদরাসাটি থেকে কাগজপত্র নিতে না পারায় সে সুযোগ হাতছাড়া হয় তার। পরে পারিবারিক সিদ্ধান্তে বেসরকারি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি।

২০১৩ সালে রাজনৈতিক হরতাল-অবরোধের কারণে সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। এতে আশপাশের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন। দূরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাজহারুল ইসলামও দুই-আড়াই মাস হলেই ছিলেন। তবে একপর্যায়ে নিরাপত্তাহীনতার কারণে হল কর্তৃপক্ষ তাদের চলে যেতে বলে। এ অবস্থায় ট্রেনে ঢাকায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ রাতের ট্রেন ধরতে আরো অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে তিনিও যান স্টেশনে। কিন্তু চট্টগ্রামের সেই স্টেশনে ট্রেনে ওঠার আগ মুহূর্তে তাকে পেছন দিক থেকে আটক করে পুলিশ। বিনা কারণে ধরে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় তাকে। একই সময় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। এর মধ্যে তার বিশ্ববিদ্যালয়েরও কয়েকজন ছিল।

আটক করেই তাকে কোতোয়ালি থানার কাস্টডিতে আটকে রাখে দুদিন। সেখানে অজু-নামাজ, গোসল ও খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কনকনে শীতে নোংরা পরিবেশ, মশার উপদ্রব আর নেশাখোরদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয় তাকে। বাইরে থেকে খাবারও দিতে দেয়নি। থানায় পৌঁছানোর পরপরই তার সঙ্গে থাকা কয়েক হাজার টাকা এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে নেয় পুলিশ। সেগুলো পরে আর ফেরত দেয়নি তারা। সেখান থেকে দুদিন পর জামায়াত-শিবিরসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংঘাতের একটি মামলা দিয়ে আদালতে ওঠানো হয় তাদের। তাদের চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

এদিকে থানায় আটকের পরপরই বিষয়টি পুলিশে কর্মরত মামাকে জানান মাজহারুল ইসলাম। তিনি ওসির সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সবাইকে ধরা হয়েছে। সংখ্যা কম হয়েছেÑআরো ধরতে হবে।

মাওলানা মাজহারুল ইসলাম বলেন, কারাগারের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। প্রথমে যেখানে রাখা হয়, তাকে আমদানি সেল বলে। ওই সেলে কেউ থাকলে এমনিতেই অসুস্থ হয়ে পড়বে। একজন হাফেজ-আলেম হিসেবে নামাজ পড়তে চাইলেও সেখানে সে রকম কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে যে খাবার দেওয়া হতোÑমোটা রুটি আর চিনি, সেগুলো খেতে পারতেন না। এতে শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। এর মধ্যে কোর্টে হাজিরার সময় এক দিন তার মাকে ফোন দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সে অনুযায়ী এক মাস কারাবন্দিত্বের পর গাজীপুর থেকে তার ভাই এসেছিলেন দেখা করতে।

কারাগারে থাকার একপর্যায়ে দেড় মাসের মাথায় হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। কাগজপত্র ও ব্যাগ নিয়ে জেল থেকে বের হলেই গেটে অপেক্ষমাণ পুলিশ চারদিকে অস্ত্র উঁচিয়ে তাকে আটক করে। গ্রেপ্তারের এই স্টাইল দেখে মন হয়, তিনি একজন বড় সন্ত্রাসী, অপরাধী। এ সময় কিছু দূরে তার ভাই এবং জামিনে সহযোগিতাকারী কয়েকজন তার গ্রেপ্তারের সেই দৃশ্য দেখলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। একপর্যায়ে তাকে কোতোয়ালি থানার একটি গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগেই মুক্তি পাওয়া আরো অনেকে ছিলেন। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সম্পূর্ণ বিনা কারণে এবং বেআইনিভাবে তাকে দুদিন সেই থানায় রাখা হয়।

তিনি বলেন, গ্রেপ্তার-নির্যাতনে নেতৃত্ব দেওয়া কোতোয়ালি থানার ওসি ছিলেন নিজামউদ্দিন। সম্প্রতি তিনি গণধোলাইয়ের শিকার হন। তিনি থানায় সবাইকে ধরে ধরে শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। রাজনৈতিক আরেকটি মামলা দিয়ে আবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মাওলানা মাজহারুল ইসলামকে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিস্ফোরক ব্যবহার-সংক্রান্ত অভিযোগ দেওয়া হয় তার মামলায়। মিথ্যা অভিযোগের এসব তাকে সহজে জামিন দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই তাদের আটক রাখা হয়েছিল বলে পুলিশ কর্মকর্তা সে সময় জানিয়েছিলেন। কারাগারে বসেই একটি সেমিস্টার পরীক্ষা দেন তিনি। তবে কারাগারের পরিবেশে থাকতে খুব কষ্ট করতে হয় তাকে। সেখানে যে কম্বল দেওয়া হয়েছিল, তা গায়ে দিলেই চুলকাতো। ঠিকমতো গোসলের সুযোগ ছিল না। প্রথমে পাঁচ-ছয় দিন পর গোসল করায় জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। চুল-নখ কাটতে না পারায় চেহারা বদলে গিয়েছিল। সেখানে বাথরুম ছিল অনেকটা আলগা। তবে একজন হাফেজ হিসেবে কারাগারে থাকার সময় বন্দিদের কোরআন পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

এভাবে দীর্ঘ ৮০ দিন কারাভোগের পর তার জামিন হয়। সব প্রস্তুতি শেষ করে কারাগার থেকে বের হলেই গেট থেকে আবার আটক করে পুলিশ। তাকে নেওয়া হয় থানায়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে সেই থানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়। তবে এই মুক্তির সময় মোবাইল, টাকা ইত্যাদি কিছুই ফেরত দেওয়া হয়নি।

তিনটি মামলা হয়েছিল মাওলানা মাজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে। পরে একটি মামলা থেকে খালাস পান তিনি। বাকি মামলাগুলোয় দীর্ঘদিন তাকে হাজিরা দিতে হয়েছে। তবে একপর্যায়ে পুলিশ সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হওয়ায় সেগুলোর গতি কমে গেছে। সেগুলো খারিজ হওয়ার পর্যায়ে আছে।

এদিকে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে গাজীপুর পুলিশের একটি গ্রুপ মাজহারুলের বাড়ি গিয়ে টাকা দাবি করেছিল। তার গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় মুক্তির পরও আতঙ্কিত থাকতেন তিনি। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি, নাম কেটে দেওয়া হতো। বাড়িতে গেলে অনেকটা লুকিয়ে থাকতেন তিনি।

২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে হেফাজতের ঘটনার রাতেও পুলিশের বীভৎস অভিযান দেখেছেন তিনি।

দিনভর ওই কর্মসূচিতে থাকার পর রাতে পুলিশি অ্যাকশনের শিকার হন তিনিও। পুলিশের ব্যারিকেডের কারণে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর নিজে ও অন্যদের জন্য শুকনো খাবার কিনতে যান কমলাপুর স্টেশন রোডে। নটর ডেম কলেজের সামনে পৌঁছাতেই লাইট অফ করে আলেম-ওলামাদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন শুরু হয়। শুরু হয় মানুষের দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকার। সে সময় তিনি পাশে একটি বাড়ির গেটের ভেতরে অবস্থান নেন। সাউন্ড গ্রেডেন, গুলি আর লাঠি পেটানোর শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে ভোরে ওই স্থান ত্যাগ করেন মাজহারুল ইসলাম।

এদিকে উত্তরায় নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় ছাত্রলীগের চাঁদাবাজির শিকার হন এই আলেম। অফিসে এসে জোরপূর্বক টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। একপর্যায়ে তাদের বেশ পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য হন তিনি। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন মাওলানা মাজহারুল ইসলাম। বর্তমানে মাদরাসা পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়ায় ইসলামিক বিষয়ে আলোচনা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন তিনি।

জেলে হত্যাচেষ্টা ও র‍্যাবের ক্রসফায়ার হুমকি

রকীবুল হক

প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, ১২: ৫২

পতিত আওয়ামী আমলে ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার হয়েছেন দেশের জনপ্রিয় আলেম ও ধর্মীয় বক্তা মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী। অন্যায়ভাবে তাকে আটকের পর ১০ দিন গুম রেখে হাত-মুখ বেঁধে নির্যাতন চালায় র‍্যাব। এ সময় ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে তিনবার কালেমা পড়ানো হয় তাকে। পরে গ্রেপ্তার-নাটক ও মিথ্যা অভিযোগে মামলা দিয়ে নেওয়া হয় সিটিটিসির রিমান্ডে। সেখানে ছিলেন সিটিটিসির এডিসি ইমরান ও আইও মিজান। বেদম পিটুনি আর কারেন্টের শকে বেহুঁশ হয়ে যান তিনি। জেলের মধ্যে হত্যাচেষ্টাসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন ঢাকার মাদরাসাতু দাওয়াতিল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাহমুদুল হাসান গুনবী।

২০২১ সালের ৬ জুলাই সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সাদা পোশাকধারী র‍্যাব সদস্যরা মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবীকে আটক করেন। এ সময় নোয়াখালীর সোনাপুরে এক ওস্তাদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই বাড়িতে হাজির হন র‍্যাব সদস্যরা। তার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাদের সঙ্গে যেতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে তারা গালাগাল শুরু করেন আর ক্রসফায়ারে দেওয়ার হুমকি দেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে তিনি তাদের সঙ্গে যান। গাড়িতে উঠিয়েই কালো কাপড় দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেন। হাতে লাগানো হয় হ্যান্ডকাফ। দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালিয়ে নেওয়া হয় ঢাকার উত্তরায় র‍্যাব-১-এর কার্যালয়ে। সেখানে ১০ দিন গুম রেখে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে চলে নির্যাতন।

র‌্যাব কার্যালয়ে নিয়েই একটি রিভলভিং চেয়ারে বসিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সব তথ্য নেওয়া। এ সময়ও তার হাত-চোখ বাঁধা ছিল। রাতে আরেকটি রুমে নিয়ে তার পাঞ্জাবি-পাজামা খুলে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরতে দেওয়া হয়। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে পাশে আরেকটি এসি রুমে নিয়ে যান তারা। সেখানে দুজন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এ সময় একদিকে হুমকি আবার আপসমূলক কথা বলেন। তারা বলেন, আপনি তো আইএসের লোক, আপনি পাকিস্তানের ফজলুর রহমানের লোক, আপনি কয়েকবার পাকিস্তান গিয়েছেন, আপনি তালেবানের সঙ্গে জড়িত, কয়েকবার আফগানিস্তানে গিয়েছেন।

জবাবে মাহমুদুল হাসান গুনবী জানান তিনি এসবে জড়িত নন। যেসব জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সেসব জায়গায় তিনি কখনো যাননি। এরপর তারা নানা হুমকি দিতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা বলেন, তুমি জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের সঙ্গে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছো, হজে গিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছো। এসবের উত্তর 'না' জানালে তারা ওইদিনের মতো জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেন। পরে তাকে নিয়ে আরেকটি রুমে রাখা হয়। যে রুমটি মাত্র ১০ পায়ের সমান লম্বা এবং ছয় পায়ের মাপে চওড়া।

সেখানে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থাতেই নামাজ পড়তে হয় তাকে। কিছু বললেই মারধর ও হুমকি দেওয়া হয়। পাশের রুমে উচ্চ শব্দে বাজানো হয় গান। শুরু হয় আরেক দফা জিজ্ঞাসাবাদ। এ সময় বলা হয়, বয়ানে একমাত্র সঠিক ধর্ম ইসলাম কেন বলেছিস? এ কথা বলতে পারবি না। তোকে বলতে হবে সব ধর্মই সঠিক। এতে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় গজারি লাঠি দিয়ে মার আর গালাগাল। বলা হয়, তুই কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত? জিজ্ঞাসাবাদকারীরা বলেন, ৫০ জন অথবা ৩০ জনের নাম বলতে। শেষ পর্যন্ত বলেন, অন্তত একজনের নাম বল, যে তোকে সরকারের বিরুদ্ধে নামিয়েছে।

এ সময় তার বিভিন্ন ওয়াজ ও খুতবার সময় দেওয়া বক্তব্যের দু-এক মিনিটের বক্তব্য শোনানো হয়। এ নিয়ে প্রশ্ন করেন, ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে আবার মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে হাতে গামছা বেঁধে ঝুলিয়ে মারা হয়। একপর্যায়ে দুই পায়ের আঙুলে কারেন্টের শক দেওয়া হয়। এতে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। জ্ঞান ফিরে দেখেন একটি রুমে রাখা হয়েছে তাকে। এ সময় পানি চাইলে দেওয়া হয়নি। বরং বলা হয়, তোর আল্লাহ তো তোকে বাঁচাচ্ছে না। এ সময় তাকে নাপা ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

এভাবে টানা ১০ দিন সেখানে গুম রেখে দুই বা তিন দিন পরপর জিজ্ঞাসাবাদের নামে চলে নির্যাতন। প্রতিদিনই একই ধরনের প্রশ্ন করা হলেও তিনি একই জবাব দেন। তাকে বলা হয়, আবু ত্বহা আদনান সব বলে দিছে, তাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তুই সব স্বীকার করলে তোকেও ছেড়ে দেব। এই জিজ্ঞাসাবাদে কোনো জবাব পছন্দ না হওয়ায় তাকে ক্রসফায়ারে দিতে শেষদিন হিসেবে কালেমাও পড়ান। এভাবে তিন দিন কালেমা পড়ানো হয় তাকে।

গুমের দশম দিনে ১৬ জুলাই রাতে তাকে জঙ্গি হিসেবে গ্রেপ্তারের নাটক সাজানো হয়। রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে তাকে মিরপুর শাহআলীতে র‌্যাব-৪-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উত্তরা থেকে তাকে হাত-চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে বেড়িবাঁধ এলাকায় আগে থেকেই অপেক্ষমাণ সাদা পোশাকধারী আরেকটি গ্রুপের কাছে তুলে দেয়।

তামান্না পার্কের বিপরীতে চায়না ফ্যাক্টরি নামে পরিত্যক্ত একটি ভবনের কাছে ওই গ্রুপ আবার পোশাকধারী আরেক গ্রুপ র‍্যাবের কাছে তাকে হস্তান্তর করে। এ সময় তাকে গাড়িতে তুলে হ্যান্ডকাফ ও চোখের কাপড় খুলে দিয়ে পিঠে একটি স্কুলব্যাগ দেওয়া হয়। সেটি নিতে রাজি না হলে অকথ্য গালাগাল করা হয়। এ সময় তার আগের পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে বলা হয়। পরে তাকে নিয়ে তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্কের বয়স্ক একজন দারোয়ানকে নিয়ে এসে একটি কাগজে তার স্বাক্ষর নিতে চায়। এতে লেখা ছিল সেখান থেকে একজন জঙ্গি পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা হয়েছে। দারোয়ান স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে তাকে ব্যাপক মারধর ও গালাগাল করা হয়। একপর্যায়ে তিনি স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হন। এর আগে আরো দুজনের স্বাক্ষর নেন তারা।

সেখান থেকে শাহআলীতে র‍্যাব-৪ অফিসে নিয়ে রাতেই প্রেস ব্রিফিং করা হয়। এ সময় তার সামনে কিছু বই রেখে ছবি তোলা হয়। হাঁটিয়ে ভিডিও করা হয়। এ সময় তাকে কোনো কথা বলতে দেওয়া হয়নি। পরে পাশে দুর্গন্ধময় একটি রুমে রাখা হয়। সেখানে র‍্যাবের লোকজন এসে মারধরের কারণে অসুস্থ অবস্থা দেখে আর কিছুই করেননি।

পরের দিন সকালে তাকে নেওয়া হয় কারওয়ান বাজার র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে। তাকে দুটি মাস্ক পরিয়ে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে চাইলেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। শুধু ফটোসেশন করে কিছুক্ষণ সেখানে রেখে বিকালে আবার শাহআলী থানায় সোপর্দ করা হয়। সেখানে উগ্রবাদে উসকানিদাতার অভিযোগ-সংক্রান্ত একটি মামলা দেওয়া হয়। পরে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। ১০ দিন পর মাহমুদুল হাসান গুনবীর সন্ধান জানতে পারে তার পরিবার। খবর পেয়ে আদালতে তার এক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

নোয়াখালী থেকে আটক ও গুম হওয়ার পর তার কোনো সন্ধান জানতে পারেনি তার পরিবার। এ সময় তারা স্থানীয় থানা ও র‍্যাব অফিসে খোঁজ করেও কোনো তথ্য পায়নি। মাইজদী ও চৌদ্দগ্রাম থানায় জিডি করার চেষ্টা করা হলেও নেওয়া হয়নি। উল্টো এসব থানার পুলিশ তার পরিবারের লোকদের ভয়ভীতি দেখায়। একপর্যায়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও দেন পরিবারের সদস্যরা।

নোয়াখালীতে হেফাজতে ইসলাম ও ওলামাদের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। কিন্তু এর পরও তার কোনো সন্ধান দেওয়া হয়নি। অথচ গুম থাকা অবস্থায় প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার পত্রিকায় গুনবী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারিতে আছে বলে খবর প্রকাশ করা হয়।

এদিকে শাহআলী থানা থেকে তাকে রিমান্ডে নিতে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আসেন। একপর্যায়ে সিটিটিসি তাকে হাত-চোখ বেঁধে তিন দিনের রিমান্ডে নেয়। সেখানে

চারতলার একটি টর্চার রুমে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এডিসি ইমরান। তাকে দু-একটা প্রশ্ন করেই অশ্লীল গালাগাল আর বেদম মারধর শুরু করেন। তাকে বলা হয়, হেফাজতের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কী? মদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করিস কেন? পর্দার কথা বলিস কেন? মোদির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিস কেন? জুনায়েদ বাবুনগরীর কাছে বাইয়াত হইছিস কেন? হারুন ইজহার, উসামার সঙ্গে কী বৈঠক হয়েছে, এ ধরনের নানা প্রশ্ন করে নির্যাতন চালানো হয়। এডিসি ইমরান নিজে মারধর করে ক্লান্ত হয়ে তার লোকদের পেটাতে বলেন। দ্বিতীয় দিনেও একইভাবে নির্যাতন চালানো হয়।

এভাবে দুই মামলায় (শেরেবাংলা নগর থানার একটি মামলায় জড়ানো হয়) তিন দফায় ৯ দিন রিমান্ডে নেয় সিটিটিসি (দাউদকান্দিতে ২০১৯ সালের একটি মামলায় জড়ানো হলেও তাতে রিমান্ডে নেওয়া হয়নি)। এর মধ্যে সাত দিন ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পেটানো হয়। এ সময় সিটিটিসির প্রধান আসাদুজ্জামান দুদিন নিজেই তাকে পেটান। এমনকি মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়।

ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন করা হলেও তিনি একই উত্তর দেন। একপর্যায়ে তার কাছ থেকে সাজানো মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে সই দিতে চাপ দেন। আইও কাজী মিজানুর রহমানও ভয়ংকর আচরণ করেন। একপর্যায়ে স্ত্রী-সন্তানের ক্ষতির ভয় দেখালে ‘উগ্রবাদে উসকানি দেওয়ার’ স্বীকারোক্তিতে সই করেন তিনি। আদালতের বিচারকও বলেন, স্বীকারোক্তি না দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর আগে রিমান্ডের শেষ দিনে এডিসি ইমরান তাকে সরকারের কথা শোনার পরামর্শ দেন আর মামলা প্রত্যাহারসহ নানা সহায়তার আশ্বাস দেন। কিন্তু সাড়া না পেয়ে জেলে পাঠান।

মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী বলেন, জেলখানা ছিল আরেক টর্চারের জায়গা। সেখানে সাধারণ থেকে বড় মাপের অপরাধীদের যেসব সুবিধা আছে, হেফাজত বা আলেম-ওলামাদের জন্য তার কিছু নেই। ২৪ ঘন্টা লকআপে বন্দি রাখা হতো। প্রায় দেড় বছর পর তিনি মোবাইলে কথা বলার সুযোগ পান। এ সময় পরিবারের কেউ সাক্ষাতে এলে তারা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। একপর্যায়ে তিনি জেলখানায় অনশন করেন।

তিনি বলেন, অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতি কাজকে উসিলা হিসেবে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারের জেল সুপার সুব্রত কুমার পাল তার ওপর ব্যাপক টর্চার চালান। এক দিন কারারক্ষী, সুবেদার, জেলের সিআইডি, বন্দি-সন্ত্রাসীদের দিয়ে ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। হাত-মুখ বেঁধে মারধর করা হয়। তিনি বলেন, তাকে মারধর, নির্যাতন ও জেলখানায় হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। একপর্যায়ে তিনি চিৎকার শুরু করলে সাধারণ কারাবন্দিরা চলে এলে রক্ষা পান। পরের দিন তাকে কোর্টে নেওয়ার কথা থাকলেও নেওয়া হয়নি। নির্যাতনকারীদের কেউ কেউ তাকে মেরে ফেলার জন্য সুব্রত নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানান।

৩২ মাস কারাভোগের পর ২০২৪ সালের ১ মার্চ জামিন পান তিনি। কিন্তু মুক্তির দিন জেলগেট থেকে আবার সিটিটিসির লোকরা ধরে নিয়ে চার দিন গুম রাখেন। সেখানে

পরিবারের কাছে ৬ লাখ টাকা দাবি করেন আইও মিজান। একপর্যায়ে ১ লাখ টাকা ও বন্ডসই দিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পরও মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবীকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দেন গোয়েন্দা সদস্যরা। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার পতনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তিনি আবার সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন।

রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের আগেই শুরু হয় পিটুনি

রকীবুল হক
প্রকাশ : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১১: ২৪

নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে আন্দোলন ঘিরে পতিত আওয়ামী সরকারের আলেম-ওলামা নির্যাতনের অন্যতম স্পট ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এ ঘটনায় একের পর এক মামলা ও হুলিয়া জারি করে গ্রেপ্তার করা হয় হেফাজতে ইসলামের সহ-প্রচার সম্পাদক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানীকে। ঘটনার সময় এলাকায় না থেকেও তৎকালীন মন্ত্রী-এমপিদের তৎপরতায় তার বিরুদ্ধে ২০টি মামলা দেওয়া হয়। এসব মামলায় দফায় দফায় রিমান্ডে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায় পুলিশ।

মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ে হাত-পা এবং চোখ বেঁধে বেদম পেটানো হয় 'মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, কসবার' চেয়ারম্যানকে। এতে বেহুঁশ হয়ে যান তিনি। কারাগারের সেলেও ১৯ মাস নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাকে। এমনকি জামিনে বিলম্ব এবং জামিন পেলেও জেলগেট থেকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারারুদ্ধ করার ঘটনাও ঘটেছে কয়েকবার। মুক্তির পরও গোয়েন্দা সংস্থার নানা হুমকি ও নজরদারিতে ছিলেন তিনি।

মোদিবিরোধী আন্দোলন ঘিরে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ও পরবর্তী কয়েক দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে স্থানীয় আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে গণহারে মামলা ও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরই অংশ হিসেবে ওই ঘটনার উসকানি ও মূলহোতা হিসেবে কাল্পনিক অভিযোগ সাজিয়ে মামলা এবং হুলিয়া জারি করা হয় মাওলানা গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানীর বিরুদ্ধে।

হেফাজতের নেতৃত্ব ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের কারণে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তাকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে এই হুলিয়া জারি করান বলে তিনি মনে করেন। সাবেক আইনমন্ত্রীর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গ্রেপ্তার এড়াতে ফেনী সদরের একটি বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবার বাসিন্দা মাওলানা ইয়াকুব ওসমানী। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে তার অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গত ৬ মে র‍্যাব ও ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইয়াকুব ওসমানী জানান, গ্রেপ্তারকালে তিনি ইফতার করার জন্য সময় চাইলেও তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাকে বলা হয়, ওপরের নির্দেশে তাকে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সবচেয়ে বেশি আলেম-ওলামা নির্যাতনকারী হিসেবে পরিচিত ডিবির ওসি লোকমানের নেতৃত্বে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে তাকে নেওয়া হয় ফেনী ডিবি অফিসে। সেখানে মাগরিবের নামাজ শেষে তাকে নিয়ে রাত ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিবি অফিসে পৌঁছায় তারা। সেখানে তাকে হস্তান্তর করে গ্রেপ্তারকারী দল চলে যায়। তখন দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার দোয়া পড়তে বলে তাকে জানান, সারারাত সেখানে গ্রেপ্তার আলেমদের পেটানো হয়েছে। পা উল্টোদিকে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে অনেকের। আমাদের কিছু করার নেই, বড় অফিসাররা এই নির্যাতন করেন।

পরের দিন সকালে তাকে প্রথম দফায় পাঁচটি মামলায় জড়িয়ে আদালতে নেওয়া হয়। আদালত থেকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হলে তাকে পাঠানো হয় জেলহাজতে। সেখান থেকে পরের দিন ডিবির রিমান্ডে আনা হয়। সেখানে নিয়েই তার হাত-পা এবং চোখ বেঁধে ফেলে। এরপর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই শুরু হয় বেদম মারধর। কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই নির্যাতন শুরুর কারণ জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্য ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, ‘তোকে শেষ করে দিতে ওপরের নির্দেশ আছে। তোকে শেষ করলে আমাদের প্রমোশন হবে।’ এ সময় শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগালের মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করা হয় বেশি। তারা বলেন, তোরা সরকার উৎখাত করবি, হেফাজত সরকার গঠন করবি? তোকে কোন মন্ত্রণালয় দেওয়া হবে? এসব কথা বলে নির্যাতন চালাতে থাকে। এতে বেহুঁশ হয়ে যান তিনি।

গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানী বলেন, রিমান্ডে সাধারণত সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে কোনো জিজ্ঞাসা না করেই নির্যাতন শুরু করা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলÑবিভিন্ন সরকারি অফিসে জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করা। রিমান্ডে নির্যাতনের একপর্যায়ে তাকে বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করে পুলিশ। টাকা দিলে নির্যাতন কম হবে বলে জানানো হয়। সে সময় তার সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দেখা করাও সহজ ছিল না। কারণ তার পরিবারের সবাই আলেম ও পর্দানশিন। সে সময় টুপি-দাড়ি দেখলেই গ্রেপ্তার করত পুলিশ। যতটুকু সম্ভব তারা এসে দেখা করতেন। তবে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েও শারীরিক নির্যাতন থামায়নি।

রিমান্ডে তাকে জিজ্ঞাসা করা হতো, সরকার উৎখাত করতে কত টাকা, কোথা থেকে কার মাধ্যমে পেয়েছিস? মামুনুল হকের সঙ্গে যোগসাজশ আছে কি না? বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে গোপন কোনো বৈঠক হয়েছে কি না? বাবুনগরীকে কে শেল্টারিং করে? কওমি মাদরাসায় জঙ্গি ও সন্ত্রাসী আছে কি না? অস্ত্র কোথা থেকে আসে ইত্যাদি। তিন দফায় ডিবি,

থানা-পুলিশ এবং পিবিআই মিলে ১১ দিনের রিমান্ডে ছিলেন তিনি। সবাই একই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এভাবে নির্যাতনের পরও কোনো মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেননি তিনি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলোÑসে সময় পুলিশ মিডিয়ায় প্রচার করে, মাওলানা গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব ওসমানী জ্বালাও-পোড়াওয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। অথচ সবটাই মিথ্যা এবং সাজানো স্বীকারোক্তি।

ইয়াকুব ওসমানী বলেন, ইসলামি অনুভূতি যেমনÑআল্লাহু আকবার তাকবির ধ্বনি, বিসমিল্লাহ বলা বা আলেম-ওলামাদের অনুসরণ করাÑএসব বিষয় নিয়ে পুলিশ বেশি তাচ্ছিল্য ও কুৎসামূলক। আল্লাহু আকবার ধ্বনি আর বাংলাদেশে চলতে দেওয়া হবে নাÑএমন কথা বলে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মডেল থানার তৎকালীন সেকেন্ড ওসি এ কথাগুলো বলতেন। এই ওসির বাড়ি গোপালগঞ্জে। রিমান্ডে নিয়ে একবার বলা হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আল্লাহু আকবারের দিন শেষ। আল্লাহু আকবার ধ্বনি আর উচ্চারণ করতে দেওয়া হবে না। সেখানে পেছন দিক থেকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিত। পায়ের গোড়ালি ও পাতায় রুল দিয়ে জোরে আঘাত করা হতো। এই আঘাতের ব্যথা মাথা পর্যন্ত অনুভূত হতো। এ সময় অন্য একজন আলেমকে উল্টো করে ঝুলিয়ে পায়খানার রাস্তায় মোম গলিয়ে ফেলা হয়। তার সামনে আরেকজন হাফেজকে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফ্লোরে ফেলে বুট দিয়ে মুখে চাপ দিয়ে জিহ্বা বের করা হয়।

রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হলে সেখানেও তাকে নির্যাতনের চরম মাত্রা সহ্য করতে হয়। তাকে একটি সেলে আবদ্ধ করে বাইরের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার অজুহাতে তাদের সেলের বাইরে বের হতে দেওয়া হতো না। কারারক্ষীরা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন, তারা কোনো কথা বলতেন না। জেলের মধ্যে যে ক্যানটিন আছে, খাবার কিনে খাওয়া যায়Ñএটাও জানতে দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হতো। সেখানে দিন না রাত তা বোঝার কোনো সুযোগ ছিল না। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সঙ্গে যখন মোবাইলে কথা বলতে দেওয়া হতো, তখন পাশেই কারারক্ষীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। এতে মামলা বা অন্য সমস্যা নিয়ে কোনো কথা বলা যেত না। এভাবে অমানবিক আচরণ করা হয়। ওরা তাদের উন্মাদ বানিয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল বলে তিনি মনে করেন। একমাত্র আল্লাহর দয়ায় তারা বেঁচে আছেন।

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোনো সুযোগ-সুবিধা তাদের ভোগ করতে দেওয়া হয়নি জানিয়ে এই আলেম বলেন, প্রত্যেক আসামির মামলা অনুযায়ী জামিনের যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু আদালত এমন প্রহসনেরও কুক্ষিগত ছিল যে, হেফাজতের মামলা দেখলেই ফাইল ছুড়ে ফেলত। ন্যায়বিচার পাওয়ার চেয়ারগুলো থেকেই তাদের নিয়ে কুৎসা করা হতো। অনেক কষ্টে কোনো মামলার জামিন হলেও মুক্তি দেওয়া হতো না। জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার করা হতো। ৯ মাস কারাভোগের পর দুটি মামলায় এবং পরের মাসে আরো তিনটি মামলায়

জামিন দেয় আদালত। তবে বের হওয়ার সময় কারা কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে জানায়, আপনার নামে মামলা আছে, বের হওয়া যাবে না। সব মামলায় জামিনের কথা বললে তারা জানায়, নতুন মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে। এভাবে তিন থেকে চারবার জামিনে মুক্তির সময় জেলগেট থেকে ফেরত দিয়ে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। একে একে তার মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টিতে। মামলাগুলোর মধ্যে ছিল-পুলিশের কাজে বাধা প্রধান, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট, জঙ্গিবাদে উসকানি দেওয়া ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিন দিন বিক্ষোভের সময় তিনি কুমিল্লার দেবিদ্বারে ছিলেন। গোয়েন্দাদের কাছেও সে তথ্য আছে। এরপরও ওই ঘটনার উসকানি ও অর্থদাতা হিসেবে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাবেক এমপি উবায়দুল মুক্তাদিরের নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে হাফেজ মাসুদকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় তাকে আসামি করা হয়। এমনকি ২০০১ সালের একটি মামলায়ও তাকে জড়ানো হয়। প্রত্যেকটি মামলা ছিল মিথ্যা, কাল্পনিক এবং বানোয়াট। সর্বশেষ ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর তার মুক্তি হয়। তবে ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত মামলাগুলোয় হাজিরা দিতে অধিকাংশ সময় কাটত আদালতের বারান্দায়। বর্তমানে মামলাগুলো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলছে।

কারা নির্যাতনের পাশাপাশি তার পরিবার ও তাকে আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রশাসন। তার পরিবারকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়। ব্যক্তিগত গাড়িটিও ভেঙে তছনছ করে দেয়।

এদিকে মুক্তির পরও গোয়েন্দা সংস্থার হুমকি ও নজরদারিতে থাকতেন ইয়াকুব ওসমানী। এক ওয়াজ মাহফিলে তার ওপর নির্যাতনের বিষয় তুলে ধরলে পরে ডিজিএফআই থেকে তাকে ফোন দিয়ে গুম করার হুমকি দেওয়া হয়। এ ছাড়া আরেক দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক এমপি উবায়দুল মুক্তাদিরের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ায় তাকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছিল পুলিশ। পরে তিনি কুমিল্লায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। দেবিদ্বারের বায়তুল আজগর সাত গম্বুজ জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্বে আছেন তিনি।

মাহফিল থেকে ফেরার পথে গাড়িসহ গুম

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২: ১৫

ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে গোয়েন্দাজালে পড়েন মুফতি নাছির উদ্দিন খান। মাহফিল শেষে বাসায় ফেরার পথে গাড়িসহ গুম করে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। চার দিন গুম রেখে ক্রসফায়ারের হুমকিসহ নানাভাবে নির্যাতন শেষে হেফাজতের পুরোনো একটি মামলায় নেওয়া হয় রিমান্ডে। সেখানে মানসিক হয়রানির একপর্যায়ে পাঠানো হয় জেলে। জামিন পেতে গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে রাজনীতি ছাড়াসহ নানা প্রস্তাব দেওয়া হয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের এই সহ-সাংগঠনিক সম্পাদককে। পরিবারের সদস্যদেরও নানাভাবে ভয়ভীতি ও চাপ দেয় তারা। এভাবে কোনো কারণ ছাড়াই আওয়ামী সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়ে পৌনে চার মাস জেলে বন্দি জীবন কাটাতে হয় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ গাজীপুর জেলার এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে।

বিগত সরকারের জুলুম-নির্যাতনের অংশ হিসেবে দেশের শীর্ষ আলেমদের বেশিরভাগই তখন ছিলেন জেলে। এমনই সময় ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি গাজীপুরের ভবানীপুর বাজারসংলগ্ন একটি মাদরাসায় ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছিলেন জবেদা খাতুন দারুল উলুম মাদরাসার মুহতামিম মুফতি নাছির উদ্দিন খান। ওই মাহফিল ঘিরে দুপুর থেকেই সেখানে গোয়েন্দা নজরদারি ছিল। মাহফিল শেষে তিনজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে ফিরছিলেন গাজীপুর শহরের বাসায়। কিন্তু ফেরার পথে মাদরাসা রোড থেকে ভবানীপুর ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তার গাড়ি গতিরোধ করে সাদা পোশাকধারী একদল পুলিশ। সাদা মাইক্রো থামিয়ে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করা হয়। হর্ন বাজালেও তারা সরেনি। একপর্যায়ে গাড়ি থামাতেই ওই সাদা মাইক্রোবাস থেকে সাত থেকে আটজন নেমে তার গাড়ি ঘিরে ধরে। গ্লাস নামিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে একজন ডিবির মতিঝিল জোনের প্রধান দাবি করেন। তারা তাদের সঙ্গে যেতে বলেন এই

আলেমকে। এ সময় তিনি তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তারা তা দেখান। এ সময় তাদের কোমরে রাখা পিস্তল দেখা যাচ্ছিল। সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা তার গাড়িতে উঠে ঢাকার দিকে রওনা করেন। অন্য তিন আলেমকে সেখানেই নামিয়ে দেওয়া হয়।

সামনে-পেছনে ডিবির গাড়ির পাহারায় নিজের গাড়ি চালাচ্ছিলেন মুফতি নাছির উদ্দিন। গাজীপুর পৌঁছে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি অসুস্থতা অনুভব করে গাড়ি চালাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তাকে ডিবির গাড়িতে নিতে বলেন। কিন্তু তারা তাতে রাজি হননি। একপর্যায়ে রাত পৌনে ১২টার সময় টঙ্গী চেরাগ আলীতে হেফাজতে ইসলামের গাজীপুর নেতা মাসুদুর রহমানের মাদরাসায় গাড়িটি রেখে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু তাতেও তারা রাজি না হয়ে রাত সোয়া ১টার দিকে মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ের মতিঝিল জোনাল অফিসে নেওয়া হয় তাকে। গাড়িটি একপাশে ঢুকিয়ে তাকে একটি রুমে বসানো হয়। ডিবির মতিঝিল জোনাল টিমের প্রধান আফছারুজ্জামান তাকে আটক অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

ডিবির যে রুমে তাকে রাখা হয়েছিল, সেখানে লাঠি, প্লায়ার্স, বৈদ্যুতিক তারসহ নির্যাতনের জিনিসপত্র দেখা যায়। সেখানে তাকে খাবার দিতে চাইলে তিনি তা খাননি। তার এলাকার পরিচিত হিসেবে ডিবিপ্রধান হাফিজ আখতারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সেই সুযোগ দেননি তারা। তাকে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে একটি লকআপের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাহারায় ছিলেন তিনজন। শীতের সেই রাতে তাকে একটি কম্বলও দেওয়া হয়। তবে তিনি নিরাপত্তা শঙ্কায় কম্বল না নিয়ে নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম না আসায় রাত ৩টার দিকে তিনি অজু করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন। পরে ফজরের পর কিছুটা ঘুম দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একের পর এক অফিসার এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তারা বলেন, সব আলেম মোবাইল বন্ধ করে পালিয়ে গেলেন, আপনার খুঁটির জোর কোথায়? আপনি আলেমদের মুক্ত করতে আদালতে আদালতে ঘোরার এই সাহস কোথা থেকে পান? স্বাধীনতাযুদ্ধে আপনাদের দলের ভূমিকা কী ছিল?

এ সময় তার মামলার আইও ডিবির এসআই মালেক তাকে তুই-তোকারি করে বলেন, যা মন চায় খেয়ে নে। কাল তোর ক্রসফায়ার দেওয়া হবে। তোর আল্লাহ তোকে বাঁচায় কি না? নির্যাতনের জন্য ধর্মেন্দু নামের একজন অফিসারকে ডাক দেওয়ার ভয় দেখান তিনি। এর আগে অনেক আলেম-ওলামাকে নির্যাতন করেছেন ধর্মেন্দু। এভাবে ৯ তারিখ পর্যন্ত সেখানে গুম রাখা হয়। এ সময় দফায় দফায় চলে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নির্যাতন। তাকে ক্রসফায়ারে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

এ সময় পরিবারের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি। পাঁচ মাসের ছোট বাচ্চাকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েন। তারা গাজীপুর থানা, এসপি অফিস, সিটি পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে গিয়ে সন্ধান চাইলে কোনো সহযোগিতা করেননি। প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে গেলে তারাও কোনো তথ্য জানাতে পারেননি।

এদিকে ডিবিতে চার দিন গুম রেখে নির্যাতনের পর ৯ জানুয়ারি নেওয়া হয় পল্টন থানায়। সেখানে ২০২১ সালের ৮ এপ্রিল হেফাজতের ঘটনায় পল্টন থানায় করা একটি মামলায়

গ্রেপ্তার দেখানো হয় মুফতি নাছির উদ্দিন খানকে। তাকে কোর্টে নিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। কোর্টে আসার আগেই এক ফাঁকে আত্মীয়স্বজনকে খবর দেন তিনি। এ জন্য তাদের অনেকে কোর্টে হাজির ছিলেন। তবে তাদের সঙ্গে কিছু সময় কথা বলা ও কাপড় নেওয়ার চেষ্টা করলেও সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। একপর্যায়ে আদলতের বিচারকের অনুমতি নিয়ে নিজের অবস্থান-মর্যাদা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। এ সময় গুম-গ্রেপ্তার-নির্যাতন বিষয়ে কথা বলেন মুফতি নাছির উদ্দিন। আদালত তাকে এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এদিকে আদালত থেকে পুলিশের গাড়িতে ফেরার সময় তাকে দুজনের মাঝখানে বসতে দেন। সামনে ড্রাইভারের পাশে এসআই মালেক এবং পেছনের সিটে আরো দুজন ছিলেন। এ সময় তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও হুমকি-ধমকি দেন এসআই মালেক। বিশেষ আদালতে বিচারকের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ার কারণে তিনি রেগে যান। রিমান্ডের এক দিনে নির্যাতনের হুমকি দেন তিনি। এ সময় মুফতি নাছির উদ্দিন তাকে বলেন, 'আমরা কোনো খুন করে এখানে আসিনি। আমরা রাজবন্দি। আমাদের সঙ্গে এ রকম আচরণ করতে পারেন না। এ সময় তিনি কোমর থেকে পিস্তল বের করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন।'

ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে নিচতলার জানালাবিহীন একটি রুমে ঢোকায় তাকে। সেখানে দিন-রাত কিছু বোঝা যেত না। খাবার দিতে এলে তার কাছে সময় জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী নামাজ পড়তেন তিনি। সেখানে এক-দুই মাস ধরে আটক থাকা অনেকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিবারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে ডিবির রিমান্ডে দুই রাত এক দিন রেখেও কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি মুফতি নাছির উদ্দিনকে। সেখান থেকে আদালতের মাধ্যমে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানেই পৌনে চার মাস কাটাতে হয় তাকে। জেলে ২৪ ঘন্টা লকআপে রাখা হয়। এতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। খাবার খেতে পারতেন না। কোনো কারারক্ষী তার সঙ্গে কথা বললে তার শাস্তি হতো। মশার কামড়ে তার সারা শরীর জর্জরিত হয়ে যায়।

এ সময় জামিনের জন্য তার বাবা-ভাইয়েরা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে এনএসআইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। গাজীপুর এনএসআই থেকে সেন্ট্রালে যেতে বলা হয়। ঢাকায় এনএসআইয়ে হেফাজতের ফাইলগুলো দেখতেন কর্নেল মেজবাহ। তার সঙ্গে ছিলেন মোরশেদ আলম ও ডিবির নুরুল আলম মামুন। তখন তারা মুফতি নাছির উদ্দিনকে রাজনীতি না করার অঙ্গীকার দিতে বলেন। তাহলে জামিনের আশ্বাস দেওয়া হয়। অন্যথায় জামিন দেওয়ার কোনো ক্ষমতা কোর্টের নেই।

জেলে থাকা অবস্থায় পরিবারের সঙ্গে কোনো সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না তার। বাইরে থেকে কোনো খাবার পাঠানো যেত না। কেউ সাক্ষাতের চেষ্টা করলে তাদের সঙ্গে জঙ্গি-সন্ত্রাসীর মতো আচরণ করা হতো। দীর্ঘদিন পর মাসে একবার করে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। সে সময় এনএসআইয়ের সেই প্রস্তাবের কথা শুনে তাতে কোনো সাড়া দেননি মুফতি নাছির উদ্দিন। এ জন্য সারাজীবন জেলে থাকতেও প্রস্তুত তিনি। তবে তার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই তার ছোট ভাই রাজনীতি ছাড়ার বিষয়ে এনএসআইকে আশ্বাস দিলেও একবার শুনানিতে

নানা অজুহাতে তার জামিন হয়নি। কয়েকবার শুনানি করেও জামিনে ব্যর্থ হন তিনি। একপর্যায়ে পৌনে চার মাসের মাথায় জজ কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

এদিকে কারারুদ্ধ সন্তানের চিন্তায় তার ৭৫ বছর বয়সি বাবা স্ট্রোক করেন। একপর্যায়ে তার মুক্তির পর হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এর দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। নাছির উদ্দিন খান জানান, মুক্তির সময় আবার গ্রেপ্তারের শঙ্কায় ছিলেন তিনি। কারণ এর আগে ২০১২ সালে কিশোরগঞ্জে রাষ্ট্রদ্রোহির অভিযোগে একটি মামলায় তাকে জড়ানো হয়। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সাজার রায়ের সময় সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে একটি মামলা দেওয়া হয়। অথচ সে সময় তিনি ওমরাহ পালনে সৌদি আরবে ছিলেন। মুক্তির পরও সার্বক্ষণিক নজরদারিতে ছিলেন তিনি। এমনকি পল্টন থানার মামলায় দীর্ঘদিন হাজিরা দিতে হয়েছে। এখনো সেটি প্রত্যাহার করা হয়নি। বাকিগুলো আগেই শেষ হয়েছে।

কারাগারে নানা কষ্টে থাইরয়েডসহ বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হন তিনি। এ জন্য মুক্তির পর হাসপাতালে ভর্তি হন এই আলেম। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা শেষে বাসায় ফেরেন তিনি। এ সময় কোনো কর্মসূচি থাকলেই তাকে ফোন দিয়ে নানাভাবে হয়রানি করত এনএসআই ও এসবির লোকরা। তার পরিবারের লোকজন বিশেষ করে ছোট ভাই মাওলানা নাছিমকে বেশি হয়রানি করা হয়েছে। একপর্যায়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

গত ১৬ বছরে প্রায় সময় ওমরায় সৌদি আরবে থাকতেন মুফতি নাছির উদ্দিন। দেশে এসে স্বস্তিতে থাকতে পারতেন না। তার হজ এজেন্সিসহ কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তার শ্বশুরকেও নানাভাবে হয়রানি করা হয় গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে। বাড়ির কাছে একটি মাদরাসা বানিয়েও তা চালু করতে দেয়নি স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকরা। সম্প্রতি সেটা চালু করেন তিনি। এভাবে পদে পদে হয়রানির শিকার হয়েছেন তিনি।

কোরআন ক্লাস থেকে অস্ত্র মামলায় জেলে

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৬: ২১
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০: ০৭

সেই সময় চলছিল শেখ হাসিনার উন্মত্ত শাসন। একদিন মসজিদের ইমামদের নিয়ে কোরআন ক্লাস পরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করছিলেন ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী। সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর চলে নির্যাতন। এভাবে বারবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। কোনো একটি মামলায় জেল খেটে জামিনে মুক্তি পেলেও নতুন করে গ্রেপ্তার-নির্যাতনের আতঙ্ক সব সময় তাকে তাড়া করত। তার পেছনে লেগে থাকত গোয়েন্দারা। শুধু তিনি একা নন, তার কারণে তার পরিবারও শিকার হয়েছে হাসিনা সরকারের নিপীড়নের। এমনকি গ্রামে তার ভাইরাও বাদ যাননি। এক ভাই জেল খেটে বের হলে আরেক ভাইকে গ্রেপ্তার করা হতো।

তার ওপর হাসিনা সরকারের এত ক্ষোভের কারণ কী?

সহযোদ্ধা আলেমরা বলছেন, দেশে ইসলাম ও ধর্মবিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে রাজপথে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পাশাপাশি আলেম-ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজেও বেশ সক্রিয় ছিলেন সম্মিলিত ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের আহ্বায়ক মাওলানা খলিলুর রহমান। এসব ভূমিকার কারণে হাসিনা সরকারের ১৫ বছরে বানোয়াট মামলা, দফায় দফায় কারাবন্দি, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার নানা হয়রানিসহ চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি।

তবে আলেমদের ওপর আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম-নিপীড়নের মধ্যেই সারা দেশের ইমাম-খতিবদের নিয়ে সাধ্যমতো কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সেক্রেটারি জেনারেল তরুণ এই আলেম।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতি পুরো পাল্টে যাওয়ায় তিনি এখন মুক্ত নাগরিকের জীবনযাপন করছেন। তবে বিগত ১৫ বছরের সেই ভীতিকর পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে এখনো আতকে ওঠেন মাওলানা খলিলুর রহমান। জুলুম-নিপীড়নের সেই দিনগুলোর কিছু কথা তিনি জানিয়েছেন আমার দেশকে।

হাসিনা সরকারের সময় দেশের আলেম-ওলামাদের নির্যাতন প্রসঙ্গে রাজধানীর তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার নবনিযুক্ত প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান বলেন, ‘সে সময় সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন আলেমরা। তারা নিজ ঘরে শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না, প্রতিষ্ঠানে যেতে পারতেন না। তারা কুরআন তালিম ক্লাসে বসলেও জঙ্গি মিটিং বলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হতো-তারা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাস্তাঘাট ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে যখন-তখন আটক করে ভুয়া মামলায় জড়ানো হতো। এমনকি

মুসলিম বিশ্বের কোনো সংকট বা ইসলামি ইস্যুতে আলেমরা মিছিল করতে গেলেও পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ, গ্রেপ্তার, বানোয়াট মামলাসহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আলেমরা। ইসলাম ও দেশবিরোধী ইস্যুতে সোচ্চার থাকার কারণে দেশের শীর্ষ ও প্রবীণ আলেমদের জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। বহু আলেম-ওলামা শহিদ হয়েছেন। অনেকে আহত হয়েছেন। শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে নিরীহ আলেম, মাদ্রাসাশিক্ষার্থী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের বিভৎসতা জাতি কোনোদিন ভুলবে না। '

নিজের গ্রেপ্তার-নির্যাতনের দুঃসহ স্মৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, '২০১০ সালের ১০ জুলাই কুরআনবিরোধী নারী নীতি ও ইসলামবিরোধী শিক্ষানীতি সংশোধনের দাবিতে সম্মিলিত ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের পক্ষ থেকে গণসমাবেশ ডাকা হয়েছিল পল্টনের স্টেডিয়ামে। কিন্তু পুলিশ আমাদের সমাবেশ করতে না দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে। পরে আমরা মুক্তাঙ্গনে জড়ো হয়ে প্রেস ক্লাবের দিকে মিছিল নিয়ে গেলে সেখানে বাধা দেওয়া হয়। সেখান থেকেই পরের দিন হরতাল ঘোষণা করা হয়। আর সেই হরতালের পক্ষে মাঠে নামতেই পল্টন এলাকা থেকে মাওলানা আব্দুর রব ইউসূফীসহ কয়েকজন আলেমের সঙ্গে আমাকেও টেনেহিঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তুলে পল্টন থানায় নেওয়া হয়। সেখানে মিডিয়াকর্মীরা উপস্থিত হলে আমাকে পুলিশ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সারা দিন চিকিৎসা দিয়ে আবার থানায় নিয়ে এসে সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেয় পুলিশ।'

২০১৭ সালে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করা হয় মাওলানা খলিলুর রহমানকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঢাকায় কুরআন ক্লাস পরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ঘরোয়া বৈঠক চলাকালে কদমতলী থানা পুলিশ আমাদের ঘেরাও করে। তখন বেশ কয়েকজন আলেম ও ইসলামি দলের শীর্ষ নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আমাদের বিরুদ্ধে দেশীয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত বানোয়াট মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।'

আলামত হিসেবে দেখানো হয় আমাদের কাছে থাকা মোবাইল ফোনকে। রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানির শিকার হই আমরা। তবে আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে আনা পুলিশের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। প্রায় দুই মাস অন্যায়ভাবে জেল খাটার পর জামিনে মুক্তির সময় আমাদের রিঅ্যারেস্ট দেখায় পুলিশ। যদিও নতুন মামলায় যে সময়ের কথা বলা হয় তখন আমি হজে ছিলাম। তাই একদিনের পর আমরা মুক্তি পাই। তিনি বলেন, 'জামিনে মুক্তি পেলেও গ্রেপ্তার-নির্যাতনের আতঙ্ক আমার পিছু ছাড়েনি। সব সময় আমার পেছনে গোয়েন্দারা নজরদারি করতো। বাসা-অফিস সবখানেই পুলিশের আনাগোনা থাকতো।'

পরের বছর ২০১৮ সালে বরিশালে মসজিদ মিশনের একটি মিটিং থেকে একইভাবে গ্রেপ্তার হন মাওলানা খলিলুর রহমান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মসজিদ মিশনের আঞ্চলিক নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক চলাকালে পুলিশ আমাদের আটক করে। পরে সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা ও গুদামে হামলার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত একটি বানোয়াট মামলায় কারাগারে পাঠানো হয় আমাকে। সেবারও বিনা অপরাধে প্রায় দুই মাস জেলে কাটাতে হয়। এর মাঝে ছয় দিন

রিমান্ডের নামে হয়রানির করা হয়। এ সময় থানায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। আর এই কাজে নেতৃত্ব দেওয়া পুলিশের দারোগা আরাফাত পরে জুলাই আন্দোলনে আশুলিয়া এলাকায় শিক্ষার্থী হত্যা ও লাশ পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে জানতে পারি।'

শুধু নিজেই জেল-জুলুমের শিকার হননি মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী। তার পরিবারেও নেমে আসে অত্যাচার-নির্যাতন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গ্রামে আমার ভাইয়েরা কেউ বাড়িতে থাকতে পারতেন না। এক ভাই জেল খেটে বের হলে আরেকজনকে নেওয়া হতো। আমার বাবা-মা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। ঢাকায় আমার বাসায় পুলিশ দফায় দফায় হানা দিয়েছে। বিশেষ করে কোনো আলেম গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা বললেই পুলিশ আমার বাসায় গিয়ে তছনছ করেছে। মাঝে মাঝে যৌথ বাহিনী আমার বাসা গিয়ে সারা রাত বসে থাকতো। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিতো। আমার পরিবারের সদস্যদের মোবাইল নিয়ে যেত। আমার স্ত্রী-সন্তানরা অনেকটা জিম্মি হয়েছিল।'

আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী ভূমিকা প্রসঙ্গে মাওলানা খলিলুর রহমান বলেন, 'ইসলাম ও দেশের আলেম-ওলামাদের প্রতি শেখ হাসিনার সরকার দরদের কথা বললেও বাস্তবে ইসলাম চর্চা ও ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। নানা বাধা-বিঘ্নের শিকার হয়েছেন আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। ইসলামি আন্দোলন ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হেয় করার কৌশল হিসেবে আলেম-ওলামা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জঙ্গি বা ধর্মান্ধ বলে অভিযোগ করা হতো। মূলত, এ দেশে ইসলামের দাওয়াতি কাজকে বাধাগ্রস্ত করতেই দুশমনরা এসব বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করতো। দুঃখের বিষয় হলো এসব কর্মকাণ্ডে নামধারী কিছু আলেম-ওলামা আওয়ামী লীগ সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন।'

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার জয়নগর গ্রামে ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা খলিলুর রহমান। তিনি ফাজিল ও কামিল পাস করেন তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে। এরপর সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করে দেশে ফিরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। খুলনা নেছারিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করলেও পরে যোগ দেন আশুলিয়ার তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায়। সেখানে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর সম্প্রতি প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

বর্তমান জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তিনি বলেন, 'গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জালেম ও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের পর দেশের পরিস্থিতি পুরো পাল্টে গেছে। এখন আল্লাহর রহমতে আমাদের চলাফেরা ও কাজকর্মে কোনো বাধা-বিঘ্ন নেই। অফিস ও বাসায় নেই পুলিশ ও গোয়েন্দা হয়রানি। স্বস্তিতেই দিন কাটাতে পারছি।'

মাওলানা খলিলুর রহমানের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব ও খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী বলেন,

আলেম-ওলামাদের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে পুলিশি হয়রানিসহ নানা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি।

ডিবিতে বর্বর নির্যাতন চালায় হিন্দু অফিসার

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২: ১০

আধুনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানে সমান পারদর্শী মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইবরাহীম। ওয়াজ মাহফিলের মঞ্চ থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া এবং গণমাধ্যমে ধর্মীয় আলোচনা করে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছেন। গড়েছেন হাজারো মক্তবসহ আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর এ কারণেই আওয়ামী সরকারের টার্গেটে পড়েন বরেণ্য এই আলেম। তার মক্তব-স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্বাভাবিক কাজে নানাভাবে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির পাশাপাশি নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারিতে থাকতেন তিনি।

গাড়িতে গুলি ও চাপা দিয়ে দুবার হত্যাচেষ্টার মুখোমুখি হন মুফতি ইবরাহীম। এরপরও ধর্মীয় তৎপরতা ঠেকাতে না পেরে একপর্যায়ে রাতের আঁধারে বাসা থেকে বিনা অপরাধে তাকে আটক করা হয়। একে একে দেওয়া হয় চারটি মামলা। ডিবিতে প্লাস ও চাকু দিয়ে হাত

ও পায়ের আঙুলে নির্মম নির্যাতন করে এক হিন্দু অফিসার। পাঁচ দিন রিমান্ডসহ দীর্ঘ ১৬ মাস কারাগারের ফাঁসির সেলে কাটান মুফতি ইবরাহীম।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালানো শেখ হাসিনার সরকারের সময় এভাবেই জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন মুফতি ইবরাহীম। নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের সদস্যরা। কারামুক্তির পরও স্বস্তিতে ছিল না তার জীবনযাত্রা। কিছুদিন আত্মগোপনে থাকার পর অনেকটা নীরবে দেশত্যাগে বাধ্য হন পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও আল-জামেয়া ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মুফতি ইবরাহীম। জুলাই বিপ্লবের পর সম্প্রতি তিনি দেশে ফেরেন। বর্তমানে তিনি লালমাটিয়ায় অ্যাভেরোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমার দেশ-এর কাছে জেল-জুলুমের সেই ভয়াবহ স্মৃতি তুলে ধরেছেন তিনি।

মুফতি ইবরাহীম বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট রেজিমে দেশের আলেমরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। তাদের রাজনৈতিক কোনো অধিকার ছিল না। কোনো আলেম রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিষয়ক ভূমিকায় থাকলে শত শত মামলা দিয়ে তাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ কোনো স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) বৈঠকে বসলেও গোপন সংবাদের কথা বলে তাদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী বা নাশকতার কথা বলে আটক করে পুলিশ। সে সময় মিডিয়া তথ্যসন্ত্রাসের মুখোমুখি হন আলেমরা। এমনকি মা-বোনরা কোথাও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বসলেও তাদের ধরে নিয়ে থানা-হাজতে নির্যাতন করা হয়েছে। সেখানে আলেমদের স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়স্বজনরা আক্রান্ত হয়েছেন। জঙ্গির বিষয়টি ছিল শতভাগ কিস্যা কাহিনি। এটা করে তারা ইসলামি শক্তিকে উৎখাত, কলঙ্কিত ও অপমানিত করে জঙ্গি ট্যাগ দিয়ে নিস্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

তিনি বলেন, আধিপত্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল আলেমরা যেন এখানে জনপ্রিয় হতে না পারেন। কারণ তারা জানত যে দুটি শক্তি এই বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারে। একটি হলো সেনাবাহিনী, আরেকটি হলো ইসলামপ্রেমিক মানুষের জাগরণ। তাই ইসলামি ব্যক্তি, দল ও সংস্থাকে দমনে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বক্তাদের একটি লিস্ট করে ডিবিতে প্রত্যেকের নামে আলাদা বাক্স রাখা হতো। সেখানে আমলনামার মতো তাদের বক্তব্যে দোষ-ত্রুটি ধরে ঘায়েল বা ধরপাকড়ের জন্য মনিটরিং করা হতো।

পতিত আওয়ামী সরকারের সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বাধা প্রসঙ্গে মুফতি ইবরাহীম বলেন, 'আমি সারা দেশে ছয় হাজার মক্তব চালাতাম। এসব মক্তবের কাজে যেখানেই যেতাম, দেখতাম ১১/১২ জন অচেনা মুখ আমাকে ফলো করত। পরীবাগে একটি মক্তবে প্রতি মাসে আলেমরা আসতেন মক্তব পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করতে। হঠাৎ একদিন সেখানে পুলিশ ঘেরাও করে। বাংলাদেশের ১৩৫০ বছরের ইতিহাসে মক্তবে নির্যাতনের কোনো তথ্য আমার জানা নেই। কারণ সেখানে আলিফ-বা-তা-ছা পড়ায়। তবে আওয়ামী আমলে সেই মক্তবও ঠিকমতো চালাতে পারিনি। এ জন্য অনেক নির্যাতিত হয়েছি, পুলিশের মামলা-হামলা সয়েছি। মক্তবগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় হাজার হাজার শিশু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়।'

তিনি বলেন, ‘আইসিটি আইনে আলেমদের যখন-তখন ধরে নিয়ে ডিবিতে নির্যাতন করা হতো। একজন আলেমের পা বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে নির্যাতন করতে দেখেছি। জেলখানায় আমার সঙ্গে ছিলেন হেফাজত নেতা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। তাকে এত নির্যাতন করা হয়েছে যে তার কোমরের সাইডে কোনো মাংস ছিল না। পেছনে হাত বেঁধে একনাগাড়ে ছয় দিন তাকে নির্যাতন করেছে।’

বিগত সরকারের রোষানল থেকে বাদ পড়তেন না ইসলামি বক্তা এবং মসজিদের ইমাম-খতিবরা। মাহফিলে সভাপতির কথা মনমতো না বললে সেখানেই হেনস্তা করা হতো। মসজিদে খুতবা মনঃপূত না হলে খতিবকে বরখাস্ত করা হতো। এ প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মুফতি ইবরাহীম বলেন, নটর ডেম কলেজের সামনে একটি বড় মসজিদে দীর্ঘ ১১ বছর খতিব ছিলেন তিনি। হঠাৎ একদিন আওয়ামী লীগ নতুন কমিটি গঠন করে তাকে পরবর্তী জুমায় আসতে নিষেধ করেন ও পুলিশের ভয় দেখান। এ রকম হাজার হাজার ইমাম বরখাস্ত হয়েছেন।

মুফতি ইবরাহীম বলেন, কয়েক বছর ধরেই তাকে টার্গেটে রেখেছিল গোয়েন্দারা। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পরপর তারা স্টাডি করে যে, মাহফিল ও গণমাধ্যমে যারা কথা বলেÑ এই শক্তিকে স্তব্ধ করতে হবে। এ জন্য তাদের টার্গেট করে মামলা দেওয়া শুরু করে। অনেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে যতটুকু পারতাম বলতাম।’

একবার গুলি খাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মুফতি ইবরাহীম বলেন, ‘একদিন ঢাকায় আসার পথে কাঁচপুরে গাড়ির পাশে বিশাল আওয়াজ হয়। কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দেখতে পাই, একটি গুলি বর্নাটে লেগে আয়নার ওপরের দিকে চলে গেছে। মোটা গ্লাস হওয়ায় আল্লাহ সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছেন।’

আরেক দিন গাড়িচাপা দিয়ে হত্যাচেষ্টার মুখোমুখি হন তিনি। সেই স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ‘২০১২ সালে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছিলাম। টাঙ্গাইল বাইপাস পার হয়ে দেখি হঠাৎ সামনের দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি ট্রাক আসছে। ট্রাকের নিচে চাপা থেকে বাঁচতে আমার গাড়ির ড্রাইভার বিদ্যুৎ গতিতে পাশে খালের দিকে চলে যায়। সেখানে মাইলস্টোন ও গাছ-গাছালি ভেঙে ২৫ ফিট নিচে খালে গিয়ে পড়ি। গাড়িটা দুমড়েমুচড়ে শেষ। দু-তিন মিনিটের মধ্যে সেখানে পুলিশ হাজির হয়। তাদের দেখে বোঝা যায় যে এটা পরিকল্পিত। পরে আমাকে একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে একজন আমাকে ইনজেকশন দেওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের চিনত না। এতে আমি ভয় পেয়ে যাই।’

মুফতি ইবরাহীম বলেন, ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মসজিদে একটা খুতবা দিলাম, “স্বাধীনসমৃদ্ধ নিরাপদ বাংলাদেশ চাই।” কিছুক্ষণ পর গোয়েন্দা পুলিশ ফোন দিয়ে জানায়, আপনার নামে মামলা আছে। স্বাধীনতা কেন চাইলাম। আমাকে সব সময় নজরদারিতে রাখা হতো।’

গ্রেপ্তার হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে আরটিভির একটি টক শোতে বক্তব্য দিয়ে তিনি বাসায় ফেরেন। হঠাৎ তার মোবাইলে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে কল আসে। পরে বাসায় দারোয়ান এসে জানায়, দুজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি ধারণা করলেন যে তারা 'র'-এর লোক। তাই তাদের সঙ্গে দেখা না করে ট্রিপল নাইনে ফোন দেন। এ ছাড়া রুমের দরজা ভালো করে আটকে ফেসবুক লাইভে আসেন। এ সময় তিনটা স্লোগান দেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, র-মুক্ত বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তানি রাজাকার ধরধর মারমার।'

তিনি বলেন, রাত আড়াইটার দিকে শাবল দিয়ে তার রুমের দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এতে বাসায় সবাই কান্নাকাটি শুরু করেন। বাচ্চারা কান্নাকাটি করে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আজও তারা ঠিকমতো সুস্থ হতে পারেনি।

মুফতি ইবরাহীম বলেন, আসলে 'র' বর্ণচোরা। এ জন্য তারা রাতে আসে। এভাবে রাত একটা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত তিনি তাদের প্রতিরোধ করেন। ফেসবুক লাইভে যখন হাজার হাজার মানুষ তার বক্তব্য দেখছিল, একপর্যায়ে 'র' সরে যায়। সেখানে আসে ডিবি ও থানা-পুলিশ। ভোর সাড়ে ৪টায় তাকে গাড়িতে তুলে ডিবিতে নিয়ে যায়।

ডিবিতে নেওয়ার পথে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন এই আলেম। ডিবি অফিসেও ধর্মেন্দু নামে একজন হিন্দু অফিসার তাকে একটি প্লাস দিয়ে প্রচণ্ড চেপে আঙুল থেঁতলে দেন। এতে রক্ত জমে যায়। ছয় মাস লাগে তা সারতে। আরেকটা চাকু নিয়ে তার পায়ের আঙুলে খোঁচা দেন ওই অফিসার। অন্য অফিসাররা রুমে না থাকার সুযোগে হিন্দু অফিসার তাকে নির্যাতন করেন। ডিবিতে তার হাতকড়া পরানো ছিল। নামাজের জন্য কিছুক্ষণ তা খুলে দেওয়া হয়। আটকের পর পাঁচ দিন রিমান্ডে ছিলেন তিনি।

অবশ্য তিনি বেশি নির্যাতিত হন জেলজীবনে। কেরানীগঞ্জের সেই জেলজীবন সম্পর্কে মুফতি ইবরাহীম বলেন, 'সাধারণ একটি মামলার আসামি হলেও আমাকে রাখা হয় ফাঁসির সেলে। সাত মাস সেখানে বন্দি ছিলাম। আলো নেই, রোদ নেই। ধীরে ধীরে চুল পড়তে শুরু করে। অষ্টম মাসে সকালে ও বিকালে আধঘন্টা করে বের হওয়ার অনুমতি পাই। এভাবে ১৬ মাস কারাগারে কেটেছে আমার জীবন।'

তিনি বলেন, আটকের সময় তার নামে কোনো মামলা ছিল না। ধরে নিয়েই তার স্কুলের এক পার্টনারকে দিয়ে জোর করে একটি প্রতারণার মামলা করায়। পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন ধারায় চারটি মামলা দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ১৯ জানুয়ারি কারামুক্ত হন মুফতি ইবরাহীম।

দেশত্যাগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জেল থেকে বের হওয়ার পরও তাকে ১২/১৩টা হুমকি দেয় 'র' থেকে। তাকে সরাসরি হিট করারও ঘোষণা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় অনেকে তাকে দেশ থেকে চলে যেতে পরামর্শ দেন। একপর্যায়ে ২০২৩ সালের রমজান মাসে বিদেশে চলে যান তিনি। মুফতি ইবরাহীম বলেন, 'বিমানবন্দর পার হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় ছিলেন।

গোপনীয়তার জন্য পরিবারকেও বিদেশযাত্রার বিষয় জানায়নি। সব ধাপ পার হয়ে বিমানে ওঠার পর পরিবারকে জানান। সবাই তখন কান্নাকাটি করছিল। প্রথমে সৌদি আরবে গিয়ে তিন মাস ছিলেন। পরে কাতারে এক বছর ও দুবাইয়ে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন। সেখান থেকে ফের সৌদি আরব হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

৩০ দিনের রিমান্ড, চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ

রকীবুল হক
প্রকাশ : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০: ৫৩
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ১১: ৪১

ইসলামি রাজনীতিবিদ মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ধর্মীয় ও দলীয় কর্মকাণ্ডেই বেশির ভাগ সময় পার করেন। অথচ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে মামলা করা হয় তার বিরুদ্ধে। সেই মামলায় জামিন নেওয়ার পরও বিনা ওয়ারেন্টে তাকে গ্রেপ্তার করে নতুন নতুন মামলা দিয়ে কারারুদ্ধ করে পতিত আওয়ামী সরকার। দেশের বড় একটি দলের একজন কেন্দ্রীয় নেতা হলেও গ্রেপ্তারের পর তার সঙ্গে আচরণ করা হয় খুনের আসামিদের মতো। বিনা অপরাধে দুই দফায় গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় চার বছর জেল খাটেন তিনি। এ সময় দেড় মাস রিমান্ডের অমানসিক নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদের সময় চরম দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি কারেন্টের চেয়ারে বসানোরও হুমকি দেয় পুলিশ।

দীর্ঘদিন কারাভোগের পর হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তির মুহূর্তে কয়েক দফায় জেলগেট থেকে গ্রেপ্তারের ঘটনা ছিল তার জন্য আরও অমানবিক। এ ছাড়া হ্যান্ডকাপ ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে আদালতে আনা-নেওয়া করা হয় তাকে। জেলে থাকা অবস্থায়ও বাইরের কথিত সহিংস ঘটনার অভিযোগে মামলার ঘটনায় বেশ হতবাক হয়েছিলেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। মূলত, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলেছেন, তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার পরিচালনা করা হয়েছে বলে মনে করেন এই আলেম।

আওয়ামী দুঃশাসনে দেশের আলেম-ওলামাদের নির্যাতন প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম খান আমার দেশকে বলেন, ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচন ছিল একটি ষড়যন্ত্র এবং সমঝোতার নির্বাচন। এই নির্বাচন হয়েছিল মঈনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন, হাসিনা এবং ভারতের ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য। বাস্তবে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। সরকার গঠনের পর থেকেই তারা কয়েকটা এজেন্ডা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে। প্রথমেই তারা হাত দেয় দেশপ্রেমিক চৌকস সেনাবাহিনীর গণহত্যায়। সে সময় মেজর জেনারেল থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এরপরই তারা হাত দেয় ইসলামপন্থি লোকদের ওপর। ইসলামপন্থি লোকদের প্রধান রাজনৈতিক বা ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বকে শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই যুদ্ধাপরাধের নামে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়েছে। বিচারের নামে তামাশা করা হয়েছে। অন্যায়ভাবেই জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার কোন ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল তা বোঝা যায়, ওই তালিকায় ৫/৬ নম্বরে আমার নাম থাকায়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ৪/৫ বছর। শেষ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে এসেছে। এই বিচারটাই ছিল ইসলামি নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য।

ইসলামপন্থিদের ওপর আওয়ামী সরকারের নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের জুলাইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানকে। আর সেই মামলাটি করেছিল আওয়ামী জোট সরকারের শরিক বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিব রেজাউল হক চাঁদপুরী। 'নিজামীকে মহানবীর সঙ্গে তুলনার' অভিযোগে ওই মামলার আগেই গ্রেপ্তার হন জামায়াতের তৎকালীন আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমির মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, এ মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে আমি একটানা ৩০ দিন রিমান্ডে ছিলাম। ওই সময় সর্বোচ্চ রিমান্ড দেওয়া হয় আমাকে। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে সেবার দীর্ঘ এক বছর কারাভোগ করতে হয় আমাকে।

তিনি বলেন, ২০১০ সালে গ্রেপ্তারের সময় তার নামে থাকা কয়েকটা মামলায় জামিনে ছিলেন। কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল না, গ্রেপ্তারের কোনো কারণও ছিল না। তাকে গ্রেপ্তারের সময় মিরপুর-১০ নম্বরের বাসায় গিয়ে পুলিশ জানায় মিরপুর থানার ওসি সাহেব সালাম দিয়েছেন। এ সময় তিনি ওসির সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেন, আইজিপির সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার নামে তো কোনো মামলা নেই। আইজিপি বললেন, মামলা না থাকলে তো গ্রেপ্তারের কথা না, দেখছি বিষয়টা। কিন্তু পরে আর তিনি ফোন ধরেননি।

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, আটকের পর তাকে মিরপুর থানায় নেওয়া হয়। থানায় আনার কারণ জানতে চাইলে ওসি এবং ডিসি কোনো জবাব দেননি। পরে তাকে নেওয়া হয় ডিবিতে। তখন ডিবিতে ছিলেন মনিরুল। রোজার দিন তাকে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি ডিবি অফিসারদের বললেন, ধর্মের জন্যই আমাদের লড়াইÑ অথচ সেই ধর্ম অবমাননার অভিযোগে আমাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে। সেই মামলায়ও আমি জামিন নিয়েছি। তখন তারা কাগজপত্র দেখাতে বললেন, কাগজপত্র দেখে ফোনে সম্ভবত কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন, তার সব মামলায় তো জামিন আছে। তখন অন্য প্রান্ত থেকে বলা হয়, যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়ানো যায় না? তখন ডিবি অফিসার বলেন, তখন তো তার বয়স কম ছিল, কীভাবে জড়াব? তাহলে অন্য মামলায় জড়াতে বলেন ওই ব্যক্তি, সে অনুযায়ী নতুন মামলা দেওয়া হয়।

এভাবে একটার পর একটা মামলা দেওয়া হয় এই আলেমের বিরুদ্ধে। একটাতে জামিন নিলে আরেকটা মামলা দেওয়া হয়। এসব মামলায় ৫, ১০ দিন করে একটানা ৩০ দিন রিমান্ডে কাটাতে হয় তাকে। তিনি বলেন, আমাকে আরও মামলা দেওয়ার এবং রিমান্ডে নেওয়ার পরিকল্পনা তাদের ছিল। কিন্তু সর্বশেষ আমার বিরুদ্ধে মামলা দেয় যে, নটর ডেম কলেজের সামনে আমি সরাসরি গাড়ি থেকে মানুষ নামিয়ে পিটাই এবং গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই। অথচ ওই সময় আমি জেলে ছিলাম। এ মামলায় আবার ১০ দিন রিমান্ডও চাওয়া হয়। আদালতে আমার আইনজীবী ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি জানান, জেলে থেকে গাড়ি পোড়ালেন আর মানুষ মারলেন কীভাবে? তখন ম্যাজিস্ট্রেট হেসে বললেন, খান সাহেব খুব পাওয়ারফুল লোক। জেলে থেকেও তিনি গাড়ি পোড়ান, মানুষ মারেন! সরকারি এপিপিকেও বিষয়টি জিজ্ঞাসা করেন, জেলে থেকে মানুষ মারলেন কীভাবে? তাকে ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন, উনি পরিচিত লোক, জেলে থাকলে তো মামলা দেওয়া ঠিক হয়নি।

আমার আইনজীবী মামলাটি খারিজ চেয়েছিলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট খারিজ করেননি। তিনি এতটুকু করেছেন, এই মামলায় আর রিমান্ড না দিয়ে জেলে পাঠান। এতে আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম এই কারণে যে, রিমান্ডে না গিয়ে জেলে গেলেও কিছুটা বাঁচা গেল। সেবার প্রায় এক বছর জেলে ছিলাম।'

রিমান্ডে নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রিমান্ডে আমার সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করেছে। আমার চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসা করে। এ সময় কারেন্টের চেয়ারে বসানোর হুমকিও দেওয়া হয়। আমি তাদের বলি, আমাদের মতো লোকদের সঙ্গে আপনারা যে আচরণ করছেন, বিষয়টা আপনাদের তো ভাবা দরকার। কারণ এ সরকারই তো আর শেষ সরকার নয়। তখন একজন বলেন, এ লোক তো বাইরেও লম্বা লম্বা কথা কয় আবার আমাদের সামনে এসে একই ধরনের কথা বলছে। আমি বললাম, মরার আগ পর্যন্ত আমি এ কথা বলব। কারণ আমি তো চুরি করে জেলে আসিনি। আপনারা তো জুলুম করছেন। তখন একটু চুপ হয়। এভাবে আমাদের সঙ্গে তারা খুবই খারাপ আচরণ করেছে।'

দীর্ঘ এক বছর জেল খেটে মুক্তির পরও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন রফিকুল ইসলাম খান। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। তবে

গ্রেপ্তার এড়াতে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলাফেরা করতেন। এরই মধ্যে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ আলেম-ওলামা নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে ২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলন এবং ইসলামবিরোধী বিভিন্ন ইস্যুতে ধর্মীয় দল ও আলেম-ওলামারা সোচ্চার হলে তাদের ওপর দমন-পীড়নের মাত্রা বেড়ে যায়। এমনই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তারের শিকার হন মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

সে সময় আলেম-ওলামা নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ২০২১ সালে আমাদের গ্রেপ্তার করে প্রায় তিন বছর জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল। এ সময় জেলখানায় বড় আলেমদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যারা শুধু ইসলামপন্থি হওয়ার কারণে, হক কথা বলার কারণে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে। বড় আলেমদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। ডিবি অফিসে আমাকে তো রিমান্ডের সময় চোখ বাঁধা হয়েছিল। অবশ্য ওই নির্যাতনের মূল নায়ক যিনি ছিলেন, তিনি এখন জেলে। বহু মামলার আসামিও।

তিনি বলেন, এভাবে ইসলামপন্থি ও আলেমদের ওপর পতিত স্বৈরাচারী সরকারের আলাদা একটা আক্রোশ ছিল। তাদের এজেন্ডাই ছিল বাংলাদেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। ইসলামি দল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। আর জামায়াত-শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করতে তার লিডারশিপকে নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিকতায় তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের নামে ট্রাইব্যুনাল করে শীর্ষ নেতাদের ফাঁসির এই কাণ্ড করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি, জাতি তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। বরং আমাদের নেতাদের যখন পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে কোর্টে নেওয়া হতো, তখন জনগণের চোখে পানি পড়তে দেখা যায়। অথচ এখন যাদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে আনা হচ্ছে, তখন সেই জনগণই তাদের কিল-ঘুষি ও লাথি মারছে। এতে বোঝা যায়, আমাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। এখন যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে, তারা জালেম। এ জন্য তাদের সঙ্গে আচরণ সম্পূর্ণ আলাদা।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তারা যে পরিবেশ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা আর তৈরি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। ইসলামের ওপর জুলুম-নির্যাতন, ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা দীর্ঘ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তা আর কেউ করতে পারবে না। কেউ চেষ্টা করলে হাসিনা যেভাবে অপমান-লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন, তার চেয়েও পরিণতি হবে ভয়াবহ।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খাঁনের জন্ম ১৯৬৬, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার নওকৈড় গ্রামে। স্থানীয় মাদরাসা দাখিল ও বিভিন্ন মাদরাসা থেকে কামিল পর্যন্ত পড়েছেন। এরপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির সিনেট সদস্যও হয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় ছাত্ররাজনীতি থেকে আসেন জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বে।

রিমান্ডে বর্বরতা, নির্যাতন করে আ.লীগ ক্যাডাররা

রকীবুল হক

প্রকাশ : ০৫ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৩৫

আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ৪৬

ধর্মীয় মাহফিলে ওয়াজ করার অপরাধে একের পর এক গ্রেপ্তার, রিমান্ড আর কারাবন্দিত্বের শিকার হন অধ্যাপক মাওলানা তৈয়েবুর রহমান। বিভিন্ন সময়ে তাকে ক্রসফায়ারে দেওয়ারও প্রস্তুতি নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। রিমান্ডে নিয়ে বর্বর নির্যাতন করা হয়েছে তাকে। ওয়াজ মাহফিল শেষে গ্রেপ্তার এড়াতে বেশিরভাগ সময় আত্মগোপনে যেতেন বা পোশাক পরিবর্তন করে এলাকা ছাড়তেন তিনি।

ফাঁকা মাঠ বা বাজারেও রাত কাটিয়েছেন দক্ষিণাঞ্চলের জনপ্রিয় এই বক্তা। গ্রেপ্তার আতঙ্কে নিজের বাসায়ও ঠিকমতো থাকতে পারতেন না। জঙ্গিবিরোধী অভিযানের মতো বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় স্ত্রী-শিশুসন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি দলীয় মন্ত্রী-এমপিদের নির্দেশে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররাও ব্যাপক নির্যাতন চালায় যশোর মুক্তিযোদ্ধা কলেজের এই অধ্যাপককে।

এভাবেই বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে চরম জুলুম-নির্যাতনের মুখোমুখি হন বিশিষ্ট এই আলেম। জনপ্রিতার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াত পেলেও তাতে ঠিকমতো অংশ নিতে পারতেন না তিনি।

এমনকি বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের লোকেরা দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েও নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমানকে। নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছে বলেও জানা গেছে।

বিভিন্ন সময়ে নিপীড়নের শিকার হওয়ার বর্ণনা দিয়ে মাওলানা তৈয়েবুর রহমান আমার দেশকে বলেন, ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহাসিক কানসাট ময়দানে

মাহফিল ছিল। মাহফিলের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন ওই এলাকার তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এমপি গোলাম রব্বানীর ঘনিষ্ঠ একজন।

দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে আনুমানিক ৬০ হাজার লোকের উপস্থিতি হয়। সে সময় সেখানে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের একজন করে মোট তিনজন নির্বাচন করছিলেন। বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তবে ওয়াজের কোনো কথার বিরুদ্ধে যাওয়ার অভিযোগে মাহফিল শেষে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপ থেকে একদল গোলাম রব্বানির কাছে ছুটে গিয়ে অভিযোগ দেয়।

তারা বলে, তোমার ভাইয়ের নির্বাচন শেষ। কারণ সাতক্ষীরার লোক নিয়ে এসেছ, সে তো জামায়াতের লোক, সে তাদের কথা বলেছে। সে তো পাস করে যাবে। তিনি এ কথা শুনে বললেন, তাকে ধরে নিয়ে আয়, গুলি করে দে।

সে সময় আমি যে বাড়িতে অবস্থান করছিলাম, সেখানে তিন গাড়ি র‍্যাব, বিজিবি ও পুলিশ গিয়ে অ্যাটাক করে। ভোরের দিকে আমাকে, বাড়িওয়ালাকে আর বিএনপির একজনকে ধরে নিয়ে যায়। আমাদের শিবগঞ্জ থানা হাজতে ঢোকায়।

তিনি বলেন, মাহফিল শেষে ওই বাসায় খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রামে ছিলাম। তখন রাত হয়ে গেছে। তখনই আমাদের ওপর আক্রমণ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এসেই আমার হাতে লাঠি দিয়ে বাড়ি দেয়, টুপিটা খুলে ফেলে। আমাকে অনেক হেনস্তা করে। পৈশাচিকভাবে আমাকে ধরে নিয়ে আসে। সারারাত ঘুরিয়ে ভোররাতে হাজতে ঢোকায়।

তৈয়েবুর রহমান বলেন, আটকের পরের দিন অনেকগুলো অস্ত্র রেখে আমাকে মিডিয়ার সামনে হাজির করা হয়। আমি বললাম, এখানে অস্ত্র কেন, আমি তো এসব অস্ত্র চিনিও না। এক পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, কথা বললে অস্ত্র আরও বাড়বে। গুলিও বাড়বে। সেখানে রাসায়নিক কিছু দ্রব্যও ছিল। একপর্যায়ে ৮-১০ জন সাংবাদিক এসে তার ছবি তুলে নিয়ে যান। সেখানে রাখা অস্ত্রগুলো উদ্ধারকৃত অস্ত্র হিসেবে দেখানো হয়।

তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইনে দুটি মামলা দেওয়া হয়। আদালতের মাধ্যমে তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। তার প্রাইভেট কারটিও নিয়ে যায় পুলিশ। আজও সেই গাড়ি দেয়নি, থানায় পড়ে আছে।

রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করা হয় এই আলেমের ওপর। তারা হাঁটুতে পিটায় আর বলে, তোদের সাতক্ষীরার নেতাদের নাম বল। তোদের উসকানি দেয়, কারা দেয়? কে তোকে মাহফিলে পাঠায়?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি কোন দল করি না। কোরআনের কথা বলি। তারা তাকে অত্যাচার করে সাতক্ষীরার জামায়াত নেতা মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক তাকে পাঠিয়েছে কি না, সেই স্বীকারোক্তি নেয়ার চেষ্টা চালায়। তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি না দেওয়ায় খুব মারধর করা হয়।

তিনি বলেন, শিবগঞ্জ থানায় শহীদুল ইসলাম নামের এক পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকে রিমান্ডে নিয়ে পেটানোর জন্য। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, এতবড় আলেমের গায়ে আমি কীভাবে আঘাত করব। তিনি স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়ে চলে যান। তিনি আমার গায়ে হাত দেননি। পরে একজন হিন্দু অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই আমাকে কঠিনভাবে পেটায়, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নামে গালাগাল করে ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাকে বলেন, তুই সাঈদীর নাম বলিস, রাজাকারদের নাম বলিস। সে মানুষ হত্যা করে। তুই ভারতবিদ্বেষী। তুই আর মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারবি না, তোর সেই কাজ করে দেব। এভাবে রিমান্ডের প্রথম দিন খুব বেশি মারধর করে। পরের দিনগুলোয় মারধর না করলেও মানসিকভাবে চাপ দেয়, এমনিক ডিম নিয়ে এসে ঢোকানোর হুমকি দেয়।

শুধু মাওলানা তৈয়েবুর রহমানকে গ্রেপ্তার-নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ। তিনি যখন গ্রেপ্তার হয়ে শিবগঞ্জের কারাগারে, ঠিক তখনই তার যশোরের বাড়িতে জঙ্গি আস্তানার মতো অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অভিযানের সময় প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তখন ওই বাড়িতে তার স্ত্রী ও সাড়ে তিন বছরের সন্তান ছাড়া আর কেউ ছিল না।

পুলিশ যখন তার সন্তান ও স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসে, তখন লুসাইবা নামে তার সাড়ে তিন বছরের বাচ্চাটা ভয়ে পানি খাওয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকে। পাশের একজন চায়ের দোকানদার তাকে পানি দিতে চাইলে পুলিশ তাকে বাধা দিয়ে বলে, ওরা জঙ্গি।

তাদের জঙ্গি বলে বিস্ফোরকসহ আটকানো হয়। বাসার বাইরে থেকে তার জামাই, দুই ভায়রা, তাদের স্ত্রীসহ আটজনকে আটক করে। তাদের পরিবারের দেখার মতো কেউ ছিল না। তাদের যশোর কারাগারে রাখা হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে মুক্তি লাভ করেন তারা। একইভাবে জামিন নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারাগার থেকে দেড় মাস পর মুক্তি পান মাওলানা তৈয়েবুর রহমান।

তিনি জানান, কারামুক্তির পরও তাকে পালিয়ে থাকতে হয়েছে, বাসায় থাকতে পারতেন না। টাকা-পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে কখনও বাসায় থাকতেন। তিনি বলেন, যশোরে আবুল বাশার নামে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে টাকা দিতে দিতে শেষ হয়ে গেছি। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরেছি।

বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলে বাধা-হয়রানি প্রসঙ্গে তৈয়েবুর রহমান বলেন, মাহফিলে গেলে বা মাহফিল শেষে ফেরার সময় পুলিশ আটকিয়ে হয়রানি করত। পুলিশের ভয়ে মাহফিল শেষে জামা-কাপড় বদলিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে আসতেন। এমনও হয়েছে যে, পুলিশের কারণে মশার কামড় খেয়ে সারারাত বাজারে শুয়ে থেকেছেন। চারপাশে পুলিশ থাকায় বের হতে পারেননি।

একদিন মাহফিল শেষে যশোরের সীমান্তে সামান্তা এলাকায় সারারাত শুয়েছিলেন তিনি। তাকে ধরতে বিজিবির সদস্যরা সারারাত গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছিল। সেদিন সারারাত বাগানে পালিয়ে থেকে গ্রেপ্তার এড়ান তিনি।

২০১৬ সালে কিশোরগঞ্জে নাজেহালের ঘটনা জানিয়ে মাওলানা তৈয়বুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের লোকেরাই তাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ স্থানীয় এমপি তাকে ধরার নির্দেশনা দেয়। তাকে আটক করে কটিয়াদী থানা হাজতে ঢোকায় পুলিশ। রাত ৯-১০টার দিকে তাকে ক্রসফায়ারে দেওয়ার জন্য র‍্যাবের গাড়ি আসে। গাড়িতে ওঠানোর মুহূর্তে মোটরসাইকেলে একজন চেয়ারম্যান আসেন।

তিনি ওসির কানে একটি মোবাইল ধরিয়ে দেওয়ার পর তাকে আর র‍্যাবের গাড়িতে ওঠায়নি। পরে তিনি জানতে পারেন, স্থানীয় এমপির বোনজামাই তাকে রক্ষা করেন। হুজুরকে না ধরতে তার স্ত্রী বিষয়টি তার ভাইকে (এমপি) জানালে সে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। তিনি এরকম বহু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন বিগত সময়ে।

২০১৮ সালের একটি নিপীড়নের ঘটনা উল্লেখ করে তৈয়েবুর রহমান বলেন, গাজীপুরের মনোহরদীতে একটি মাহফিল করেন তিনি। মাহফিল শেষে বিদায়ের জন্য একটি ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে সেখানে গেলেই তারা দরজা আটকিয়ে তার মোবাইল-টাকা কেড়ে নেয়।

এছাড়া গালাগাল করে বলে, সাঈদীর নাম কেন বললি? আওয়ামী লীগের লোকেরা এসে তাকে মারার উদ্যোগ নেয়। তারা অস্ত্রও বের করে। এ সময় একজন তাকে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখায়। এতে চরম অসহায় হয়ে পড়েন তিনি।

একপর্যায়ে বাঁচার চেষ্টার অংশ হিসেবে চিৎকার করে খাটে ঠেলে ওঠেন এই আলেম। তার চিৎকার শুনে বাইরে থেকে বিএনপির একজন ছুটে এসে কী হয়েছে জানতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের সঙ্গে তার গলা চেপে ধরে। তাকেও গালাগাল করে। একপর্যায়ে সে ওই রুমের অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে মোবাইলে জামায়াত-শিবিরের লোকদের খবর দেয়। তখন গাজীপুর থেকে মাহফিলে আসা শিবির কর্মীদের একটি গাড়ি ঘুরিয়ে সেখানে পৌঁছায়। তারা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন।

অস্ত্র মামলায় দড়ি বেঁধে নেওয়া হয় আদালতে

রকীবুল হক
প্রকাশ : ০৭ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ৪৮

হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় তিনটি রিং পরানো হয়েছে মাত্র চার মাস আগে। তখনও পুরোপুরি সুস্থ নন তিনি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খুব সাবধানতার সঙ্গে চলাফেরা করেন। অথচ এমন ব্যক্তিকেও ছাড় দেয়নি আওয়ামী সরকারের পুলিশ বাহিনী।

শুধু গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিকে অস্ত্র মামলা দিয়ে রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে। কারারুদ্ধ ছিলেন দেড় মাস। এমনই বর্বর ঘটনা ঘটেছে দেশের অন্যতম আলেম অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীনের সঙ্গে। এমনকি তাকে দড়ি বেঁধে আদালতে তোলা হয়।

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজধানীর তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপালসহ বহু ধর্মীয়, শিক্ষা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা যাইনুল আবেদীন। ফ্যাসিস্ট সরকারের নানা জুলুম-নির্যাতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘসময় এ দেশে এমন লোকদের শাসনের অধীনে ছিল, যারা দেশপ্রমেকি আলেম-ওলামাদের ওপর চরম জুলুল নির্যাতন করেছে। তাদের মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তার করে জেলখানায় পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।

সেখানেও তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের রিমান্ডের নামে থানায় রেখে চালানো হয়েছে নির্যাতন। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে একের পর এক বানোয়াট মামলা দিয়ে নিপীড়ন চালানো হয়েছে এই আলেমদের ওপর। নিজেও এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

মাওলানা যাইনুল আবেদীন আমার দেশকে বলেন, ‘২০১৮ সালের ১২ আগস্ট আমরা সাতজন শিক্ষক মিলে মাদরাসাশিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য উত্তরার তানজিমুল উম্মাহ মাদরাসায় বসেছিলাম।

এসব বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য তৎকালীন শিক্ষাসচিব আমাকে বলেছিলেন। তার সেই নির্দেশনা অনুযায়ী এই বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ সেখানে পুলিশ এসে ঘেরাও করে ফেলে। আমরা বললাম, আমরা তো মাদরাসাশিক্ষা নিয়ে কথাবার্তা বলছি।

এতে ধরার কী আছে? তারা কোনো কথাই শুনতে রাজি হলো না। তারা সবাইকে আটক করে নিয়ে যায় উত্তরা উত্তর থানায়। সেখানে অনেক লোক গিয়ে সুপারিশ করেছিল, এরা তো কোনো দোষী নয়। কিন্তু পুলিশ জানায়, ওপরের নির্দেশ, তাদের ছাড়া যাবে না।’

প্রবীণ এই আলেমকে গ্রেপ্তারের পর সারারাত উত্তরা থানায় রাখা হয়। পরদিন সকালে আদালতে তুলে তাকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। আর তার মতো একজন প্রবীণ আলেমকে আদালতে তোলা হয় দড়ি বেঁধে। এ সময় তার সঙ্গে আরও সাতজন মাদরাসাশিক্ষক ছিলেন। পুলিশের এ ধরনের আচরণের ঘটনায় তাৎক্ষণিক কোর্টে পিটিশন দেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মনিরুজ্জামান জানিয়েছেন। এ ছাড়া মৌখিকভাবেও এই আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয় আদালত প্রাঙ্গণে।

তাদের উত্তরা থানায় প্রচণ্ড গরমের সময় ফ্যান ছাড়াই ফ্লোরে থাকতে দেওয়া হয়। তবে তিন দিনের রিমান্ডে যাইনুল আবেদীনকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। রিমান্ড শেষে আদালতের মাধ্যমে পাঠানো হয় কেরানীগঞ্জ কারাগারে। যাইনুল আবেদীন জানান, রিমান্ডে তাদের শারীরিক নির্যাতন না করলেও মানসিক নির্যাতনটা বেশি হয়েছে। সেই মানসিক নির্যাতনের ধরন নানা ধরনের। তাদের নামে অস্ত্র মামলা দেওয়া হয়েছে। এখনও তুরাগ থানায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা রয়েছে।

হার্টের রোগী মাওলানা যাইনুল আবেদীন গ্রেপ্তারের পরও ছিলেন অসুস্থ। যে কারণে আদালতের মাধ্যমে কেরানীগঞ্জ কারা নিয়ন্ত্রণে তাকে একটি হাসপাতালে রাখা হয়। এ সময় খাওয়া-দাওয়াসহ নানা কষ্টের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে যাইনুল আবেদীন বলেন, কারাগারের খাবার তো খাওয়া যায় না। বেশিরভাগ সময় কিনে খেতে হয়েছে।

তিনি বলেন, আগে থেকেই তিনি হার্টের রোগী ছিলেন। একপর্যায়ে হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় তিনটি রিং পরানো হয়। এর চার/পাঁচ মাস পরই গ্রেপ্তার হন তিনি। পরে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আদালতে নেওয়ার দৃশ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যাইনুল আবেদীন বলেন, আমাকে গ্রেপ্তারের পর অনেকে আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন, আমি তাদের নিষেধ করেছিলাম। কারণ আন্দোলন করে লাভ হবে না, তারা তো ছাড়বে না।

সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে তিনটি অস্ত্র মামলা দেওয়া হয় এই আলেমের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব মামলা ছিল মিথ্যা ও জালিয়াতির। এ কারণে

হাসপাতালের লোকজন সবাই হাসছিল যে, আপনাকে অস্ত্র মামলা দিয়েছে? অস্ত্র তো দূরের কথা, থানাই তো আমি চিনি না। এই মামলার বিরুদ্ধে আদালতে ডানপন্থি সব উকিল দাঁড়িয়েছিল আমার পক্ষে কথা বলার জন্য। কিন্তু আদালত কোনো কথাই শোনেনি। তারা সেদিন আমাকে জামিন দেয়নি।

তিনি জানান, দীর্ঘ দেড় মাস পর জামিনে কারামুক্তি পেলেও স্বাভাবিক চলাফেরার সুযোগ ছিল না। গ্রেপ্তার-নির্যাতন এড়াতে সবসময় সাবধানে চলাফেরা করতে হতো। রাতে নিজের বাসায় থাকতে পারতেন না তিনি। তা ছাড়া গ্রেপ্তার-পরবর্তী সময়ে তার পরিবারের সদস্যদেরও ডিবির লোকরা বিভিন্নভাবে মানসিক হয়রানি করেছে। যখন-তখন বাসায় এসে ডিবির লোকরা নজরদারি করত। নানা খোঁজখবর নিত।

যাইনুল আবেদীন বলেন, বিগত আওয়ামী সরকার ও শেখ হাসিনা মুখে ইসলামের পক্ষের লোক হিসেবে দাবি করলেও বাস্তবে তারা ইসলামের পক্ষে কিছুই করেননি। তারা যা করেছেন, ইন্ডিয়ার পক্ষেই করেছেন। ইসলামকে, ইসলামের শিক্ষা তথা কোরআন-হাদিসের শিক্ষাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যা করার দরকার, সবই তারা করেছেন।

পাঠ্যবইয়ে কোরআন ও হাদিসের ওই অংশটুকুই দিয়েছেন, যেখানে কোনো জিহাদের কথা নেই। এ সরকার যদি পরিবর্তন না হতো, তাহলে যে বই ছিল তাতে মাদরাসাছাত্র বা মুসলমানদের শিক্ষার কিছু থাকত না। দুনিয়ার বই দিয়ে ভরে ফেলেছেন। শেখ মুজিবের জীবনী বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। শেখ রাসেল লাইব্রেরি করা হয়েছিল। মাদরাসাতেও শেখ হাসিনার ছবি টানানো বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী সরকারের সময় প্রবীণ আলেমদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে, জেলে নেওয়া হয়েছে। মূলত, ইসলামবিরোধী ছিল শেখ হাসিনার সরকার। তাদের চক্রান্ত ছিল। সেই চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যই আলেম-ওলামাদের ওপর জুলম নির্যাতন চালানো হয়। জেলখানায় নিয়ে প্রায় সবার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা দেওয়া হয়েছে। কারও কারও নামে নারী নির্যাতনের মামলাও হয়।

তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার সাবেক এই প্রিন্সিপাল বলেন, মাদরাসায় যখন-তখন পুলিশ যেত। পুলিশ গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলতে চাইত। নানা খোঁজখবর নিত। কেউ জামায়াত-শিবির করে কি না ইত্যাদি জানতে চাইত। জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের তো আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে তো বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেই পারে। কিন্তু সে কথাও বলা যেত না।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের সময় আলেম-ওলামাসহ সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ জন্য ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর সমস্ত মানুষ আনন্দে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। এখন নাকি আবার তিনি দেশে ফিরে আসতে চান। এটা কখনও সম্ভব হবে না। দেশে এলে তাকে প্রতিহত করতে পুরুষ মানুষ লাগবে না, নারীরাই এবার রাস্তায় নেমে পড়বেন।

পুলিশের অত্যাচারে পাঁচবার বাসা পরিবর্তন

রকীবুল হক
প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি ২০২৫, ০৯: ০০

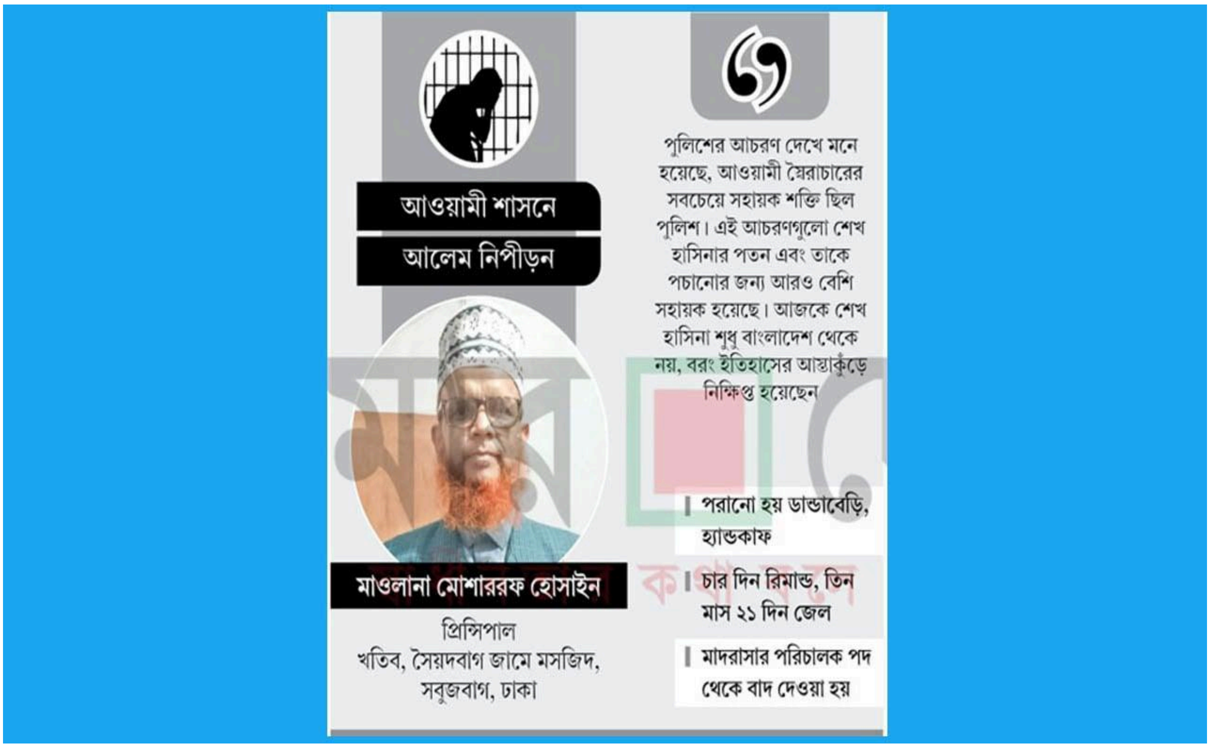

একটি ক্যাডেট মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন মাওলানা মোশাররফ হোসাইন। একইসঙ্গে বিভিন্ন মিডিয়া ও মাহফিলে ধর্মীয় আলোচক হিসেবেও পরিচিত তিনি। অথচ একের পর এক রাজনৈতিক মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের নামে নির্যাতনের শিকার হন রাজধানীর সবুজবাগের সৈয়দবাগ জামে মসজিদের এই খতিব।

সাতটি মামলায় প্রায় চার মাস কারাগারে কাটাতে হয় তাকে। আদালতে আর কারাগারে যাতায়াতের সময় তার দুহাতে হ্যান্ডকাফ আর পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরাত পুলিশ। এ সময় তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাকে বাদ দেন আওয়ামী লীগাররা।

বিগত আওয়ামী সরকারের নিপীড়নের শিকার শুধু নিজেই হননি, তার পরিবারও ভুক্তভোগী ছিল। পুলিশি অত্যাচারে পাঁচবার বাসা পরিবর্তন করেন বিশিষ্ট এই মুফাস্সিরে কোরআন। তার গ্রামের বাড়িতেও হানা দিত পুলিশ। গ্রেপ্তার-নির্যাতন আতঙ্কে দিন কাটত সবার।

মাওলানা মোশাররফ হোসাইন বলেন, বিগত স্বৈরাচারী খুনি শেখ হাসিনার সরকার এদেশের শান্তিকামী মানুষ তথা ওলামায়ে কেরাম এবং দেশকে রক্ষার জন্য যারা অকুতোভয় সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের ওপর যে আচরণ করেছে, আমিও তার শিকার।

আমি একজন শিক্ষক, প্রিন্সিপাল, একজন খতিব। বিভিন্ন মিডিয়ায় নিয়মিত ধর্মীয় টকশো করে থাকি আমি। তারপরও আমাকে নিপীড়ন থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

উত্তরার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা মোশাররফ হোসাইন জানান, ২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে কোনো একটি কারণে আট-দশ জন ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম

আলমগীরের উত্তরার বাসায় যান। সঙ্গে ছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদীও। তিনটি গাড়ি নিয়ে তারা ওই বাসায় যান।

গাড়িগুলো গোয়েন্দারা ফলো করতে পারে ভেবে তিনি নিজের মাদরাসার মাইক্রোবাস এবং আরেকটি প্রাইভেট কার সেখান থেকে পাঠিয়ে দেন। শুধু শামীম সাঈদীর গাড়িটি সেখানে অপেক্ষায় ছিল। প্রায় দেড় ঘন্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে আলাপ হয়। তার এক সপ্তাহ আগেই জেল থেকে মুক্তি পান মির্জা ফখরুল। তার সঙ্গে কারারুদ্ধ মাওলানা সাঈদীর অনেক কথাবার্তা হয়েছে, সে বিষয়গুলোই তিনি আলোচনা করছিলেন।

মির্জা ফখরুলের বাসা থেকে বের হওয়ার সময় গোয়েন্দা নজরদারির শঙ্কার বিষয়টি ভুলে যান তিনি। সেখান থেকে সবাই শামীম সাঈদীর গাড়িতে চড়ে উত্তরার আমির কমপ্লেক্সে অপেক্ষারত মাওলানা কামালউদ্দিন জাফরীর সঙ্গে দেখা করতে যান তারা। আজমপুরে নবাব হাবিবুল্লাহ স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালেই দুই পুলিশ সদস্য তাদের গাড়ি থামান। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই উত্তরা পূর্ব থানার ওসি শাহাদাত একটি পিকাপে সেখানে এসে পৌঁছান।

তিনি বলেন, সবাইকে থানায় যেতে হবে, গাড়িতে উঠুন। স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে পূর্বপরিচিত সেই ওসিকে কারণ জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি তিনি। তার আশঙ্কা হচ্ছিল, তাদের গুম করা হতে পারে। একপর্যায়ে তিন আলেম ও ড্রাইভারসহ তাদের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

একপর্যায়ে ডিবির এসি গোবিন্দের (গোপালগঞ্জে বাড়ি) নেতৃত্বে চারজন ওই থানায় যান। কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট আছে কি না, জানতে চাইলে ওসি শাহাদত না-সূচক জবাব দেন। তার সঙ্গে হাবিবুর রহমান নামে শান্তমারিয়াম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। এ সময় এসি গোবিন্দকেও গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এত প্রশ্ন করবেন না, আপনাদের জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই। একপর্যায়ে অমানবিক আচরণ করা হয় তাদের সঙ্গে।

মাওলানা মোশাররফ বলেন, বিকাল সাড়ে ৩টায় তাদের ডিবিতে নিয়ে গারদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নোংরা পরিবেশে সেখানে তারা অজু ও নামাজ আদায় করেন। অসৌজন্যমূলক আচরণের শঙ্কা নিয়ে রাত কাটান সেখানে। তবে এ সময় কোনো অঘটন ঘটেনি, কোনো জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি। তবে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে।

ফজরের পর ডিবি থেকে তাদের নেওয়া হয় মতিঝিল থানায়। এসআই মোকাররম (গোপালগঞ্জে বাড়ি) একটি হায়েস মাইক্রো এনে তাদের থানায় নিয়ে দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখান। মামলাগুলো ছিল মতিঝিলের পুরোনো ঘটনার। এর মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের সময় একজন ওসি (গোপালগঞ্জে বাড়ি) আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ছিল।

সবগুলো ছিল রাজনৈতিক মামলা। পরে আদালতের মাধ্যমে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। সেই মামলায় তিন মাস ২১ দিন জেল খাটেন এই আলেম। এরই মধ্যে দুই দফায়

দুই দিন করে চার দিন রিমান্ডেও নেওয়া হয় তাকে। তবে এ সময় তার সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করা হয়নি। এ সময় শিবিরের মেধাবী ছাত্রদের ওপর বর্বর নির্যাতন দেখেন তিনি। পরে সব মামলায় তিনি জামিনের মাধ্যমে মুক্তি পান।

গ্রেপ্তারের দিন ২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি তাফসির মাহফিলের প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল মাওলানা মোশাররফের। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে না পারায় মাহফিল কর্তৃপক্ষ খুবই রাগান্বিত হয়। তবে দুদিন পর পত্রিকায় তার গ্রেপ্তারের খবর দেখে কষ্ট দূর হয় তাদের।

মাওলানা মোশাররফ হোসেন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমার দ্বারা কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এটা কখনো চাইনি। গ্রেপ্তারের আগের দিন বড় ছেলের দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়। তিনি বলেন, আদালতে ও কারাগারে নেওয়ার সময় হ্যান্ডকাফ ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে যেভাবে নেওয়া হয়, যেন আমরা সবচেয়ে বড় অপরাধী। একজন খতিব ও শিক্ষককে এভাবে সবার সামনে উপস্থাপনের চেয়ে বড় অপমান আর নেই। কারাগারে একদিন তার গলায় মাছের কাঁটা বেঁধে যায়।

কিন্তু তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। অবস্থা খারাপ হলে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে মেডিকেলে নেওয়ার উদ্যোগ নিলেও হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় তিনি যেতে রাজি হননি। একপর্যায়ে সেগুলো খুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, কোর্টে আনা-নেওয়ার সময় হ্যান্ডকাফ ও ডান্ডাবেড়ি পরতে আপত্তি জানালে তারা জেল কোড দেখায় যে, দু-তিনটি মামলায় ওয়ারেন্ট থাকলে ডান্ডাবেড়ি পরতেই হবে। তাহলে বর্তমানে গ্রেপ্তার সাবেক মন্ত্রীদের ডান্ডাবেড়ি পরানো হচ্ছে না কেন, প্রশ্ন তার।

আরও কিছু মামলায় জড়ানো হয়েছিল মাওলানা মোশাররফ হোসাইনকে। সেগুলোয়ও জামিন নিয়ে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এর ছয় মাসের মাথায় আরও চারটি মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে। এই মামলাগুলো সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। শিক্ষক হিসেবে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না। তারপরও একের পর এক রাজনৈতিক মামলায় জড়ানো হয় তাকে।

বানোয়াট মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, থানায় একটি মামলায় যাদের আসামি করা হয়েছে, সেই তালিকা ফটোকপি করে একই থানায় আরেকটি মামলায় তাদের জড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। উত্তরা পূর্ব থানায় একই বিষয়ে দুটি এবং দক্ষিণখানের আরেকটি ঘটনায় দুটি মামলা দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। আজমপুর রেললাইনে পুলিশের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের ধস্তাধস্তির অভিযোগে দায়ের করা মামলায়ও তাকে সামনের সারিতে আসামি করা হয়।

সেখানে তাকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অথচ জামায়াতের প্রাথমিক শপথেরও কেউ তিনি নন। বাকি দুটি মামলা হয়েছিল ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর। এই মামলার খবর জেনে হতবাক হন তিনি। তিনি তখন থানার পাশেই মসজিদে নামাজ ও মাদরাসায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরে মামলার খবর পেয়ে ওই এলাকা থেকে অন্য স্থানে

চলে যান তিনি। এভাবে সাত-আটটি মামলায় তার নামে ওয়ারেন্ট ছিল। একপর্যায়ে কোর্টে হাজিরা দেওয়া বন্ধ করে দেন তিনি। চারটি মামলায় আজও জামিন করাননি তিনি। সেই মামলাগুলো এখন খারিজ হয়ে গেছে।

পতিত আওয়ামী সরকারের সময়ে কারাগারে যাওয়া ছাড়াও বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন বিশিষ্ট মুফাস্সিরে কোরআন মাওলানা মোশাররফ হোসাইন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাকে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার পরিচালক পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একজন আওয়ামী লীগারের ষড়যন্ত্রে এই কাজ করা হয়। পুলিশি অত্যাচার চলে পরিবারের ওপরও।

বিভিন্ন সময় তার উত্তরার বাসায় পুলিশ হানা দেয়। পুলিশি অত্যাচারে পাঁচবার বাসা পরিবর্তন করেন তিনি। তার বাসা চিনে গেলেই সেখানে পুলিশের তৎপরতা দেখা যেত। এতে তার সন্তানদের লেখাপড়ার ওপর প্রভাব পড়ত। তাদের নিরাপদে রাখতেই বাসা পরিবর্তন করা হয়। বাগেরহাটে তার গ্রামের বাড়িতেও বারবার পুলিশ যায়। তার সন্তানদের গ্রেপ্তারের হুমকিও দেওয়া হয় বিভিন্ন সময়ে।

তিনি বলেন, পুলিশের আচরণ দেখে মনে হয়েছে, আওয়ামী স্বৈরাচারের সবচেয়ে সহায়ক শক্তি ছিল পুলিশ। এই আচরণগুলো শেখ হাসিনার পতন এবং তাকে পচানোর জন্য আরও বেশি সহায়ক হয়েছে। আজকে শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, বরং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন, আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষের ওপর আওয়ামী সরকারের নির্যাতনের কারণে তাদের চোখের পানি আল্লাহ কবুল করেছেন। তা না হলে সব সংসদ সদস্যসহ একটি সরকারের সবার পালিয়ে যাওয়ার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।